পঞ্চম অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তৃতীয় পর্বের উপন্যাস (২০১০-২০১৯) : জীবন জীজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকেই সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিকের নানা পরিবর্তন সময় বহন করে চলেছে। অর্থাৎ আমরা বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। বিশ্বজনীন বা আন্তর্জাতিক হতে গিয়ে আমরা আজ একক সত্তায় পরিণত হয়েছি। এই দশক মানে 'নিজেকে দেখ', 'আরও চাই'-এর ভাবনা এখন অতীত। ফলে স্বার্থমগ্ন মানুষ জীবন-যাপনে কোন বিপন্ন বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছে তা ভাবনার বিষয়। যদিও কাল সীমাকে একটা গণ্ডির মধ্যে আমরা আবদ্ধ করি নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু সময় নিত্যবহমান। সে তার নিজের মতো করে চলতে থাকে। বাংলার বুকে একুশ শতকের নানা পরিবর্তন হয়ে চলেছে রাজনৈতিক দিকের। তার বড় ধরনের বাঁক বদল ঘটল ২০১১ সালে। পরিবর্তনের হাওয়া বদলের সূচনা বহু আগে থেকে আরম্ভ হলেও তার আমূল পরিবর্তন ঘটল এই দশকেই। বৈজ্ঞানিক দিকে— ইন্টারনেটের ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি জীবন যাত্রাকে পরিবর্তন করে। সামাজিক ক্ষেত্রে— ফ্ল্যাট জীবনের বাসিন্দাদের রূপ পরিবর্তন হয়। সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ ধীরে ধীরে কমতে থাকলেও নারী নির্যাতনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। শহর কলকাতা থেকে শুরু করে মফঃস্বল পর্যন্ত 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর প্রভাবে যত্রতত্র মানুষের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। যার ফলে মানুষের মধ্যেও নানাক্ষেত্রে পরিবর্তনের জোয়ার আসে। বিশ্বজুড়ে মোবাইল ফোনের গঠনগত বিপ্লব সংঘটিত হয়। যার প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে পরিবর্তন ঘটে। কম্পিউটারের নতুন রূপ— ল্যাপটপের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। অপরাধ জগতের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের যোগসূত্র বৃদ্ধি পায়। নতুন আইনের সৃষ্টি হয় যার নাম 'সাইবার ক্রাইম'। বিজ্ঞান আর যন্ত্রবিজ্ঞানের জগতে নতুন বিপ্লব মানুষকে ক্রমশ যান্ত্রিক করে তুলেছে, তার প্রমাণ কিন্তু আমাদের সামনে যত্রতত্র। বিজ্ঞানের হাত ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে দেখা যায়।

বাংলার বুকে বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের চলমানতায় নতুন নতুন পালকের উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বাস ভাঙা-গড়ার পটভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে আগামী দিনের নব ইতিহাস। 'লিঙ্গ-সাম্য'-এর ডানায় ওঠে নতুন পালক। নারী বা পুরুষ শরীরকে নিজের মনের প্রাধান্য অনুযায়ী পরিবর্তনের সুযোগ

এবং সুবিধা আমাদের দেশেও ঘটতে শুরু করে। সুপ্রিম কোর্টে রূপান্তরকামীদের নিয়ে আইন পাশ হয়। সমাজের একটি দিকের উন্মোচন হয়। কিন্নররাও আইনের চোখে সমান অধিকার পেল। একের পর এক নতুন ধারা সমাজকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন স্বাধীনতার দিকটি উন্মুক্ত হয়। সমলিঙ্গের দাম্পত্য সম্পর্ক ধীরে ধীরে সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। কামনা, বাসনা, ভোগ-বিলাসিতার জগৎ ক্রমবর্ধমান হতে থাকে সমাজের বুকে। সবকিছু মিলিয়ে এক কঠিন সময়ের দ্বারপ্রান্তে আমরা উপস্থিত। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস লেখেন তথ্য নির্ভর। আসলে আধুনিক পাঠক তথ্যমুখী। ফলে লেখকের মনোসংযোগ সে দিকেই ধাবিত হয়েছে। একের পর এক তথ্য সংগ্রহ করে তিনি উপন্যাসদেহ নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন। তবে এই দশকে এসে তিনি যে উপন্যাস লিখেছেন সেখানে যেমন বর্তমান সময় উপস্থিত হয়েছে তেমনি গত শতকের ষাট-সত্তর-আশির দশকও উপস্থিত হয়েছে। এসেছে উদ্বাস্তু জীবনযন্ত্রণার কথাও। স্মৃতির রোমন্থন তাঁর উপন্যাস লেখার সঙ্গী হয়েছে অনেক সময়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে উপেক্ষা করেননি কখনো। তাঁর এই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলি— ১. 'নাটাদা' ২. 'পরবাসী' ৩. 'কান্তকবি' ৪. 'হলদে গোলাপ' ৫. 'ভেজা বারুদ' ৬. 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' ৭. 'দুনিয়াদারি' ৮. 'কথাবলা পুতুল' ৯. 'শেকড় ছেঁড়া' ১০. 'চার ডাক্তার' ১১. 'কিছু একটা হয়ে যাবে'— নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব। দেখার চেষ্টা করব তিনি তথ্য বিস্ফোরণের যুগ এবং জীবনকে চরিত্রের মধ্যে কীভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই পর্বের প্রথম উপন্যাস দিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হলাম।

১

'নাটাদা' উপন্যাসটি সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি-মূলত কলকাতার একসময়ের মস্তানরাজ নিয়ে লেখা। নাটাদা নামে এক গুণ্ডার জীবন বৃত্তান্ত। নাটাদার প্রথম জীবনে নাটা হয়ে ওঠার কাহিনি, মধ্য জীবনে নাটাদার দাপটের চিত্র এবং শেষ জীবনে নাটাদার ব্যক্তিত্বের অবনমন অর্থাৎ নাটাদার পরিচিতি হীনতার কাহিনি উপন্যাসে রয়েছে। উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার পর একদিকে যেমন মস্তান জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাজনৈতিক-সামাজিক দিকের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় তেমনি নাটাদা তার বীভৎস জীবনকাহিনির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রকৃত মানে খোঁজার চিত্রও দেখা যায়। বিয়ে করে সংসার পাতা হয়নি নাটাদার। কিন্তু পরস্ত্রীকে নিয়ে সংসার সংসার খেলা ছিল। উপন্যাসের কথক নাটাদার জীবনবৃত্তান্ত নাটাদার

কাছে শুনতে শুনতে রেকর্ডিং করে গল্পটি উপস্থাপন করেছে। নাটাদা আসলে তার প্রথম শিক্ষাগুরু ওরফে বাল্যবন্ধু মানিকের কথা বলতে চেয়েছিল। মানিকের হাত ধরে কীভাবে নাটাদা হয়ে উঠল সেই কাহিনি এখানে রয়েছে। নেবুতলা বস্তিতে নাটাদার ঘর। বর্তমানে সে পূর্বের সমস্তরকম গরিমা হারিয়ে ক্যান্সার রোগী। বাবা মারা যাওয়ার পর ক্লাসের বন্ধু মানিকের সঙ্গে তার ব্যবসা শুরু। মানিকের বাবাকে ইঁট দিয়ে প্রহার, মানিকের সঙ্গে পতিতাপল্লীতে যাওয়া, সেখানকার মেয়েদের নানারকম ভালোমন্দ দেখা ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে নাটা গুণ্ডাগিরির মহলে প্রবেশ করে। নাটা অসৎ কাজ করতে চায় না। সে সৎ পথে প্রকৃত গুণ্ডা হওয়ার সাধনা করেছে আজীবন। আজকালকার মস্তানদের নাটাদা মস্তান মনে করে না, কারণ তারা গায়ের জোর নয় পিস্তলের জোর দেখায়। নাটাদার প্রথম জীবন-ইতিহাস বিশ শতকের ষাট-সত্তর দশক। এই সময় নাটা কংগ্রেস দলের পোষাগুণ্ডা আবার নকশালদের প্রয়োজনেও কাজ করে দিয়েছে। পেশাগত দিক থেকে গুণ্ডাগিরির সঙ্গে সঙ্গে সিনেমাহলের টিকিট সেলের কাজও করেছে। গুণ্ডাগিরি করেও পতিতাপল্লীর মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছে মাতৃশিক্ষার দরুণ। ফলে বহু নারীর শরীর তার কাছে সহজলভ্য হলেও তাদের ভোগ করার মানসিকতা তার ছিল না। তাই জবা নামের পরস্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হওয়ার পর নাটা তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায়। কিন্তু জবা নাটার সেবা করলেও স্বামী মধুসূদনের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ছিল। ফলে বিবাহ বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়নি। নাটাদার এরকম চলমান জীবনে বাঁকবদল ঘটে পাঁচি নামক এক পাগলি ওঝার পালিত মেয়ে খেঁদির দ্বারা। কারণ পাঁচি মারা যাওয়ার সময় নাটাদাকে খেঁদির দায়িত্ব দিয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হল দায়িত্বটা কিসের?— পিতার না স্বামীর? খেঁদি আর নাটার বয়সের পার্থক্য অনেক। ফলে খেঁদি নাটাদাকে কাকু সম্বোধন করত। তা সত্ত্বেও জবার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। সে নাটাকে ছেড়ে পূর্বের স্বামীর কাছে আশ্রয় নেয়। নাটাদাও উপন্যাসের শেষে তার আর খেঁদির সম্পর্কের রহস্য উন্মোচন করতে চায়। পিতা হিসেবে খেঁদির সম্প্রদানও তাকে করতে দেখা যায়। মৃত্যুকালীন সময়ে কথকের কাছে নাটাদা ও খেঁদির সম্পর্কের রহস্য উন্মোচিত হয়। নাটাদা খেঁদিকে তার মনে যে স্থানটি দিয়েছিল সেটি লোকসম্মুখে উদ্ঘাটনের নয় তাই সে তার উরুতে খেঁদির নাম খোদাই করে রেখেছে। উপন্যাসের মধ্যে গুণ্ডাগিরির মধ্য দিয়ে এক অন্য মানসিকতার রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

সমগ্র উপন্যাস কাহিনির মধ্যে ঔপন্যাসিক কী ইঙ্গিত দিতে চাইলেন প্রশ্ন জাগতে পারে। উপন্যাসের শুরু থেকে নাটাদার কাহিনি শুনতে শুনতে কলকাতার এককালের গুণ্ডারাজের ইতিহাসের চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। নাটাদার জীবন বৃত্তান্ত কয়েকটি মোড় ঘোরানো

পর্বের মধ্যে দিয়ে অন্তিম পর্বের দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ক্ষণিকের এক ঝলক এতক্ষণের সমীকরণকে কোথায় যেন আঘাত দিল। উপন্যাসের কয়েকপৃষ্ঠার কাহিনির ভিতরে ঢোকা যাক। নাটাদার বাল্য-কৈশোর-বার্ধক্য— এই তিন পর্বের কাহিনি রয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের শুরুতে আমরা মধ্যবয়সী নাটাদাকে পাই। এরপর উপন্যাস কথকের মাধ্যমে আমরা নাটাদার জীবন বৃত্তান্তে প্রবেশ করি। বাল্যকাল থেকে নাটাদা কীভাবে 'নাটাদা' হয়ে উঠল তার কাহিনি উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে সমাজের কোনো এক স্তরের মানুষদের নিয়ে উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করতে এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। 'নাটাদা' উপন্যাসে নাটাদা ব্যতিক্রমী চরিত্র। তার চরিত্র নির্মাণ করতে লেখককে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারণ উপন্যাসটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার জগতের ছবি। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ছবি। তথাকথিত কিছু ব্রাত্য মানুষের চিত্রও এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠেছে।

উপন্যাস কথকের ছেলেবেলা কেটেছিল বর্তমানের ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সরণিতে। সেখানকার বস্তিবাসী নাটাদার গল্প উপন্যাসটির বিষয়। কথকের ছেলেবেলায় নাটাদাকে ঘিরে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কোনো বাচ্চা দুষ্টুমি করলে বা ঘুমোতে না চাইলে বলা হত— *"... ঘুমো, না হলে নাটাদাকে ডাকব।"*[১] এলাকাটা বাগবাজারে। কথক দীর্ঘদিন পরে সেই এলাকায় এসেছেন। পূর্বের অবস্থার বহুপরিবর্তন হয়েছে। সর্বত্র পরিবর্তনের ছোঁয়ায় পরিচিত জায়গাকে আর চেনা যায় না। এই পরিবর্তনের ছোঁয়ার মাঝে নাটাদার সঙ্গে কথকের দেখা হয়। এই নাটাদারও পরিবর্তন হয়েছে। নাটাদা নিজের পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন—

> *"... আমাকে দেখে অবাক হচ্ছো? এমনই হয়। সুচিত্রা সেন নিজেকে নুকিয়ে রেখেছে কেন? ধ্বসে গেচে বলে। আজ যদি উত্তমকুমার বেঁচে থাকত, ওঁর মুখেও বাঁধানো দাঁত থাকত। গলায় বেল্ট, মাথায় টাক। সামনের খালটার কথাই ভাব, গঙ্গা থেকে এই খাল দিয়ে লঞ্চ যেত সুন্দরবন। আর এই খালটার কী অবস্থা, আর আমি তো বালটা।"*[২]

এই বক্তব্য থেকে নাটাদার রসবোধের পরিচয় আমরা পাই। নাটাদার জীবনের প্রতিটি অংশের একের পর এক গ্রন্থি-উন্মোচন হয়। নাটাদার বাবা মারা যান কলেরা রোগে। তখন নাটাদা দশ বছরের। কলেরায় নাটাদার জ্যেঠিমাও মারা যান। জ্যেঠিমার অবর্তমানে নাটাদার মাকে নিজের সম্পত্তি মনে করতে চাইত নাটাদার জ্যাঠামশায়। কিন্তু নাটাদার মা সতী চরিত্রের। যার বলে তিনি হাসপাতালে আয়ার কাজ করে পুত্র-কন্যাকে মানুষ করতে শুরু করেন।

প্রভাতরঞ্জন নন্দীর নাটাদা হয়ে ওঠার কাহিনিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস আবর্তিত হয়। নাটাদার ছেলেবেলায় অন্য বাচ্চাদের মতো ব্যাঙ দেখে ঢিল ছুড়তে ভয় লাগত। সেই ভয় ভেঙে কীভাবে নামকরা গুণ্ডায় পরিণত হল তার গল্প ধীরে ধীরে কথক উপস্থিত করেন আমাদের সামনে। নাটাদার গুণ্ডা জীবনের হাতেখড়ি হয় স্কুলের সহপাঠী মানিকের হাত ধরে। মানিক নাটাদার জীবনের প্রায় সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী ছিল। স্কুল পালানো থেকে গঙ্গায় স্নান, সব কাজেই মানিক নাটাদার শিক্ষাগুরু। মানিকের জীবন বৃত্তান্ত জেনে নেওয়া দরকার। মানিকের মা পতিতা পল্লীর নারী। মানিকের বাবা সেই পতিতাপল্লীতে যেতেন। মানিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে নিয়ম মাফিক অস্বীকার করেছে ওর বাবা। মানিকের মা কলেরায় মারা গেলে মানিক পতিতাপল্লীর এক মুসলিম নারীর কাছে পালিত হয়। মানিককে সে মাসি নিজের সন্তানের মত মানুষ করতে চেয়েছে। মাসি মানিকের বাবাকে মানিককে গ্রহণ করার জন্য বলেছিল। কিন্তু মানিকের বাবা মুসলিম নারীর কাছে পালিত হওয়ার জন্য তাকে ঘরে নিতে চাননি। কারণ তিনি বামুন। সমাজকর্তাদের এই জটিল নিয়ম নাটাদার মাথায় ঢোকে না। যাইহোক, মানিকের কথা নাটাদা বলতে শুরু করেছে। মানিক পর্বেই ফিরে যাই আবার। মানিক পতিতা পল্লীর নারীদের হালহকিকত জানতে ও বুঝতে পেরেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু মানিকের মাসি মানিককে সে পাড়ায় রাখতে চায়নি। তাই মানিকের জন্য এক বাবু ঠিক করেছিল। সে বাবু মানিককে স্কুলে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে বাবুটি মানিককে দিয়ে কুকর্ম (যৌন শোষণ) করালেও মানিক নিরুপায় হয়ে সেখানে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, সেখানে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু নাটাদার সঙ্গে মিলে এক সময় মানিক তার বাবাকে মেরেছিল। মানিকের মালিক এই কথা শোনার পর আর তাকে কাজে বহাল রাখে না। মানিক এরপর পতিতাপল্লীতে না থেকে চিৎপুর ব্রিজের তলায় আশ্রয় নেয়। পতিতাপল্লীতে থাকলে মাসির কাজের অসুবিধা হয়। অন্যদিকে নাটাদার বাড়িতে মানিককে রাখতে নাটাদার মা রাজি হয় না। অগত্যা মানিককে আশ্রয় নিতে হয় ব্রিজের তলায়। বাবুর বাড়িতে কাজ করে মানিকের হাতে শ'খানেক টাকা পুঁজি হয়েছিল। মানিক নাটাকে সঙ্গী করে রথের মেলায় পাঁপড়ের দোকান শুরু করে। এই মেলায় মিলনসঙ্ঘের তোলাবাজদের সঙ্গে ঝামেলা থেকেই নাটার নাম ডাক হয়। মানিকের হাত ধরেই নাটাদার গুণ্ডাগিরিতে প্রবেশ। শুধু এখানেই শেষ নয়। মানিক নাটাদার যৌনজীবনেরও শিক্ষাগুরু। পতিতাপল্লীর জুঁই-এর সঙ্গে নাটাদার প্রথম যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে সে এক নতুন জীবন শুরু করে। একে একে বহু নারী-সঙ্গতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল নাটাদা। এসবের ব্যবস্থা মানিকই করে দিত। কারণ পরে মানিক তার মাসির দৌলতে পতিতাপল্লীর 'বাবু'তে পরিণত হয়।

হাসি নামে এক নারীর সঙ্গে মানিকের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সে হাসির বাবুতে পরিণত হয়। মানিকের দৌলতেই নাটাদা পল্লীর রক্ষাকর্তা হিসেবে বহাল হয়। কিন্তু মানিক বাবু হতে গিয়েও ফাইফরমায়েশের বাবু হয়ে রয়ে যায়। নকশাল আন্দোলনের সময় মানিক এক সাহসিকতার কাজ করে। জুঁই তার ঘরে নকশাল কর্মীকে আশ্রয় দিলে তাকে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এর পর মানিক জুঁইকে ও তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ওড়িষ্যায় পালিয়ে যায়। সেখানে সে সংসারী জীবন-যাপন করতে শুরু করে। মানিকের জীবন নাটাদার সঙ্গে একটা সময় পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে ভাটা পড়ে নকশাল আন্দোলনের সময়। তবে উপন্যাসের শেষে আবার মানিকের জীবনচক্র নাটাদার সঙ্গে মিলিত হয়।

উপন্যাসটিতে নাটাদার জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে পতিতা পল্লীর দীর্ঘ ইতিহাস পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। বহু অজানা তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। শুধু পতিতাপল্লী নয়, সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থান এবং সিনেমা জগতের কথাও উঠে আসে। নাটাদা পতিতাপল্লীর নারীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলেও নারীজাতিকে নিয়ে তার বিচারের অন্য মাপকাঠি রয়েছে—

> *"আজকালকার যেসব মেয়েরা ফুলপ্যান্টালুন-গেঞ্জি পরে ঘোরে, জানবি। ওদেরও একটা আঁচল আছে, চোখে দেখা যায় না। সেটা আমি ওই বয়সে না, পরে বুঝেচি।"*[৩]

নাটাদা গুণ্ডাগিরিতে একজন সফল ব্যক্তি হলেও তার অন্তরে সাধারণ সরল মানুষের অবস্থান। দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রকাশ তার চরিত্রের বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। পতিতাপল্লীর নারীদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রও উঠে এসেছে নাটাদার দৃষ্টিতে। নাটাদা মানিকের দৌলতে যেহেতু পতিতাপল্লীর একজন রক্ষাকর্তার মতো ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিল তাই নারীরা তাদের সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় তাকে বলতে পারত। রমা নামে এক দেহপসারিণীর যন্ত্রণা নাটাদাকে বলেছে নির্দ্বিধায়—

> *"... ওই ওলাওটা দুটো যাচ্ছে না। হারামিদের শক হয়েছে একজন বসবে অন্যজন দেখবে। আমি যত বলছি একজন একজন করে এসো, শুনচে না, ঘর থেকেও বেরুচ্ছে না।"*[৪]

এই ধরনের অভিযোগের নিষ্পত্তি নাটাদা বাঁ হাত দিয়েই প্রায় করেছে। জীবনকে শুধু এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, সমস্তরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করেছে সে।

গুণ্ডাগিরির দরুণ নাটাদা রাজনৈতিক নেতাদের প্রিয় পাত্র ছিল। ষাট-সত্তরের দশকে দেশের পরিস্থিতি প্রায় বিনষ্টির দিকে ধাবমান হচ্ছিল। নাটাদা এই সময়পর্বে মস্তান জগতের শ্রেষ্ঠত্বে

বিরাজমান। নাটাদা একহাতে নকশাল, অন্যহাতে কংগ্রেস দু'দলকেই সামলেছে। সে নিজে হাতে 'পেটো' বানাতে পারত। সোডার বোতলের কারসাজি জানত। ফলে নাটাদা আলাদা মর্যাদা পেয়েছিল। নাটাদার বয়স হয়েছে; সে দেখেছে— এখনকার গুণ্ডাগিরি করা ছেলেরা হাতের কাজ জানে না, বোতলের কাজ জানে না। তারা শুধু জানে যন্ত্র চালাতে—

> *"ওরা ভালো মোবাইল চালাতে পারে। মোবাইলে খিস্তি দেয়। মোবাইলে চমকায়। মেশিন শো করে, ব্যাস। ওরা হাতের কাজ জানে না। একদম হাতে কাজ জানে না, অথচ দিব্যি আছে। হংকং ব্যাঙ্কক ঘুরছে।"*[৫]

নতুন প্রজন্মকে নাটাদা লক্ষ করেছে এবং নিজের সঙ্গে মিলিয়েছে। সে গুণ্ডাগিরির পেশাকে সম্মান করে। সে তার নিজের পেশাকে নিয়ে কখনো আক্ষেপ করেনি। দিব্যি জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু নবীন প্রজন্মের সংকীর্ণতাকে বুঝতে পারলেও তাদের বিলাস-বৈভবকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ নাটাদার সময়ের গুণ্ডারা অল্পেতেই খুশি হত। তাদের জীবনকে ঘিরে বিলাসিতার জায়গা বড়ই অল্প ছিল। আর এযুগের গুণ্ডারা তাদের সখের জগৎকে প্রসারিত করেছে বহুদূর। অর্থাৎ ভোগবাদী মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটাদার এসবের প্রয়োজন ছিল না। সে নিজের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম-এর সরকার গঠনের লড়াইয়ের চিত্রও তুলে ধরেছে রাজনীতির চালচিত্রের একটি প্রেক্ষাপটের ভাব তাঁর কথায় উঠে আসে—

> *"ফাস্ট ইলেকশানটা মনে আছে আমার। ভোট দেবেন কিসে কাস্তে ধানের শিসে। বলদের দুধ নেই কংগ্রেসের ভোট নেই। তখন বোমাবাজি হত না এমন। সেভেনটিতে বোমা বেঁধেছি। কাজে লাগিয়েছি। ... এখন নিজে হাতে কাজ করার দিন শেষ। মাল বাইরে থেকে আসে। পেটো তৈরির লোক বাইরে আছে।"*[৬]

সময়ের পট পরিবর্তনের চিত্র একের পর এক বক্তব্যে উঠে আসে। নাটাদার জীবনের প্রথম পর্বের সঙ্গে রাজনৈতিক বাতাবরণ কীভাবে জড়িয়ে ছিল তা স্পষ্ট হয়। আঠারো-কুড়ি বছর বয়স থেকেই নাটাদা 'নাটা গুণ্ডা' নামে বেশ পরিচিতি লাভ করে। তখন সালটা ১৯৬০/৬২। এই সময়েই নাটাদা সিনেমা হলের টিকিট লাইনের কাজে যোগ দেয়। হাতিবাগান এলাকার চিত্রা আর দর্পণ সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাকের কাজে বেশ নাম-যশ কুড়িয়ে নেয় নাটাদা। পতিতাপল্লীর সূত্রেই তার এই কাজে যোগদান। আসলে চিত্রা হলের ম্যানেজার ঐ পল্লীর নিয়মিত কাস্টমার। ফলে নাটাদার সঙ্গে তার পরিচয় এবং কাজের সুযোগ পাওয়া। সিনেমা জগতের সঙ্গে নাটাদার যোগসূত্র

সিনেমা হলের টিকিট ব্রোকারের পদ থেকে। তবে প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষে। একজন রসজ্ঞ সিনেমা পিপাসু মানুষের দৃষ্টি থেকে। নাটাদার হাত ধরে উত্তম, সুচিত্রা, দিলীপকুমার-এর সুবর্ণ দিনের কথা এসেছে। অন্যায়ভাবে গায়ের জোরে টিকিট নিতে আসা চামচাগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সমকালীন শহর কলকাতার বাঙালির সমাজচিত্র কীভাবে সিনেমা দেখার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সে বিষয়টিও নাটাদার বক্তব্যে উঠে এসেছে—

> *"তখন ফুটপাতে হকার ছিল না। পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজির ঘোড়াটা ছিল না। রাস্তার রোল আর চাউ-এর ঠেলা গাড়ি ছিল না। ফিস ফ্রাইতে ভেটকি মাছ দেওয়া হত, ঠাকুরপোরা বউদিদের জন্য ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কিনে আনত। সরযূবালা, ভারতী দেবী, অসিতবরণ, ধীরাজ ভট্টাচার্য এরা তো ছিলই, কমল মিত্র, পাহাড়ি সান্যাল, তারপর উত্তম-সুচিত্রা। জামাইবাবুরা শালাশালিদের নিয়ে সিনেমা দেখতে আসত, কত জা-এ জায়ের ঝগড়া মিটেছে সিনেমা দেখতে এসে। কত ননদ বউদিদের খিচাইন মিউচুয়াল হয়ে গেছে এই সব সিনেমা হলে।"*[৭]

নাটাদার একাধিপত্য একসময় তার এলাকায় তাকে দাপুটে গুণ্ডায় পরিণত করেছিল। কিন্তু নাটাদার চরিত্রের মধ্যে সততা, সহমর্মিতা এবং মানবিকতার পরিচয়ও আমরা পাই। নাটাদা বোনের বিয়ে দিয়েছিল। বোনজামাই কাজ থেকে নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছত সকাল বেলা। আবার দুপুরেই বেরিয়ে পড়ত কাজে। ছেলেটি সিনেমা হলে প্রজেক্টর-ম্যান-এর কাজ করত। বোন আর বোনজামাইয়ের দাম্পত্য সম্পর্কে ভাটা পড়ত দেখে নাটাদার মা মারা যাওয়ার পরে তাদের নেবুতলার বস্তিবাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু নিজে কোথায় শোবে? তার মত গুণ্ডার রাস্তায় শোয়া বিপদজনক। তাই সিনেমাহলেই শোয়ার ব্যবস্থা করে ফেলে নাটাদা। লক্ষণীয়, নাটাদা পতিতাপল্লীতে যাতায়াত করেছে ঠিকই কিন্তু কারুর 'বাবু' হয়নি বা কাউকে নিয়ে সংসার জীবনের স্বপ্নও দেখেনি। একা বেশ জীবনটাকে উপভোগ করে চলেছিল। জীবন-যৌবন-যৌনতা নিয়ে তার একটা আলাদা জগৎ ছিল, ভাবনা ছিল। সেই ভাবনার জগতে নারী সঙ্গ ত্যাগ করাই সঙ্গত বলে মনে করেছে এক সময়। কিন্তু জীবন তো একরকম ভাবে চলে না। জীবনের মোড় ঘোরানো পর্ব আসে। নাটাদার জীবনেও সে পর্ব উপস্থিত হয়েছিল। নাটাদা ভেবেছে তার জীবন নিয়ে সিনেমা হবে না। হলেও তা ফ্লপ সিনেমা হবে। কিন্তু সত্যি এই ধারণা পাঠকের সামনে বদলে যায়। নাটাদা নিজেও তার পালাবদলকে উপলব্ধি করে।

এক ফুলওয়ালির দোকানে রোজ বেলপাতা কিনতে যেত নাটাদা। তার পৌরুষত্বকে সংযমের মধ্যে রাখার জন্য। সেই থেকে নাটাদার সঙ্গে ফুলওয়ালির আলাপ। ফুলওয়ালির নাম জবা। তার স্বামী মধুসূদন জেলে রয়েছে। জবা তার দ্বিতীয় স্ত্রী। জেল থেকে ফিরে এলে স্বামীর সঙ্গে সে পুনরায় ঘর করবে এই আশায় সে রয়েছে। কিন্তু নাটাদার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সংসার পাতে নাটাদা। জবা পরস্ত্রী। পরস্ত্রীর সঙ্গেই তার সংসার জীবনের শুরু করে। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেও নাটাদা তাদের সঙ্গে কাজ করতে চায় না। সে সততায় বিশ্বাসী। সে অটল চরিত্রের মানুষ। আদর্শকে আগলে রেখে বাঁচতে চায়। তাই জবাকে বিয়ে করতে চায় নাটাদা। কিন্তু জবা পতিব্রতা স্ত্রী। কারণ, জবা যখন চালের লাইনে কাজ করত সে সময় মধুসূদন তার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছিল। মধুসূদনের একটা আলাদা সংসার ছিল। তবে জবাকে নিয়ে সংসার বাঁধলে আগের স্ত্রী কোনো রকম বাধা দেয়নি। কারণ মধুসূদনের চরিত্র। সে সবার ভালোবাসা আদায় করে নিতে জানত। জবার ভাষায়— জেলের কর্মী, এমনকি, কয়েদিরা পর্যন্ত মধুসূদনকে ভালোবাসত। জবার বিশ্বাস ছিল মধুসূদন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলে তার সঙ্গে ঘর করবে। কিন্তু নাটাদা সংশয় প্রকাশ করে। জবা তার প্রতিউত্তরে বলে—

> *"আমার স্বামী বিশ্বাস করে গঙ্গার জল যেমন অপবিত্র হয় না, মেয়েছেলেও অপবিত্র হয় না। পেট না হলেই হল। মনে কর আমার একটা হোটেল বাঁধা আছে। ওই হোটেলেই খাই। কিন্তু যদি ওই হোটেল উঠে যায়, তবে অন্য হোটেলে খাব না?"*[৮]

জবার মানসিকতার মধ্যে যেমনই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, জবা নারী। তার মধ্যে স্নেহ, মমতার ছোঁয়া রয়েছে। যে আঁচলের সন্ধানী নাটাদা, যে আঁচলের বন্ধনে নারীকে সে দেখে, সেই আঁচলের অধিকারী জবা। একটা পরিপূর্ণ সংসার জীবন-যাপন করে চলেছে নাটাদা জবার সঙ্গে। শুধু সন্তানের পিতা হওয়া হয়নি জবার বন্ধ্যাত্বের জন্য। তবে কর্মঠ-নারী জবা নাটাদার সঙ্গে সমানতালে সংসারে অর্থের যোগান দিয়ে গেছে। মধুসূদনের প্রথম স্ত্রীর সংসারে দু'ই সন্তান। তাদের নিয়ে কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে দেখে জবা তার সতীনকে সাহায্য করেছে। মধুসূদন জবার দ্বিতীয় স্বামী। প্রথম স্বামী জবার বাচ্চা হচ্ছে না দেখে তার সঙ্গে সংসার করেনি। দ্বিতীয় স্বামী মধুসূদন পাত্র। মধুসূদন যেহেতু তার কষ্টের দিনে পাশে ছিল তাই তাকে কিছুতেই ভুলে যেতে পারে না জবা। এক বিচিত্র জীবনের পরিচয় নাটাদার সম্মুখে উপস্থিত হয়—

> *"মানুষ কী বিচিত্র মাইরি, কী বলব। শুধু মানুষ দেখার জন্যই আমার বেঁচে থাকতে*

ইচ্ছে করে। লোকটা আমার বাড়িতে এল। সঙ্গে একটা মেয়েছেলে। মানে মধুসূদন পাত্রর এক নম্বর। জবার সতীন। বলল নিতে এসেছি। আমি তখন ছিলাম বাড়িতে। জবা ওদের দানাদার খাওয়াল, জল খাওয়াল।''[৯]

প্রত্যেকটি জীবনমুখী মানুষই চায় জীবনকে জানতে, বুঝতে। নাটাদাও এক উৎফুল্ল জীবন-অনুসন্ধানী মানুষ। তার সামনে অজস্র মানুষের ভিড়। তাদের বিচিত্র জীবন কাহিনি তাকে আরও বাঁচার রসদ জোগায়। মধুসূদন পাত্রের লড়াই করার চিত্রও নাটাদাকে অনুপ্রেরণা যোগায়। জবা নাটাদার কাছেই রয়ে যায়। মধুসূদন পাত্র চুরি করার কাজ ছেড়ে দিয়ে চপ-ভাজার কাজ শুরু করে। একটা ধারাবাহিক ছন্দে নাটাদার জীবন চলতে থাকে।

জীবনের চলমানতায় কতকিছুই দেখা হয় আবার কতকিছু দেখা বাকি থেকে যায়। নাটাদার গুণ্ডাগিরি জীবনে হঠাৎ বাঁক বদল ঘটেছিল জবার আগমনে। আবার বাঁকবদল ঘটল খেঁদির আগমনে। কে এই খেঁদি? পাঁচি মাসির পালিত মেয়ে। পাঁচি কে? পাঁচি রাস্তার পাগলি। সে শীতলা মন্দিরে থাকত। তার ভক্তও ছিল বেশ কিছু। নাটার পাঁচি পাগলিকে ভালোলাগার কারণ—

"কথা কম বলত, বিড়বিড় করত বেশি। মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করত। আজকের দিনে দেখি, সত্যি হয়ে গেছে। যেমন গঙ্গায় আর ইলিশ আসবে না। মানুষের মুতে চিনির শরবত বেরুবে। তোদের উত্তমকুমার আর বেশিদিন বাঁচবে না। যুগান্তর কাগজ উঠে যাবে। ভদ্রলোকের মেয়েরা মাই দেখিয়ে ঘুরবে।''[১০]

এক অসাধারণ চরিত্র পাঁচির। নাটাদার জীবনে পাঁচি চরিত্রের এক গভীর প্রভাব পড়েছিল। পাঁচি ভবিষ্যৎবাণী করতে জানত। তার কিছু সত্য হলেও কিছু আবার মিলত না। তবে মানুষের তার ওপর অচলাভক্তি। নাটাদাও জীবন সম্পর্কে গভীর কিছু উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল পাঁচির সঙ্গলাভের পর। নাটাদা পাঁচি মাসিকে তার জীবনে সুখ আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় পাঁচি পাগলি এক অমোঘ তত্ত্ব উপস্থাপন করে—

"... সুখ কি গাছের আম নাকি লগি দিয়ে পাড়বি, না কি বাঁট, দুইলেই পড়বে? সুখ হচ্ছে নিজের তৈরি গ্যাস-অম্বল। নিজের মধ্যে তৈরি হয়। ওটা হল ভাবনা। যদি ভাবিস সুখী তবেই সুখী। যেমন আমি সুখী। আমার ঘর নেই, বাড়ি নেই, স্বামী নেই, পরিবার নেই। কিন্তু সুখী।''[১১]

জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করেছিল পাঁচি। খেঁদিকে পাঁচি কুড়িয়ে পেয়েছিল। কুড়িয়ে পাওয়া

মেয়েটিকে বহু যত্নে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেছিল পাঁচি মাসি। মুখার্জি রোডের হরি সাহার বাড়িতে পাঁচির থাকার ব্যবস্থা হয় ভবিষ্যদ্বাণীর দরুণ। হরি সাহার নাত-বউয়ের গর্ভবতী হওয়ার কারণ পাঁচির টোটকা। হরি সাহার নাত-বউয়ের বাচ্চা হওয়ার পর থেকে পাঁচির নাম ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচি তার মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় পায় হরি সাহার পরিত্যক্ত আস্তাবলে। শুধু আশ্রয় নয়, খেঁদির খাবারের যোগানও সে বাড়ি থেকে হতে শুরু করে। তাদের সৌজন্যেই খেঁদি করপোরেশনের স্কুলে ভর্তি হয়। পাঁচি পাগলির উত্তরণ ঘটে 'পাঁচি মা'-এ। সময় ক্রমে সত্তর দশকের দিকে পা বাড়ায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। নাটাদার গুণ্ডাগিরি চলতে থাকে। নাটাদা শুনল— 'সত্তর দশক মুক্তির দশক', শুনল— 'লুম্পেন প্রলেতারিয়েত', 'শ্রেণিশত্রু'। জীবনের কত পরিবর্তন ঘটে। পতিতাপল্লীটি উঠে গেল নকশাল আন্দোলনের পর। সেখানে 'প্রফেসরস কোয়াটার' তৈরি হল। সেই নির্মাণের জন্য নাটাদা সাপ্লায়ারের কাজ নিল। কারণ ততদিনে সিনেমা হলের কাজে ভাটা পড়েছিল। ধীরে ধীরে নাটাদা তার প্রতাপ হারাতে থাকে। সংসারী হয়ে পড়ে। তবে বিয়ে করা হয় না জবাকে বা সন্তানও জন্ম দেওয়া হয় না। অন্যরকম জীবন কাটতে থাকে নাটাদার। লটারিতে কিছু টাকা পেলে নাটাদার পসার বৃদ্ধি পায়। জবাকে নিয়ে পুরী গেলে মানিকের সঙ্গে দেখা হয়। সে জুঁইয়ের সঙ্গে তার ছেলেকে নিয়ে দিব্যি সংসার জীবন পালন করছে। জুঁই বা মানিক কেউই আর দেহব্যবসার লাইনে নেই। দু'জনেই চলমান দাম্পত্য সম্পর্কে জীবন কাটাচ্ছে সেখানে। জীবন নদী কত কিছুর উপলব্ধি ঘটায়। মানিক আর নাটা দু'জনেই জীবনের একটা পর্যায়ে একসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছে বিপরীত মুখে। কিন্তু আজ দু'জনেই সংসার করছে বেআইনি বউ নিয়ে।

বাংলায় শাসক বদল ঘটল। নাটাদার জীবনেও ঘটল স্থান পরিবর্তন। কংগ্রেস জামানা বদলের ফলে নাটাদার সম্মান কিছুটা ক্ষীণ হল। সবাই ধীরে ধীরে দল বদল করলেও নাটাদার দ্বারা সেটা সম্ভব হল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নাটাদার পোষাকেরও বদল ঘটল। চিরকাল জীবন একরকমভাবে চলতে পারে না কারুর, সেটা নাটাদা বুঝতে পেরেছিল। একটা ছকে বাঁধা জীবনে জবার সঙ্গে কেটে যাচ্ছিল নাটাদার। কিন্তু পাঁচি মাসির অসুখ এবং আসন্ন মৃত্যু সবকিছু ওলটপালট করে দেয়। পাঁচি মাসি মৃত্যু শয্যায় নাটাদার হাতে খেঁদিকে তুলে দেয়। খেঁদির বয়স আঠারো। নাটাদার বিয়াল্লিশ। আসলে কোন্ পরিচয়ে খেঁদিকে নাটাদা গ্রহণ করবে সেটা স্পষ্ট বলে দিয়ে যায়নি পাঁচি মাসি। ফলে নাটাদা দোলাচলতার মধ্যে পড়ে। খেঁদিকে সাহা বাড়িতে রাখা যায় না, কারণ ও-বাড়ির পুরুষদের ওর উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। অগত্যা খেঁদিকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে যেতে হল নাটাদাকে। জবার হাতে খেঁদিকে তুলে দিয়ে নিজের মেয়ের মত দেখার কথা নাটাদা বললেও জবা খেঁদিকে ভালো

মনে গ্রহণ করেনি। জবার আশ্রয় হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা শুরু হয়। খেঁদির প্রতি কোনো আলাদা ভাব নাটাদা না দেখালেও জবার মনে সন্দেহ বাসা বাঁধে। ফলত জবা আর বেশিদিন নাটাদার সঙ্গে না থেকে স্বামী মধুসূদনের কাছে ফিরে যায়।

খেঁদি আর নাটাদার জীবন যাত্রার কোনো চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেননি। শুধু নাটাদা গল্প কথককে বলেছে—

> *"... জবা চলে গেল। বাড়িতে আমি আর খেঁদি। সেটা আরেকটা সিনেমা। চোদ্দো রিলে। পরে বলব। তবে একদম লাস্ট সিনে আছে একটা বিয়ে। আমি পিঁড়িতে বসে পুরুত ডেকে খেঁদিকে সম্প্রদান করছি। জবা, মধুসূদন, মানিক, জুঁই ওরাও আছে। কমেডি সিনেমায় যেমন লাস্ট সিনে সবাই থাকে। শীলবাবু নেই মারা গেছে। ওটা ১৯৮৪ সাল। পাত্রটি কে জানিস? মানিকের ছেলে। ভুল বললাম। জুঁইয়ের ছেলে। জুঁই যাকে ওই বিহারী বাবুর ছেলে বলে ভাবে। লাস্ট সিন। ক্যাসেটে সানাই বাজছে।''*[১২]

একেবারে অন্য এক জগতের মধ্যে প্রবেশ ঘটে পাঠকের। পাঠক অনেকটাই আন্দাজ করে নেয় নাটাদার জীবনের দায়িত্ববান অভিভাবকের পর্যায়। কিন্তু সমান্তরাল সরলরেখায় জীবন চলতে পারে না। নাটাদার বক্তব্য থেকে মনে হয়েছিল তার জীবনও শেষ পর্যন্ত 'মধুরেণ সমাপয়েত' এ পর্যবসিত হয়েছিল। উপন্যাস কথককে নাটাদার জীবন বৃত্তান্ত রেকর্ড করতে দেখি আমরা। কিন্তু নাটাদার জীবনের চোদ্দো রিলের সিনেমার কথা আর শোনা হয় না। কারণ কাজের চাপে কথক দীর্ঘদিন নাটাদার কাছে যেতে পারেনি। এর মধ্যে নাটাদার গলায় ক্যান্সার ধরা পরেছে। পেটে অপারেশন হয়েছে, সে এখন শয্যাশায়ী। কথকের আক্ষেপ শুনে নাটাদা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুকাভিনয় করতে থাকে। সে বলার চেষ্টা করে তার জীবনের সমাপ্তির গল্পটা যা আগে বলা হয়নি। সেও চেয়েছে তার জীবনের রংবেরঙের কাহিনি সবাই জানুক। জীবন তাকে কোন উপান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে তা জানাতে চেয়েছিল নাটাদা। নাটাদার মূকাভিনয়ে অনেক না বলা কথারা ভিড় করে। কথক বোঝার চেষ্টা করে প্রতিটি ভঙ্গি। কিন্তু শেষ মুহূর্তের একটি দৃশ্য বিদ্যুতের চমক লাগিয়ে দেয়। কথক বলেন—

> *"নাটাদার কথা বলা শেষ হয় না। তারপর হনুমানের বুক চিরে ফেলার মূকাভিনয় করে। বুকের মধ্যে কিছু লেখা আছে যেন, পড়তে হবে। আমার চোখ দেখে বোঝে আমি বুঝতে পারছি না। নাটাদা তখন লুঙ্গিটা খুলে ফেলে। দেখি ওর*

উরুতে লেখা 'আমার খেঁদি'। উল্কি করা। যা শত সাবানেও ওঠে না।''[১৩]

নাটাদার গোপন বাসনার চিত্র উন্মোচিত হয় কথকের সামনে। একটা নিষিদ্ধ অধ্যায়ের পর্দা সরে যায়। নাটাদা তার জীবনের কোনো অংশই ঢেকে রাখতে চায়নি। নাটাদার জীবনবোধ তাকে উৎসাহী করেছিল তার জীবনের কাহিনি বর্ণনা করায়। ফলে নাটাদা যখন জীবনের শেষ পর্বের কাহিনি বলতে চেয়েছে, কিন্তু অসুস্থতা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নাটাদা সে বাধা অতিক্রম করে সমস্ত কিছু উন্মোচন করে দেয়। কথকের সামনে উন্মোচিত হল খেঁদি সম্পর্কে নাটাদার গোপন ভাবনা। তবে পাঠকের কাছে কিছু প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়। খেঁদির সঙ্গে নাটাদার কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল নাকি খেঁদিকে ঘিরে নাটাদার ভাবনা সম্পূর্ণ নিজের? আসলে মানব চরিত্র বড় বিচিত্র। জীবনের পর্বে পর্বে মানব চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয় বহুদিক দিয়েই। জীবনে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। নাটাদার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এত দিনের নাটাদাকে হঠাৎ যেন কোথায় অন্যরূপে উপস্থিত হতে দেখা গেল। জীবন যে কত ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করায় তা নাটাদার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানুষ খোঁজার কারিগরের ভূমিকায় নাটাদা চরিত্রকে খুঁজে পেয়েছেন। আমাদের সমাজে নাটাদার মত দাদাগিরি করতে থাকা চরিত্রের অভাব নেই। তাদের মধ্যে নাটাদা চরিত্রের বিশেষত্ব তার মানবিকতাবোধের জায়গা থেকে। মায়ের আদর্শ নিয়ে বড় হয়েছে নাটাদা। পরিস্থিতির কারণে তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হয়। মানিকের সঙ্গ তাকে গুণ্ডাগিরি পাঠ শেখায়। মানিক দাদা চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু নাটাদাকে সে পথের পাঠ নিতে সাহায্য করেছে। মানিকের সাহায্যেই যৌনজীবনের হাতিখড়ি লাভ করেছে নাটাদা। কিন্তু নারী শরীরকে শুধুমাত্র যৌনতার প্রয়োজনে ব্যবহার না করে সে নিজের হাতের ওপরই ভরসা রেখেছে। নাটাদার কাছে নারীর অর্থ স্নেহময়ী রূপ। স্নেহময়ী রূপকেই খোঁজার চেষ্টা ছিল অন্তরে। নিজের পেশার প্রতি ছিল চরম আস্থা, ভালোলাগা। পরিপূর্ণ আস্বাদ নিয়েছে নিজের গুণ্ডাগিরির। নিজের ওপর ভরসা এবং গর্ব দুটোই ছিল তার। সে জীবনকে সুখের জায়গা থেকে উপলব্ধি করেছে। কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি তার মুখ থেকে। উপন্যাস কথককে নিজের জীবন বৃত্তান্ত বলার উৎসাহও ছিল তার। কারণ, নাটাদা জীবনকে উপভোগ করেছিল, নিজের মতো করে বাঁচতে শিখেছিল। তার চরিত্রের ধাপে ধাপে বহু ঘটনাই শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে। কলকাতার মস্তানরাজের ঘটনা যেন কোথায় মনুষ্যত্ববোধের জায়গায় উত্তরণ ঘটে। নাটাদার মুখেই শোনা অন্যসব গুণ্ডাদের বৃত্তান্তের সঙ্গে সে সময়ের প্রতাপশালী গোপাল পাঁঠার কাহিনি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক

হয়েছে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নাটাদাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। নাটাদার সৎপথে চলার কাহিনি একজন গুণ্ডাকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়। নাটাদার কাহিনি শুনতে শুনতে আমাদের সামনে ষাট-সত্তর দশকের হালহকিকত উপস্থিত হয়। ঔপন্যাসিক সন্তর্পণেই সে সময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণকে তুলে ধরেছেন। রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার চিত্রও ফুটে উঠেছে। এসেছে সিনেমা জগতের সঙ্গে সামাজিক-পারিবারিক চিত্রের গঠন বৈচিত্র্যের ছবি। নাটাদার জীবনের বহুরূপী চিত্র আমাদের সামনে বহু মানুষের কল্পনাকে হাজির করিয়েছে। পতিতাপল্লীর নারীদের জীবন যন্ত্রণার চিত্র যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা পূর্ণ গবেষণার দাবি রাখে।

একুশ শতকের পরিবর্ধিত সামাজিক-রাজনৈতিক চালচিত্র উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় যে সমাজে প্রবেশ করেছে তার চিত্রও উঠে এসেছে। নাটাদার সময় আর বর্তমান সময়ের গুণ্ডাগিরির সংজ্ঞা যে বদলে গেছে তার চিত্রও নাটাদার বক্তব্যে রয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের ভোল বদলের সঙ্গে নাটাদার ভোল বদল ঘটেনি বা সে নিজেও চায়নি। আদর্শ বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার জীবনে মানিক, জবা, পাঁচি, খেঁদি এদের ভূমিকা সর্বত্র। নিজের ক্ষমতা সীমিত হওয়া থেকে শুরু করে জবার সঙ্গে সুখে সংসার করা, পাঁচি মাসির ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর ভরসা করা, খেঁদির দায়িত্ব নিয়ে ভালোভাবে পালন করতেও দেখা গিয়েছে নাটাদাকে। এক গুণ্ডার সাধারণ সংসারী মানুষে উত্তরণের চিত্রই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। তবে উপন্যাসের শেষে খেঁদিকে ঘিরে যে উদ্মাদনার চিত্র দেখা যায় তা আসলে নাটাদার ভিতরে যে মানুষটি লুকিয়ে ছিল, যা প্রকাশ মাধ্যম পায়নি তারই বহিঃপ্রকাশ। জীবনের গতিপথ আমাদের সামনে বহুভাবে বহু চমক নিয়ে উপস্থিত হয়। আমরা তার উত্তর খুঁজি। অদেখা অধ্যায়কে দেখার চেষ্টা করি। আসলে মানুষের অভ্যন্তরে অন্য এক মানুষেরও অবস্থিতি থেকে যায়। সেই অবস্থিতির চিত্রই 'নাটাদা' উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী জীবনকে দেখার শিল্পী। জীবনকে তিনি বহুভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং বহু বিচিত্র চরিত্রের জীবন জিজ্ঞাসা তাঁর উপন্যাসে ভিড় করে থাকে। একুশ শতকের কিছু ভাবনা তাঁর উপন্যাসে জড়িয়ে থাকে যা সময়কে ধরতে সাহায্য করে। পরবর্তী উপন্যাসের গ্রন্থি উন্মোচনে এবার পদার্পণ করব।

২

'পরবাসী' উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০১০ সালে প্রকাশিত। আমেরিকার প্রবাসী বাঙালির জীবন কথা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয়বস্তু। বসন্তকুসুম পড়াশুনোর জন্য আমেরিকা যান। পড়াশুনো শেষ

করে দেশে ফেরার কথা ছিল কিন্তু বসন্তকুসুমের আর ফেরা হয় না। বিয়ের পর বউ আর পুত্র সন্তানও আমেরিকায় পাড়ি দেয়। কারুরই আর ফেরা হয় না। বসন্তর বাবা-মা এই আশাতেই দিন গুণতে থাকেন যে, ছেলে আর তার নাতি-নাতনিদের তারা কাছে পাবেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হয় না। একে একে বসন্তর বাবা ও মা মারা যান। মা মারা যাওয়ার পর বসন্তকুসুম বাবার কারখানাবাড়ি ও বসতবাড়ির বন্দোবস্ত করতে আসেন। কারণ এদেশে তাঁর আর ফেরৎ আসার কোন কারণ নেই। তাঁর ছেলে-মেয়ের কলকাতার প্রতি কোনো টান নেই। আমেরিকাই তাদের দেশ। বসন্তও অনুভব করেন তাঁর স্বদেশ এখন কলকাতা নয়, আমেরিকা। পড়ন্ত বয়সে এসে বসন্তকুসুম কলকাতায় তাঁর বাবার বসতবাড়িটি কীভাবে বাবা-মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দান করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কারণ, কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতি। বিশ শতকের ষাটের দশকে যে কলকাতাকে বসন্তকুসুম ছেড়ে গিয়েছেন সে কলকাতার সঙ্গে রয়েছে একুশ শতকের প্রথম দশকের বহু পার্থক্য। সর্বত্র গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব। তাই বারবার উঠে এসেছে কলকাতার ব্যাপক পরিবর্তনের রূপ। আমেরিকার সঙ্গে তুলনা, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, গ্রামীণ ভারতবর্ষের রূপ পরিবর্তন হওয়ার বহু বিচিত্র ঘটনা। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতবাসী ধর্মকে নিয়ে যে মূল্যবোধের জায়গায় পৌঁছেছে তা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। বসন্তকুসুম কলকাতার বাড়ি প্রমোটারকে দিয়ে দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কয়েকদিন দেরি করেন। এই সুযোগে তিনি আমেরিকার বন্ধু পি.কে.-র সঙ্গে তাঁর গ্রাম বাকিলা পরিদর্শনে বের হন। কারণ, বসন্তকুসুম রোটারি ক্লাবের সদস্য। ফলে কিছু ডোনেশনের মাধ্যমে যদি গ্রামের উন্নতি করা যায়। পি.কে. ওরফে প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল। তার বাবার আদেশ ছিল পি.কে. দেশের জন্য কিছু করবে। তাই শেষ বয়সে পি.কে সে উদ্যোগ নেন। গ্রামে গিয়ে জানতে পারেন গ্রামটি আর্সেনিক সংক্রমিত। পি.কে বা বসন্ত দু'জনের কাছেই গ্রামীণ ভারতের রূপ পরিস্ফুট হয়। কারণ, ভারত চাঁদে উপগ্রহ পাঠাবার উদ্যোগ নিলেও গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন সাধনে অপারগ। তীব্র দেশপ্রেম জাগ্রত হলেও দু'জন আমেরিকাবাসী বাঙালির পরবাসী হয়ে থাকার গ্লানি কাজ করতে থাকে। উপন্যাসের ঘটনা মূলত বসন্তকুসুমকে ঘিরেই আবর্তিত। দীর্ঘদিন পরে কলকাতায় আসার ফলে পরিবারের বহু সদস্যর সঙ্গেই সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয়ে যাওয়ার একটা আভাস তিনি পান। কিন্তু বসন্ত আমেরিকায় থাকার ফলে তাঁকে ঘিরে কিছু মিথ ঘুরে বেড়ায়। একদিন সকালে বসন্তর কাছে তাঁর বাল্যবন্ধু ভুঁটে, মুড়ি মাসির ছেলের অভিপ্রায় তাঁর সামনে অনেকটাই স্বদেশের রূপকে তুলে ধরে। ভুঁটে বর্তমানে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলের ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য টাকা চাইতে আসে, মদন ব্রেন নিয়ে একটা থিসিস পেপার আমেরিকায় পাঠানোর

ইচ্ছা প্রকাশ করে, দুলু চায় তার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত মেয়ের রক্তের ব্যবস্থা করতে যাতে সে তার যৌবনকে উপভোগ করতে পারে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ভারতবর্ষের রূপ পরিবর্তন হওয়ায় বসন্ত অভিভূত হন। তিনিও কি এতটা প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড হতে পেরেছেন, এই প্রশ্ন জাগে তাঁর মধ্যে। আমেরিকা বাঙালীত্ব নষ্ট করেছে একথা বসন্ত মেনে নেন। কারণ, তাঁর ছেলে মেয়ে দু'জনেই আর কেউই বাঙালি নয়, ভারতীয় নয়। তারা আমেরিকার জীবন-চর্যাকে আপ্রাণ গ্রহণ করেছে। ফলে বসন্ত তাঁর বাঙালি সত্তাকে আর তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। স্ত্রী ছন্দা ওদেশে গিয়ে সেখানকার জীবনকে এতটাই গ্রহণ করেছে যে বসন্ত কলকাতায় আসার পর তার সারাক্ষণ চিন্তা লেগে থাকে বসন্তর ফুট পয়জন না হয়ে যায়। আর্সেনিক অধ্যুষিত গ্রাম থেকে ফেরার সময় পি.কে আর বসন্ত দু'জনে বহুদিন পর কচুরি আর তেলেভাজা খান। সেটা খাওয়ার পর থেকেই বসন্তের মনে ভয় দানা বাঁধে। বাড়িতে এসে স্ত্রী ছন্দার 'বিদেশিনী' বলে ছাপানো একটি ডায়রি হাতে আসে, মায়ের লেখা আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনিও হাতে আসে বাক্স বন্দি ডায়ারি থেকে। কিন্তু এসবের মাঝে বসন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ বসন্ত অনুভব করেন কীভাবে তিনি আমেরিকান হয়ে উঠেছেন। কীভাবে তাঁর নাড়ির টানকে আমেরিকা ছিন্ন করে আজ তাঁকে পরবাসী করে তুলেছে। মূল কাহিনি এটুকুই।

'পরবাসী' উপন্যাসটি বসন্তকুসুম চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে দেখা কলকাতা ও আমেরিকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। তিনিই উপন্যাস কাহিনির বাহক। ষাটের দশকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেন। তারপর সেখানে চাকরি এবং পরে ব্যবসায়ী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কলকাতার বাগবাজার এলাকায় বড় হয়ে ওঠার পর তাঁর আমেরিকা যাওয়ার প্রসঙ্গ এবং ভারতবর্ষ ও আমেরিকার তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। দেশের মাটিতে পা রাখার পরে দু'দেশের পার্থক্য বুঝেছেন। মা-বাবার তাঁকে ঘিরে আকাঙ্ক্ষা বুঝেও কলকাতায় তিনি ফিরে আসতে পারেননি। আমেরিকা কীভাবে মানুষকে গ্রাস করে তার কাহিনি উপন্যাসটিতে রয়েছে। দেশের জন্য ব্যাকুল প্রাণও যে একসময় হেরে যায় আমেরিকার জৌলুসের কাছে তার চিত্র উপন্যাসটির পটভূমি।

উপন্যাসের কথক বসন্তকুসুম চক্রবর্তী একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় এসেছেন এদেশের পাঠ চুকিয়ে ফেলতে। মা মারা যাওয়ার পর দীর্ঘ তিন বছর বাদে কলকাতায় পা রাখে বসন্তকুসুম। বাড়ির কেয়ার টেকার জয়ের ভরসায় তিনি একা প্রথমবার কলকাতায় এলেন। স্ত্রী ছন্দা এবারে তাঁর সঙ্গে আসেননি। ফলে বিশেষ যত্নের মধ্য দিয়ে বসন্তকুসুম চলেছেন। নিজের

মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অনাস্থা জন্মেছে। আমেরিকার 'পরিচ্ছন্ন' এবং 'সিস্টেমেটিক' জীবনে অভ্যস্ত হওয়া বসন্তকুসুম মাতৃভূমিকে আজ সাদরে গ্রহণ করতে পারছেন না। ষাটের দশকে কলকাতার চিত্র বুকে বহন করে বসন্তকুসুম বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। পিএইচ.ডি. করার পর তিনি আর দেশে ফিরতে পারেননি। বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলে পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরবে। কিন্তু বসন্তকুসুমের আর ফেরা হয় না। কলকাতার মেয়ে বিয়ে করলেও বসন্তকুসুম তাঁকে নিয়ে দেশে সংসার করার কথা ভাবতে পারেননি। স্ত্রী ছন্দাকে নিজের কাছে রেখে আমেরিকায় গৃহস্থালী শুরু করেন। একসময় আমেরিকার সিটিজেনশিপ পেয়ে গেলে আর দেশে ফেরার কোনো উদ্যোগই তিনি নেননি। বাবা-মাকে কয়েকবার দেশে ফেরার আশ্বাস দিলেও তাঁরা বুঝে যান ছেলে আর ফিরতে পারবে না। এক অপ্রকাশিত কষ্ট নিয়ে বসন্তকুসুমের বাবা-মা পরলোক গমন করেন। পিতৃ-মাতৃহীন বসন্তকুসুম বহুদিন বাদে কলকাতার বুকে পা রাখার পর তাঁর স্মৃতিচারণায় কলকাতার ষাটের দশক থেকে একুশ শতক পর্যন্ত পরিবর্তনের বহুচিত্র উঠে আসে।

একুশ শতকে আমরা গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বসন্তকুসুম আমেরিকায় বসে ভারতবর্ষের ছোঁয়া পাচ্ছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া নন্দীগ্রামের ঘটনার স্পর্শ আমেরিকার জনজীবনকে কোনোরকম প্রভাবিত না করলেও আমেরিকার টিন-এজাররা ভারতের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে জড়িত। ভারতের শিল্পপতি টাটা, বিড়লা, মিত্তাল, আম্বানিরা আমেরিকার খবরের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। বিউটি কনটেস্টে ভারতীয় মেয়েদের জায়গা হয়েছে। বলিউডের যোগসাধন হয়েছে আমেরিকার টিন-এজারদের জগতে। ভারতীয় ফ্যাশান আমেরিকানরা অনুসরণ করছে। যার একমাত্র কারণ বিশ্বায়ন। বসন্তকুসুমের স্মৃতির কলকাতা চিত্রের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ব্যস্ততম কলকাতার চিত্র, তার স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় সচেতনতার অভাব, অপসংস্কৃতির চিত্র, বস্তি এলাকার চিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু জেলায় আর্সেনিক দূষণ বসন্তকুসুম আর ছন্দাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ছন্দার নির্দেশে জয় ফলকাটার ছুরিটি পর্যন্ত মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নেয় বসন্তকুসুমের জন্য খাবার তৈরি করার সময়। কলকাতার নষ্টালজিয়া কোথায় যেন আজ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবাসী বসন্তকুসুমের কাছে। স্বভূমির প্রতি অবহেলার কারণে এবং দীর্ঘদিনের যোগসূত্র আলগা হওয়ার কারণে বসন্তকুসুমের কাছে কলকাতার আত্মীয়রা খুব কমসংখ্যকই দেখা করতে আসে বর্তমানে। যার প্রমাণ এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যাওয়ার চিত্র। এখন জয় ছাড়া আর কেউ থাকে না। আর ১৯৬৭ সাল নাগাদ পরিবারের দশ-বারোজন উপস্থিত থাকত। সঙ্গে প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু আমেরিকার প্রোডাক্ট উপহার হিসেবে নিয়ে আসতেন বসন্তকুসুম। এখন গ্লোবালাইজেশনের ফলে সমস্ত বিদেশি দ্রব্যই প্রত্যেকের হাতের

মুঠোয়। ফলে সে সব এখন অতীতে পরিণত হয়েছে। বসন্তকুসুমের স্মৃতিতে ভর করে বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি। বাগবাজার এলাকায় তাদের কালির বড়ি তৈরির কারখানাকে ঘিরে বহু স্মৃতি আশ্রয় নেয় তাঁর মাথায়। খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন সবই স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসতে থাকে। বসন্তকুসুমের ডাক নাম পাঁচু। পাঁচু নামের ইতিহাস মনে পড়ে যায়। কারণ বহুদিন সে নামে ডাকার লোকের সংখ্যা লুপ্ত হয়েছে। বসন্তকুসুমের আগে তাঁর মায়ের দুই সন্তান জন্মাবার পরে মারা যায়। তাই বসন্তকুসুম জন্মাবার পর মুড়িউলির কাছে পাঁচ কড়ি দিয়ে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল। সেই থেকেই তার নাম পাঁচু। এরকম নানা স্মৃতির উদয় হওয়ার মাঝে বসন্তকুসুমের সঙ্গে তিন ব্যক্তি দেখা করতে আসেন। এদের সঙ্গে আলাপ বসন্তকুসুমকে কলকাতার বর্তমান জীবনের আরো কাছাকাছি নিয়ে যায়। আমেরিকা প্রবাসী বসন্তকুসুম আজ নিজের দেশকে অনেক কাছ থেকে জানার সুযোগ পান। ছেলে উদ্দালক এবং মেয়ে মনা দু'জনেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তারা ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়ী হয়েছে। ইটালিয়ান পুত্রবধূ লুচিয়ার সঙ্গে সীমিত কথাবার্তাই হয়। স্ত্রী ছন্দা কলকাতার বাঙালি পরিবারে জন্ম এবং বেড়ে ওঠার কারণে বাঙালিসত্তার ছোঁয়া বসন্তকুসুম পেয়ে থাকেন। সব মিলিয়ে তিনি বিদেশে সুখেই আছেন। দেশের মাটির প্রতি এক অদ্ভুত টান অনুভব করেন এখনও। তাই দীর্ঘদিন বাদে কলকাতার মাটিতে পা রেখে নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে থাকা বসন্তকুসুম জীবনে আরও কিছু দেখার দোরগোড়ায় পৌঁছে যান। আসলে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী চরিত্রকে নিয়ে লিখতে বসে সমাজ এবং সময়কে এমনভাবে তুলে ধরেন যেন উপন্যাসটি হয়ে ওঠে সমাজের জীবন্ত দলিল। 'পরবাসী' উপন্যাসটিতেও তাই হয়েছে। একের পর এক চিত্র বসন্তকুসুমকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে যা তথ্য নির্ভর। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে যার ফলে বসন্তকুসুমের প্রবাসী হৃদয় স্বদেশের বিচিত্র রূপবদলকে অবলোকন করেছেন উৎসুক দৃষ্টিতে। কারণ, দীর্ঘদিনের যোগসূত্রহীনতা কলকাতার রূপ পরিবর্তনকে গভীরভাবে অনুভব করতে দেয়নি। একে একে তিন ব্যক্তির আগমন কলকাতার পরিবর্তিত সময় এবং মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলে। প্রথম ব্যক্তি আর্টিস্ট। এই ব্যক্তি পূর্বে বসন্তকুসুমদের বাড়ির দেওয়ালে প্রস্বাব করা আটকানোর জন্য হিন্দু দেবতার ছবি এবং জয়ের পরামর্শে '৭৮৬' লিখে দিয়েছিল। এই সূত্রে কলকাতার অপরিবর্তিত একটি চিত্র উঠে আসে বসন্তকুসুমের দৃষ্টিতে—

> *"আর গত চল্লিশ বছরে প্রস্রাব বানানটার কোনো সল্‌ভ্‌ হল না। পস্বাব, প্রসাপ, প্রেসাব, প্রেচ্ছাব আর কত রকমের বানান দেখতাম, এখনও বানানের বৈচিত্র্য কমেনি।"*[১৪]

যার হাত ধরে প্রস্রাব করার হাত থেকে বসন্তকুসুমের দেওয়াল রক্ষা পেয়েছিল সে আবার উপস্থিত

হয়েছে। কারণ আগের আঁকা ছবিগুলোর গায়ে আবার পূর্ব কর্ম শুরু হয়েছে। তাই আর্টিস্ট উপস্থিত হলে তাকে দিয়ে দেবতা নয়, জ্যোতি বসুর ছবি আঁকিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয় জয়। আর্টিস্টের কথায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং অবাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবের কথা উঠে আসে—

> *"আর্টিস্ট মাথা চুলকোল। বলল, স্যার, আমি জ্যোতি বসুর ছবি এঁকে দিতে পারব, ঠিকই, তবে স্যার, সত্যি বলতে কী, একটু ভয়ও করে। আঁকতে যদি একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়। তাছাড়া এই অঞ্চলে অনেক বিহারের লোক আসে, ওরা ছবিটা নাও তো চিনতে পারে। তার চেয়ে ভালো একটা ভালো করে বীর হনুমান বজরঙ্গ বলী এঁকে দি, সেই সঙ্গে কালীও থাক।"*[১৫]

আর্টিস্টের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের কলকাতা শহরের অভ্যাস পরিবর্তন না হওয়ার চিত্র যেমন ফুটে ওঠে তেমনি সংস্কৃতি বদলের অভ্যাসের চিত্রও উঠে এসেছে। আর্টিস্টের পর বসন্তকুসুমের বাল্যবন্ধু ভুঁটের জীবনানুসন্ধান সত্যি পাঠককে অভিভূত করে। টিকিট মস্তান ভুঁটে একসময় বসন্তকুসুমের সমস্তরকম শিক্ষাগুরু ছিল। লুকিয়ে মেয়েদের স্নান দেখা, কুমোরটুলির প্রতিমার সঙ্গে নারী অবয়বের রহস্যভেদ, সিনেমা হল থেকে মাস্টারবেশন পর্যন্তও বসন্তকুসুম শিখেছে ভুঁটের কাছ থেকে। বি.এস.সি. পাশ করে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার পর থেকে ভুঁটের সঙ্গে বসন্তকুসুমের যোগাযোগ কমে যায়। গাঁজার ব্ল্যাকমেল থেকে টিকিট মস্তান সবটাতেই ভুঁটে নিজের পসার বৃদ্ধি করেছিল। বসন্তকুসুম বিয়ের পর থেকে পুরোপুরি যোগাযোগ বন্ধ করেছিল ভুঁটের সঙ্গে। আমেরিকায় থাকার সময় ভুঁটের মহানুভবতার কথা জানতে পারেন বসন্তকুসুম। কীভাবে মানবিকতার দরুণ নিজের বাবার শ্রাদ্ধ থেকে উঠে বসন্তর মাকে বাঁচিয়েছিল ভুঁটে। এই কৃতজ্ঞতা বশে বসন্তকুসুম ভুঁটের খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন দেশে ফিরে এলে। তবে ভুঁটের আমেরিকায় গাঁজার চালান দেওয়ার প্রস্তাবের পর তার সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভুঁটের স্ত্রী পালিয়ে যায়। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এবং সি.পি.এম পার্টি করার দরুণ হকারদের বেদখল করা ঘরে কালীমন্দির উঠিয়ে রমরমা ধর্মের ব্যবসায় মন দেয়। সঙ্গে গুণিনের কাজেও পসার বৃদ্ধি করেছে। ভুঁটের মধ্য দিয়ে উঠে আসে কলকাতার বুকে বাঙালি জাতির অন্ধবিশ্বাসের পরিসরের চিত্র। যেখানে বরাত বৃদ্ধি করে শনিঠাকুর। ভুঁটের কথায় উঠে আসে কবি সাহিত্যিকদের বর্তমান প্রজন্মের কথা। তাদের মদের নেশার কথা। আটষট্টি বছর বয়সে ভুঁটে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। তবে দ্বিতীয় বিয়ের মাঝে ভুঁটের যৌনজীবন ফাঁকা ছিল না একথা বসন্তকুসুম জানতেন। ভুঁটে বসন্তকুসুমের কাছে আসার কারণ তার ছেলে জয়ন্ত। জয়ন্তর বাবা গণেশ ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল। ছেলের মধ্যে মেয়েলিপনা লক্ষ করে অশান্তির মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায়। ভুঁটের পাশের ঘরে গণেশ থাকত। তার

পরিবারের সমস্ত ঘটনাই ভুঁটে জানত। এমনকি, জয়ন্তর কার্যকলাপ সম্পর্কেও ভুঁটে অবগত ছিল। গণেশের মৃত্যুর পর ভুঁটেই গণেশের স্ত্রী ও জয়ন্তর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ভুঁটে গণেশের স্ত্রীকে বিয়ে করে এবং জয়ন্তকে পিতৃ পরিচয়ে গ্রহণ করে। শুধু এটুকু করেই ভুঁটের মহানুভবতার সমাপ্তি ঘটে না। তার মহানুভবতার বড় পরিচয় পাওয়া যায় জয়ন্তকে কেন্দ্র করে। আসলে রূপান্তরকামী জয়ন্ত খুঁজতে চাইছিল নিজের পরিচয়। সারা পৃথিবী জুড়ে রূপান্তরকামীদের লড়াই চলছিল নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার। আর সেই লড়াইয়ের অংশ হয়েছে কলকাতার মত জায়গার বস্তি এলাকার এক রূপান্তরকামী। বসন্তকুসুমকে অবাক করে ভুঁটের মানসিকতা। কারণ আমেরিকার 'প্রগ্রেসিভ মাইন্ড' কী করে ভুঁটের মধ্যে সঞ্চারিত হল তা ভেবে পান না বসন্তকুসুম। ভুঁটে চাইছে জয়ন্ত জয়ন্তী হয়ে উঠুক। কারণ, পাড়া থেকে স্কুল প্রতিটি ক্ষেত্রে জয়ন্তকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভুঁটে চায় জয়ন্ত প্রাণ ভরে বাঁচুক। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিক। তার মনকে প্রাধান্য দিক। কারণ বুড়ো বয়সে ভুঁটে স্ত্রী সন্তানের স্নেহ পেয়েছে। সংসারের মর্ম বুঝেছে। তাই ছেলের গোপন চাওয়াকে সে পূর্ণতা দিতে চায়। বসন্তকুসুম রোটারি ক্লাবের মেম্বার। তাই যদি জয়ন্তর অপরেশন করে মেয়ে হওয়ার কোনো ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারেন এই আশায় ভুঁটে উপস্থিত হয়েছে। জয়ন্তর কামনা-বাসনার ইচ্ছে পূরণের জন্য পিতা ভুঁটে আজ সাহায্য প্রার্থী আমেরিকা- প্রবাসী বন্ধুর কাছে। ভুঁটের বক্তব্যে এক প্রগতিবাদী মানুষের সুর যেন ধরা পড়েছে—

> *"ও মেয়ে হতে চাইছে। মানে কি জানিস? ও কমপ্লিট হতে চাইছে। আমি বেশ বুঝি, ওর বাইরের খোলসটা ছেলের। ভেতরটা মেয়ের। ... ওর ভিতরে একটা মা আছে মাইরি। ওর হয়তো স্তনে দুধ আসবে না কখনো, কিন্তু বাচ্চা দেখলেই ওর বুক শির শির করবে। ও আমাকে বলেনি, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি, জানিস ও ব্যাটাছেলের সোহাগ চাইছে। আদর চাইছে।'"*[১৬]

বসন্তকুসুম অবাক হন— কীভাবে আমেরিকার মানুষের প্রগতিবাদী ভাবনা ভুঁটের মনন গঠনে সাহায্য করল? সে তো আমেরিকার আবহাওয়ার ছোঁয়া পায়নি। তাহলে কীভাবে সম্ভব হল? ভুঁটের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করান বসন্তকুসুম। তাঁর পক্ষে কী সম্ভব হত এসব? ভাবনার রাজ্যে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যান বসন্তকুসুম—

> *"ভুঁটের মতো মানুষ এই ট্রান্সসেকসুয়ালিটিকে রেকগনাইজ করছে। এই মেয়েলিপনার জন্য থাবড়া মারছে না, গাল দিচ্ছে না। বলছে না যা হিজড়েদের দলে গিয়ে নাম লেখা। একজন আমেরিকানও এত সহজে ব্যাপারটা নিত? কে জানে? ওখানে গে মুভমেন্ট আছে। গে-রা বুক ফুলিয়ে চলে। ট্রান্সভেলটাইটরাও*

ওদের অরগনাইজেশন করেছে। কিন্তু আমার ঘরে এরকম একটা ছেলে বলত বাবা আমি মেয়ে হতে চাই। আমি কী করতাম? আমি তো ভাবিনি কখনো!''[১৭]

ভুঁটেকে সাহায্য করার বিষয়ে কিছুটা পিছপা হয়ে রইলেন বসন্তকুসুম। তার কাছে জয়ন্তর অপারেশনের চাইতে ক্যান্সারের চিকিৎসা, দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের শিক্ষার গরজ অনেক বেশি। আসলে এই উপন্যাসের মধ্যেই যেন 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের বীজ বপন হল একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মধ্য দিয়ে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তির আগমন। মুড়িউলি মাসির ছেলে মদন চন্দ্র দে নিজেকে সায়েনটিস্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে তার গবেষণা লব্ধ বই নিয়ে উপস্থিত হয়। মদনচন্দ্র মানুষের ব্রেন নিয়ে গবেষণা করেছে। এবং সে চায় তার মাতৃভাষায় লেখা বইটি আমেরিকার সায়েনটিস্টদের কাছে পৌঁছে যাক বসন্তকুসুমের হাত ধরে। মদনের মধ্যে সামান্য উন্মাদনার আঁচ পেলেও তার গবেষণা লব্ধ বইটি বসন্তকুসুম খুলে দেখার চেষ্টা করেন। বইটিতে মদনের রিসার্চ স্যাম্পেল হয়ে উঠেছে তার দাদা, মা, বসন্তকুসুমের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা। মদনের সূত্র ধরেই উঠে আসে বসন্তকুসুমের ঠাকুরদার কালির ব্যবসার ইতিহাস। পুনরাবৃত্তি ঘটে 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের ঘটনা, আলামোহন দাসের ঘটনা। বসন্তকুসুমদের বাড়ির পাশের বস্তিতে মুড়িভাজা হত কয়েকটি ঘরে। যার মধ্যে মদন চন্দ্রদের বাড়ি ছিল। বসন্তকুসুমের ঠাকুরদা কালির বড়ির জগতে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন। সেই ব্যবসাই পরে বসন্তকুসুমের বাবার হাতে আসে। বাসন্তকুসুমের ঠাকুরদা পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসেন দেশভাগের আগে। পৈতেধারী ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন বড় ব্যবসায়ী। বসন্তকুসুমের যৌথ পরিবার বাগবাজারের যে বাড়িতে বাস করতেন তাঁরা আর কেউ সেখানে থাকেন না। বাড়িটি প্রমোটাররা নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করতে চায়। পোড়ো বাড়িতে বসন্তকুসুম পূর্বস্মৃতি খুঁজতে গিয়ে তাঁদের বাড়ির আশ্রিত দুলুর সঙ্গে পরিচয় হয়। দুলু এই বাড়িতে সংসার পেতেছে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টায় দুলু নিজের স্ত্রীকে দেহ ব্যবসার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ইতিহাস আপ্রাণ বেঁচে থাকার রহস্য সন্ধানী এক পিতার আত্মকথা। যে পিতা বসন্তকুসুমের কাছে হাত পাতে এক বোতল নিগ্রোদের রক্তের যোগান দেওয়ার জন্য। আমেরিকায় নিগ্রো রক্ত পাওয়া যাবে এবং বসন্তকুসুম তা যোগাড় করে দিতে পারবেন বলে আশা দুলুর। বসন্তকুসুমের সামনে জীবন সম্পর্কে আরো এক চিত্র উপস্থিত হয়। যেখানে এক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত মেয়ের পিতা চাইছে তার মেয়েটি আরো কিছুদিন বেঁচে থাক, কারণ—

"ওর তো আর বিয়ে-টিয়ে হবে না, কে বিয়ে করবে থ্যালাসেমিয়ার রোগী কে? কেউ যদি ভালোবেসে বিয়ে করত, আমি বিয়ে দিতাম। বিয়ে কেন, যদি কেউ ওকে ভালবেসে আদর করত, আমি অ্যালাউ করতাম। ওর থ্যালাসেমিয়া

হতে পারে, কিন্তু ওর তো যৌবন আছে। আমি তো আর লোককে ডেকে বলতে পারি না। আমার মেয়েটাকে একটু ভালো করে আদর করে এসো ...।''[১৮]

এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে একুশ শতকের মানুষগুলির। যাদেরকে মেলাতে পারছেন না বসন্তকুসুমের স্মৃতির সত্তর-আশি-নব্বই দশকের সঙ্গে। কী করে মানুষগুলো এত পরিবর্তিত হল, হিসেব মেলে না বসন্তকুসুমের। যাঁর কাছে প্রগ্রেসিভ মানে আমেরিকা, তাঁর সামনে রুগ্ন মানুষগুলোর পরিবর্তন বড্ড খাপ ছাড়া মনে হয়। জীবনটাকে বড় রহস্যপূর্ণ মনে হয় বসন্তকুসুমের। একদিন বিদেশের টানকে উপেক্ষা করতে তিনি পারেননি। আজ বিদেশের টান আর নিজের মাতৃভূমির টানের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করেছেন তিনি। জীবনের সফল ব্যক্তি বসন্তকুসুম। নিজের আলাদা কোম্পানি আছে। ভালো উপার্জন হয়। বাবার ব্যবসাতে ফিরে না আসার জন্য কখনো আফসোস হয়নি তাঁর। আমেরিকা তাকে গ্রাস করেছে একথা তিনি জানেন। তাই কলকাতার পরিবর্তন তাঁকে যেন কোথায় আঘাত হানে। আমেরিকাতে থেকেও কী তিনি ভুঁটে বা দুলুর মতো প্রগ্রেসিভ হতে পেরেছেন? প্রশ্ন থেকে যায় নিজের কাছেই। বসন্তকুসুম তো দেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের বন্দোবস্ত করতে এসেছেন। স্বার্থের তাগিদ তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমেরিকায় বায়োফুয়েলে গাড়ি চলে তাই কম দামে চালের প্রয়োজন। বসন্তকুসুমের পার্টনার ভারত থেকে চালের ব্যবস্থা করতে বলেন। কারণ এখানে চালের দাম কম। ভারতের মতো দেশে যা দিয়ে মানুষের জীবন ধারণ হয় তা দিয়ে আমেরিকার মতো দেশে গাড়ি চলবে। অর্থনীতির দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য চোখে পড়ে বসন্তকুসুমের। উপন্যাসের মধ্যপর্যায় পর্যন্ত বসন্তকুসুমের সঙ্গে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের পরিচয় ঘটে। একুশ শতকের উপন্যাস দেহ বহু বৈচিত্র্যে পূর্ণ। 'পরবাসী' উপন্যাসেও সেই বৈচিত্র্যের ছোঁয়া রয়েছে।

বসন্তকুসুম বহুদিন বাদে স্বদেশ ও মাতৃভূমি দু'চোখ ভরে দেখার সুযোগ পান প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের সঙ্গে মধ্যমগ্রামে যাওয়ার পথে। প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল ওরফে পি-কে মণ্ডল। এক সময় আমেরিকায় একই কোম্পানিতে চাকরি করতেন বসন্তকুসুমের সঙ্গে। রোটারি ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্য পি.কে. বসন্তকুসুমকে নিজের গ্রাম বাকিলায় নিয়ে যেতে চান। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, নদিয়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গা আর্সেনিক অধ্যুষিত। পি.কের বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গ্রামের জন্য কিছু করবে। আমেরিকা প্রবাসের জন্য পি.কে. দীর্ঘদিন গ্রামের জন্য কিছু করতে পারেননি। আর্সেনিক অধ্যুষিত গ্রামের জন্য ভালো পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে চান তিনি। তাই বসন্তকুসুমকে গ্রামের প্রকৃত অবস্থা বোঝানোর

জন্য নিয়ে যান। শুরু হয় প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের জীবন-অভিজ্ঞতার অধ্যায়। প্রাণকৃষ্ণ নমঃশূদ্র হওয়ায় পুজোর সময় এক বামুনকে ছুঁয়ে ফেলার অপরাধে মিত্রদের ছেলের হাতে চড় খেয়েছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে বোর্ডের পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করে। চল্লিশ বছর পর মিত্র বাড়ির ছেলে চতুর্দশ স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ প্রাণকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারেনি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্ণবৈষম্যের একটা দিক উঠে আসে। প্রাণকৃষ্ণের স্কুলে দেখা করতে গেলে মাস্টারমশাইরা গ্রামের আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানীয় জলের জন্য ব্যবস্থা করার কথা বলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে গ্রামের যুবকেরা আর্সেনিক কবলিত। রাজনৈতিক নেতারা প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু রাখে না। এই গ্রামের ছেলে-মেয়েদের অন্য গ্রামে বিয়ে হয় না। এরকম ব্রাত্য গ্রামে দেহব্যবসার স্থান গড়ে ওঠে সবার চোখের সামনেই। কারুর কিছু করার থাকে না। প্রাণকৃষ্ণর পরিবারের লোকজনেরাও আর্সেনিক আক্রান্ত। উপরন্তু ডাকাতির দলে নাম লেখানোর পর থেকে পরিবারের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ে। গ্রামের অবস্থা দেখে ফেরার পথে স্কুলের সামনে প্রাণকৃষ্ণর বন্ধু ঢাকি জয়নালের উপস্থিতি এবং ঢাক বাজিয়ে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষগুলির চোখে আশার আলো জেগে ওঠে। বসন্তকুসুমের মত প্রাণকৃষ্ণ স্বদেশকে বহুদিন আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করেননি। প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে বসন্তকুসুমও অনুভব করেন নিজভূমির মানুষগুলির অসহায়তার কথা। প্রাণকৃষ্ণ বাবা-মা- বোনদের দুর্গাপুরে রেখে পড়াশুনো করতে আমেরিকায় যান। এরপর বাকিলার সঙ্গে সেরকম যোগাযোগ রাখতে পারেননি। তারপর আমেরিকায় চাকরি, বিয়ে— সব মিলিয়ে তিনি আমেরিকাকেই মনে করেছেন তাঁর স্বদেশ। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি অনুকম্পা রয়ে গেছে।

জন্মভূমি আর স্বদেশ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। জন্মসূত্রে প্রাণকৃষ্ণ আর বসন্তকুসুম দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। জীবনের কিশোর বয়সে দু'জনেই জন্মভূমিতেই কাটিয়েছেন। একটা সময়ে পড়াশুনোর জন্য আমেরিকায় যাত্রা। সেখানেই ঘর সংসার। তবে বসন্তকুসুমের স্ত্রী ছন্দা বাঙালি। প্রাণকৃষ্ণের দুই বিয়ে। প্রথম বিয়ে আমেরিকান মেয়ে মার্গারিটাকে। মার্গারিটার সঙ্গে তিন বছরের সংসার। কন্যা সন্তান রয়েছে— ললিতা। কিন্তু মার্গারিটাকে নিয়ে এদেশে আসার পর বিয়েটা টেকেনি। কারণ—

> *"ভারত যে গরিব দেশ ওরা জানত, কিন্তু এরকমটা ভাবেনি। বাড়িতে কমোড নেই, বাথটাব নেই, বাবা খালি গায়ে থাকে, মা তো লজ্জায় কথাই বলে না। কলকাতায় এলাম, নোংরা জঞ্জাল, উঁচু উঁচু বাসের পাদানি, কন্ডাক্টার বাসের গায়ে চাপড় মেরে ড্রাইভারকে কম্যান্ড পাঠায়, পদে পদে ভিখিরি খামচায়, কুষ্ঠ রোগীটিকে কাঠের বাক্সে চাপিয়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে যায় অন্য কেউ, কুষ্ঠরোগী*

কাতরায়, রাস্তার মাঝখানে কুকুররা সঙ্গম করে, ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়। বৃষ্টিতে জলে ভাসে শালপাতা-ঠোঙা-কনডোম।''[১৯]

এক অদ্ভুত ভারতবর্ষের ছবি মার্গারিটার সামনে উপস্থিত হয়। চারিদিকে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখে প্রাণকৃষ্ণের ওপর তার অশ্রদ্ধা তৈরি হয়। ১৯৭১ সালের কলকাতার সঙ্গে বর্তমানের যদিও কোনো পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষে আসার এক বছর পর প্রাণকৃষ্ণের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ঠিক আট বছর বাদে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। জীবনের রদবদল ঘটলে তিনিও চেয়েছিলেন দেশে ফিরতে। কিন্তু ফেরা হয় না। না ফেরার কারণ প্রাণকৃষ্ণের কথায় উঠে আসে—

"...আমেরিকা কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না। চাষির ছেলে যখন ওদেশে গিয়ে সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন ঘর, গাড়ি, মসৃণ রাস্তা, সস্তা মদ, আর একটু চেষ্টা করলেই সেক্স পেয়ে যায়, তখন একটা সুবিধাবাদিতা পেয়ে বসে। বাড়িতে টাকা পাঠালেই মনে হয় ডিউটি ফিনিশ।''[২০]

আসলে আমেরিকার 'সিস্টেমেটিক লাইফ'-এ একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেখান থেকে বেরনো সম্ভব হয়ে ওঠে না। দেশের চাকরির সুযোগও নগণ্য মনে হয়। তাছাড়া ভালো মাইনের চাকরিরও অভাব ঘটে আমেরিকার তুলনায়। প্রাণকৃষ্ণ বা বসন্তকুসুম কেউই পারেননি আমেরিকাকে ছেড়ে আসতে। বসন্তকুসুম বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ ? তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিস্পানি সম্প্রদায়ের। তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। ফলে বাংলায় নিজের সঙ্গে ছাড়া কথা বলা হয় না। বসন্তকুসুমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। বসন্তকুসুম জানান—

"আমি কিন্তু এক দিক দিয়ে ভালো আছি। দেশি বউ। বাংলা বলি। শুক্তো খাই, ছেলেমেয়েরা বাংলা পড়তে পারে না ঠিকই, কিন্তু বলে। আমরা ওদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলি, ওরা অবশ্য ইংরেজিতে উত্তর দেয়। বাংলা ম্যাগাজিন নেওয়া হয় একটা। আমিও একটু উল্টে পাল্টে দেখি। কলকাতা গেলে দু'একটি বাংলা বই নিয়ে আসি। ছন্দা রীতিমতো বাংলা পড়ে। ডাইরিও লেখে। আবার পদ্য টদ্যও লেখে।''[২১]

আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষাকে ধরে রাখার চাহিদা যে নষ্ট হয়ে গেছে তা বোঝা যায় বসন্তকুসুমের ভাষায়। তারা দুর্গা পুজো করে। রক ব্যাণ্ড নিয়ে যায়, কবিদের নিয়ে যায়, সেমিনার হয়, প্রবাসী বাঙালিরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে ছবি তোলে, অটোগ্রাফ নেয়; ব্যাস এটুকু পর্যন্তই সমাপ্ত। বাংলার প্রতি নাড়ির টান তারা ছিন্ন করতে পারেন না, আবার বিদেশের জৌলুস ত্যাগ করে জন্মভূমিতেও ফিরতে পারেন না। বসন্তকুসুম বা প্রাণকৃষ্ণ দু'জনেরই জন্মভূমির প্রতি

দায়বদ্ধতা আছে। দু'জনেই কলকাতায় ফিরেছেন মাতৃভূমির জন্য কিছু করার উপলক্ষে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় নয়। প্রাণকৃষ্ণ পিতৃসত্য পালনের জন্য; অন্যদিকে বসন্তকুসুম পৈতৃক বাড়িটি কোনো সৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চান। কারণ বাড়িটি এমনি পড়ে থাকলে দখল হয়ে যেতে পারে। বাবা-মা না থাকায় এদেশে আসার কোনো অজুহাতও আর অবশিষ্ট থাকে না। তাই জন্মভূমির পাট তিনি চুকিয়ে দিতে চান। কিন্তু মন তো পড়ে থাকে কলকাতার অলিতে গলিতে। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে উৎসাহে বাজি পোড়ান বসন্তকুসুম, সেদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুর মেলান, দুর্গা পুজোয় খিচুড়ি খান, ঢাকের আওয়াজ শোনেন টেপ বাজিয়ে। আসলে স্বদেশ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে বিস্তর জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকার ফলে আমেরিকাকেই এক সময় স্বদেশ মনে হয়। কিন্তু মনের গোপন কোণে কোথায় যেন জন্মভূমির প্রতি তার সমস্ত আকর্ষণ। তিনি ভাবেন কলকাতায় আসার পর হঠাৎ মৃত্যু হলে কী কী হতে পারে তার সঙ্গে। এদেশে মারা গেলে অনেক সমস্যা। ছেলে মেয়েদের আসতে হবে তাদের কাজ ফেলে। তার চেয়ে আমেরিকাতেই মরা ভালো বলে মনে করেন বসন্তকুসুম। আর তার পরে তিনি স্বাধীন। তাই মৃত্যু পরবর্তী ভাবনা তার মাথায় ঘোরাফেরা করে—

> *"যদি ভূত হই, এবং ইচ্ছে মতো চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে গ্রাণ্ড ক্যানিয়নের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে না ঘুরে বরং বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছে, পাঁচমাথার নেতাজি মূর্তির ঘোড়ায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরীটার ভিতর, ইস্টবেঙ্গল মাঠে, মনুমেন্টের মাথায় আমি ভূত হয়ে ঘুরব। কুমোরটুলিতে, ঘুরব টালা ট্যাংকির উপরে বসে থাকব। তাহলে এখান থেকে কী প্রমাণ হয়? এটাই আমার স্বদেশ। তাইতো?"*[২২]

বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। বসন্তকুসুম সেটা অনুভব করেন। কিন্তু তার পুরো পরিবারটাই তো আমেরিকায়। তিনি কী করে তাদের ছেড়ে জন্মভূমির আকর্ষণকে প্রাধান্য দেবেন? সম্ভব নয় বলেই আমেরিকাকেই স্বদেশ ভাবতে শুরু করেন বসন্তকুসুম আর প্রাণকৃষ্ণের মতো প্রবাসীরা।

জন্মভূমিকে কাছ থেকে দেখার পর বসন্তকুসুমের সামনে কলকাতার পরিবর্তিত রূপের বেশ কিছু নিদর্শন সামনে আসে। প্রথম রূপটি প্রমোটার রাজের রমরমা নিয়ে। বসন্তকুসুম নিজের বাড়িটির বন্দোবস্ত করতে চান। কিন্তু তাদের পুরনো বাড়িটি, যে বাড়িতে দুলুর আস্তানা, সে বাড়িটি প্রমোটারকে দিয়ে দিয়েছে বসন্তকুসুমের আত্মীয়রা। প্রমোটার আশেপাশে বেশ কয়েকটি প্লট পেয়েছে। তারা ফ্ল্যাট তৈরি করবে। কলকাতার বুকে এভাবেই বহু পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট সংস্কৃতি ঢুকে

পড়েছে সর্বত্র। বসন্তকুসুমের কাছে প্রমোটারটি আসেন। বাড়িটি কিনে সেখানে অফিসঘর তৈরি করবেন। বসন্তকুসুমের বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে স্ট্যাচু তৈরি করে দেবেন, বসন্তকুসুমের জন্য একটি ঘর রাখবেন প্রমোটারটি। কিন্তু বসন্তকুসুম তার কথায় রাজি না হওয়ায় তিনি রীতিমত হুমকি দিয়ে যান। প্রমোটারটির ব্যাবসায় কলকাতার প্রমোটাররা কতটা উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে চলেন তার নিদর্শন বসন্তকুসুম পেয়ে যান। এখানেই থেমে থাকা নয়, ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়েও মানুষের ধারণার বদল ঘটেছে। রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ভোটের সময় কলকাতায় ছড়া লেখা হত। আমেরিকায় সে সংস্কৃতি নেই। তবে একুশ শতকের একটা পর্বে এসে ভোটের ছড়া লেখার রীতি উঠে যায়। আসলে বিশ্বায়নের ছোঁয়া সর্বত্র, সেটা বসন্তকুসুম অনুভব করেন। দেবতা নিয়ে যে ছুতমার্গ ছিল একসময় তার পরিবারে সে ছুতমার্গ আজ আর নেই। এমনকি কালাপানি পার হওয়া নিয়েও প্রায়শ্চিত্ত করে ঠাকুরঘরে প্রবেশ বিষয়ে বিধি নির্ধারিত হয়েছিল বিশ শতকের বাংলায়, আজ সে রূপের সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট নেই। বিশ্বায়নের প্রভাবে দেবতারাও বোধহয় মানিয়ে নিতে শিখে গিয়েছে। বসন্তকুসুমের পূর্ব বাংলার পৈতৃক দেবী 'বগলা' কে স্বপ্নে পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। বসন্তকুসুমের পিতামহ কলকাতায় আসার পর পূর্ববঙ্গের আত্মীয়রাই দেবীর পুজো করতেন। কিন্তু বাংলাদেশ গঠনের পর তাঁদের অনেক আত্মীয়রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেন। বসন্তকুসুমের যে আত্মীয় বগলা মায়ের পুজো করতেন তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে দেবীকে পুজো করার অধিকার তিনি হারিয়ে ফেলেন। দেবীর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে তিনি দেবীকে বাক্সবন্দি করে কলকাতায় বসন্তকুসুমের ঠাকুরদার কাছে নিয়ে আসেন। দেবী মুসলিমের সংস্পর্শে এসেছেন বলে দেবীকে শুদ্ধি করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বসন্তকুসুমের দিদিমার ভাই ব্রহ্মময় ঠাকুরের ছেলে কালীমামাকে বগলা মায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর মন্দিরে কালীমায়ের মূর্তির পাশেই বগলা মা স্থান পান। প্রায়শ্চিত্ত না করার জন্য বসন্তকুসুম ঠাকুর ঘরে ঢোকার অধিকার পাননি। আসলে লৌকিকতা আমাদের ধর্মীয় বাতাবরণে চেপে বসে রয়েছে। কিন্তু সেই লৌকিকতার বেড়াজাল ধীরে ধীরে আলগা হতে শুরু করেছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। ব্রহ্মদাদু মারা যাওয়ার পর তাঁর ভিটেকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতা তাঁর সন্তাদের নেই। গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে আজ আমরা বিলাসিতাপ্রিয় হয়ে গিয়েছি। ফলে উন্নয়নের প্রভাব সর্বত্র, যে উদ্বাস্তু বগলা মা নিজের একটা স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করেছিলেন সময়ের স্রোতে তিনি তার জৌলুস হারিয়ে ফেলেন। ব্রহ্মদাদুর ভিটেতে স্পেনসার্সের শপিংমল তৈরি হবে। তারা ব্রহ্মদাদুর প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির কে আর রাখতে চায় না। যে কালীমামা বগলামায়ের পুজোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনিও চান মন্দির ভেঙ্গে শপিংমল তৈরি হোক। যে বগলা মায়ের সঙ্গে নৃতত্ত্ব জড়িয়ে ছিল তা কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়ার পথে।

যে মায়ের পুজোর জন্য বসন্তকুসুমের বাবা জমি দান করেছিলেন সেই মা আজ আবার উচ্ছেদ হতে বসেছেন। আসলে বিশ শতকের অবসানের পর এক পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। তার নাম বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন। ২০০০ সাল নাগাদ বসন্তকুসুম যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি বগলা মায়ের রূপের সামান্য পার্থক্য লক্ষ করেছিলেন। বগলা মা নিজের উগ্রতা প্রকাশ করে জাগ্রত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছিলেন। নিজের নামে সুতোও তৈরি করে ফেলেছিলেন মানুষের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য। বগলার আশীর্বাদে কালীমামাদের আর্থিক সংকটও মিটে গিয়েছিল। কিন্তু সবার সময় সব সময় ভালো যায় না। বগলা মায়েরও 'ব্র্যাণ্ডভ্যালু' কমতে থাকে গ্লোবালাইজেশনের ফলে। সংস্কৃতির আদান প্রদানে বাঙালির নিজের অস্তিত্ব আজ সংকটে। অবাঙালি সংস্কৃতিতে বাঙালি যে মজেছে তার প্রমাণ কালীমামার বক্তব্যে স্পষ্ট—

> *"এলাকার মানুষেরা প্রোমোটারকে জমি দিয়ে দিচ্ছে। নতুন নতুন লোক আসছে। মাড়োয়ারি আসছে, গুজরাটি আসছে। এদের কালী-বগলাতে আসক্তি নেই। নতুন একটা হনুমান মন্দির হয়েছে। আজকাল বাজারে লাউকে বলছে লউকি, শশাকে বলছে ক্ষিরা অবাঙালি খদ্দেরদের দিকে চেয়ে। মিষ্টির দোকানে আজকাল ধোকলা পাওয়া যায়, কাজুবরফিও।"*[২৩]

আসলে সময়ের সঙ্গে জীবন ধারাও পরিবর্তিত হয়। নতুন যুগের ছোঁয়ায় পুরনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের চিত্র ফুটে ওঠে সর্বত্র। বসন্তকুসুমের সামনে বিশ থেকে একুশ শতকের স্বদেশের পরিবর্তন চোখে পড়ে ধর্ম-আর রাজনীতির অঙ্গনে। হিন্দু ধর্মকে সংকটের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে বি.জে.পি-র কদর বাড়তে দেখা যায় এসময় থেকেই। কালীমামার নজরে সে বিষয়টি আসায় তিনি তার সন্তানদের পৌরোহিত্য করার জন্য বললেও তারা উৎসাহী হয় না। দেশের মাটিতে কাজের অভাব হওয়ায় ধর্মপ্রাণ, ছুতমার্গে বিশ্বাসী কালীমামাই বসন্তকুসুমকে অনুরোধ করেন তাঁর ছেলেকে আমেরিকায় নিয়ে কাজে লাগানোর জন্য। যে কালীমামা বসন্তকুসুমকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দেননি, তিনি নিজের ছেলের কর্ম-সংস্থানের জন্য বলছেন। আসলে সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রসার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তিনিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন প্রয়োজনের তাগিদকে—

> *"প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। ওখানে তো শুনি ঘণ্টা হিসাবে মজুরি। যে কাজই করুক ঘণ্টায় চার ডলার। মানে দুইশো টাকা প্রায়। আট ঘণ্টা কাজ করলে ষোলোশো টাকা। তাছাড়া গলায় পৈতা আছে, ব্রাহ্মণ সন্তান, তুমিও আছ। বিদেশেও তো পূজা-টুজা হয়— কাগজে পড়ি।"*[২৪]

বঙ্গসংস্কৃতির পরিবর্তনটা চোখে পড়ে বসন্তর। কিন্তু দেশবাসীর জন্য তিনি কতটুকুই বা করতে পারেন। তবে পরিবর্তনটাই দেশের ভবিষ্যৎ। বসন্তকুসুম উপন্যাসের প্রায় তৃতীয়াংশ জুড়ে আমেরিকার সঙ্গে কলকাতার পার্থক্য, মিল, পরিবর্তনকে ধরার চেষ্টা করেছেন। নিজের সঙ্গে স্বদেশ এবং জন্মভূমির প্রতি টান নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে পারেননি। উপন্যাসের গতিপথে হঠাৎই বাঁক বদল ঘটে। বসন্তকুসুমের মামাতো ভাই কবি একলব্যের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। একলব্য অর্থাৎ ঘুনু যে ছোটবেলায় বসন্তকুসুমের আমেরিকা যাওয়ার সময় নিজের লেখা কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল, সে আজ প্রতিষ্ঠিত কবি। 'দেশ' পত্রিকায় তার লেখা কবিতা ছাপা হয়। ঘুনুর কথায় পরে আসি। আগে ঘুনুকে সঙ্গে করে বসন্তকুসুমের সঙ্গে দেখা করতে আসা কালীমামার ছেলে সুখময়ের কথা সেরে নেওয়া যাক। সুখময় এসেছে বসন্তকুসুমদের পৈতৃক দেবী বগলা মায়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে, কারণ তাদের বাড়ির ভিটেতে স্পেনসার্স তাদের শপিংমল করবে। কালীমামার দক্ষিণকালীকে তারা শপিংমলেই স্থান দেবে। কালীর নামে আলাদা ডিপার্টমেন্ট তারা তৈরি করে দেবে। কিন্তু বগলা মায়ের দায়িত্ব তারা নেবে না। কারণ, বগলা কালীকে 'এন্টারটেন' করার লোক নেই। বগলা নামের মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই। আসলে নবযুগের জন-জীবনে ভক্তির মধ্যে বিচার-বুদ্ধির প্রবেশ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন করায় আমাদের। তাছাড়া 'ব্রান্ড ভ্যালু' বলে একটি শব্দের প্রতি আমরা বর্তমানে আকর্ষিত হই। যার প্রভাব বগলা মায়ের উপরেও এসে পড়েছে। জীবন আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখায়। বসন্তকুসুমের প্রবাসী জীবন যা শেখায়নি তা তাঁকে জন্মভূমি শিখিয়ে দিল।

উপন্যাসের ঘটনা বসন্তকুসুমকে ঘিরে একটা পর্যায় পর্যন্ত সমান্তরাল গতিতে চলছিল। একলব্যের আগমন নতুনত্বের ছোঁয়া যোগ করল। বসন্তকুসুম বাবা-মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রহসুলভ স্মৃতিকথা একলব্যকে দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা করে। একলব্য বইটি বসন্তকুসুমের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দার লেখা 'বিদেশিনী' নামে আরও একটি বই তুলে দেয়, বসন্তকুসুম নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করেন। ছন্দার ডায়ারিতে উঠে আসে তার আমেরিকায় যাওয়ার, সেখানে চাকরি করার অভিজ্ঞতা। বসন্তকুসুমকে একা পেয়ে নারীর মনস্তত্ত্ব উঠে আসে। শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে তার আলাদা ভাবনা এবং কীভাবে আমেরিকার প্রভাব তাকে সে দেশে আটকে ফেলেছিল সেসব ঘটনা ডায়ারির পাতায় লিপিবদ্ধ। তবে তার ডায়ারির বর্ণিত ঘটনা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আফগানিস্থানের একটি বালিকার জীবন বৃত্তান্তে। আজও আমরা তালিবান শাসনের ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছি। সেদেশের মানুষেরা নির্ভীক ভাবে বাঁচার জন্য উদ্বাস্তু হতে চেয়ে অন্যদেশে পাড়ি দিচ্ছে। তালিবান মতাদর্শীরা আফগানের সিংহাসনে বসার জন্য তৈরি ২০ বছর

বাদে। তাদের নতুন মতাদর্শে আমরা আস্থা রাখতে পারছি না তাদের আশ্বাসবাণীর দিকে নজর রেখেও। তাহলে সত্তরের দশকের চিত্র কতটা ভয়ানক হতে পারে তার কিছুটা অনুমান করা যায় ছন্দার ডায়ারির মাধ্যমে। ছন্দা যখন আমেরিকায় একটি ক্রেসের চাকরিতে যোগ দেয় তখন সেখানে রুকাইয়া নামের একটি বালিকাকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্লাস তাকে দেওয়া হয়। রুকাইয়া বহন করেছে ওর দেশে রাশিয়ান বোমার আঘাত। তার মুখের একটি দিক পোড়া। বাবা-মা মারা গিয়েছে। কাকাদের সঙ্গে আমেরিকার আশ্রয়ই তার একমাত্র ভরসা। স্বাভাবিক বুদ্ধি কম বিবেচনা করে তাকে স্পেশাল ক্লাস দেওয়া হয়। ছন্দা তার ক্লাস টিচার। ছন্দা আর রুকাইয়ার দেশ কাছাকাছি হওয়ায় এবং রুকাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির কিছুটা জানে বলে ছন্দার সঙ্গে তার ভাব জমে ওঠে। উপন্যাসের মধ্যে ছন্দা এবং রুকাইয়াকে তুলে ধরে বসন্তকুসুমের কাছে ছন্দার চরিত্রের একটি অদেখা দিকের উন্মোচন হয়। আসলে বসন্তকুসুম অনুভব করেন দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে এত কাছাকাছি থেকেও কতকিছু অজানা থেকে যায় আমাদের।

বসন্তকুসুমের মরমী হৃদয় উত্তর কলকাতাকে আমেরিকার সঙ্গে এক করে দিতে পারেনি। স্বদেশ আর জন্মভূমির পার্থক্য আছে। বসন্তকুসুমের মধ্য দিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের আত্মকথা যেন রূপ পেয়েছে। সঙ্গে স্ত্রী ছন্দার ডায়ারি প্রবাসী পত্নীর রূপকে তুলে ধরেছে। আর সবচেয়ে নতুন মাত্রা যোগ করে বসন্তকুসুমের মায়ের ডায়ারি এবং বসন্তকুসুমের আমেরিকা থেকে পাঠানো চিঠিপত্রের কয়েকটি চিহ্ন। আসলে আমাদের মতো দেশের বাবা-মায়েরা সন্তানদের নিয়ে গোপন বাসনা লালন করেন; অন্তরের মণিকোঠায় সন্তানকে বিদেশে পড়ানোর মধ্যে আত্মশ্লাঘা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সেই সন্তান যখন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে প্রবাসেই স্থায়ী হয় তখন যেন সেটা আর বাবা-মায়েরা মেনে নিতে পারেন না। তারা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ছেলের ফিরে আসার দিকে। বসন্তকুসুম তাঁর পাঠানো চিঠিগুলো মায়ের ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার করার পর সেগুলো পাঠ করেন। নিজের বলা মিথ্যে কথাগুলো পাঠ করেন। দেশে ফিরে আসার মিথ্যে প্রতিশ্রুতিগুলো তাঁর কাছে বিভীষিকা মনে হয়। আসলে পূর্বদিনের করা ভুলগুলো আমরা শুধরে নিতে পারিনা। আর সেগুলোই আত্মগ্লানির কারণ হয়। বসন্তকুসুমের মায়ের ডায়ারিতে প্রবাসী সন্তানের কাছে গিয়ে সেখানের জীবন যাত্রা এবং অভিজ্ঞতার চিত্র ধরা রয়েছে। সঙ্গে এক মায়ের জীবনে তার সংসারের কাছে চাওয়া-পাওয়ার আর্জি। বসন্তকুসুমের মা তাদের বগলা মায়ের কাছে আর্তি জানিয়েছেন ঠিক এই ভাবে—

> *"আমি শাশুড়ি হইলাম বটে, কিন্তু শাশুড়ি কি জিনিস বুঝিলাম না। আমি ঠাকুমা হইলাম সত্য কিন্তু ঠাকুমা কি জিনিস বুঝিলাম না। আমার হাত দুইটা কেবল*

আদর করিতে চায়। নাতি-নাতনির পিঠ চায়। আঙুলগুলি চায় নাতনির চুলের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইবে। আমার বড় তৃষ্ণা। তৃষ্ণা মিটিল না।''[২৫]

মাতৃহৃদয়ের গোপন আর্তি প্রকাশ পায় বক্তব্যটি থেকে। আসলে বসন্তকুসুমের মা লাবণ্যময়ী কোনো দিন মুখ ফুটে ছেলেকে বলতে পারেননি মনের গোপন ইচ্ছের কথা। ডায়ারির পাতায় তিনি তাঁর করুণ আর্তি কয়েকটি লাইনেই বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু বিদেশে পড়তে পাঠানো ছেলে যে কখন বিদেশী হয়ে যায় তা মায়ের আঁচল বুঝতে পারে না। বসন্তকুসুমকে ঘিরে তাঁর চারপাশের মানুষগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবাসী জীবনের মোহের দোরগোড়ায় আঘাত হানে। তাঁরও গোপন মন চায় স্বদেশ ও জন্মভূমিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে। কিন্তু জন্মভূমির সঙ্গে একাত্মতা বহুদিন হল ছিঁড়ে গেছে তাঁর। মাতৃভূমিতে শরীরের রোম কোষ নেই আর। আমেরিকার প্রলেপ তাকে সরিয়ে দিয়েছে। প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে বসে খাওয়া কচুরি আজ বসন্তকুসুমের পেট খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বসন্তকুসুমের ফুড পয়জন হয়। অচেতন অবস্থার মধ্যে তার অন্তর্জগতের সঙ্গে বোঝা পড়া শুরু হয়। জয় ডাক্তারকে এবং ছন্দাকে ফোন করে। বসন্তকুসুম অজ্ঞান অবস্থায় কল্পনা করে ভারতবর্ষের উন্নতির চিত্র। ভারতবর্ষের না বদলানো কিছু চিত্র। ভারতবর্ষের বিশ্বের দরবারে সেরা হওয়ার চিত্র। কিন্তু ভারতবর্ষ আজীবন ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস নিয়ে বেঁচে আছে। আমেরিকার জলবায়ু সেই ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতাকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু বসন্তকুসুম ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে চান। কারণ অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে বসন্তকুসুমের। ভুঁটের ছেলের জন্য, বাবা-মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাড়িটার জন্য। আর সর্বোপরি বগলা মাকে স্থায়ীকরণের জন্য। বসন্তকুসুমের কথা তাঁর অক্সিজেন মাস্ক ছাড়িয়ে সকলের কাছে পৌঁছতে চায়। তিনি চান তাঁর স্বর পৌঁছাক বহুজনের কাছে, ছন্দার কাছে। তার জীবন সম্পর্কে এখনো বহুকিছু জানা বাকি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানা বাকি। জন্মভূমির কাছে তাঁর ফিরে আসার গোপন মনটাকে খুঁজতে চান বসন্তকুসুম। যে মন হারিয়ে গিয়েছিল আমেরিকার ব্যস্ততম দিনের মাঝে। জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেন প্রতি পদে নতুন কিছু আশার সঞ্চার করে। সেই আশা নিয়ে বাঁচতে চান বসন্তকুসুম। 'পরবাসী' উপন্যাস হয়ে উঠেছে সমস্ত প্রবাসী বাঙালির আত্ম-পরিচয়ের, আত্ম জিজ্ঞাসার দলিল। 'পরবাসী' উপন্যাসের বসন্তকুসুমের আত্মজিজ্ঞাসার অনুসন্ধানের পর আমরা পরবর্তী উপন্যাসের দিকে এগোব।

৩

'কান্তকবি' উপন্যাসটি সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রকাশিত। উপন্যাসটি কবিতাপ্রেমী নলিনীকান্তের। কবিতাপ্রেমী বলাটা ঠিক নয়, সে নিজেকে কবি হিসেবেই প্রমাণ করতে

চায়। সরকারী স্কুলের কেরানি নলিনীকান্ত চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাচর্চায় মগ্ন। সে বাল্যবয়স থেকেই কবিতাচর্চা করেছে। বিয়ের পর স্ত্রী সুষমা কিন্তু এই কবিতারচনাকে প্রশ্রয় দিতে চায় না। কারণ সুষমার মামা নটবর কবিয়াল খুব সহজেই মিলিয়ে কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতার বই হকার দ্বারা সেল হয়। ফলে সুষমার কাছে নলিনীর কবিভাব আদিখ্যেতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে কবিতাচর্চায় কখনোই ঘাটতি পড়েনি নলিনীর। মাঝে মাঝেই কবিতা পাঠের জন্য বহু কবি সম্মেলন বা কবিতাপাঠের আসরে ডাক পায়। মাঝে মাঝে ক্লাবের ছেলেদের দাপট তাকে সহ্য করতে হয় শ্লোগান বা প্লাকার্ড লিখে দেওয়ার জন্য। এরকমই এক দলনেতার আর্জি আসে ভোটের আগে কবিতায় বক্তব্য লিখে দেওয়ার জন্য। প্রথমটায় রাজি হলেও সুষমার মামা নটবর কবিয়ালের কাছেই নলিনী উপস্থিত হয়। নটবরবাবু প্রথমে রাজি হয়ে লিখতে চাইলেও পরে এহেন নেতাদের হয়ে মিথ্যে বক্তব্য তিনি লিখে দেননি। ফলে চাপ এসে পড়ে নলিনীর উপরেই। ইতিমধ্যে কাহিনিতে প্রবেশ ঘটে নলিনীর ছোটবেলার বন্ধু জনার্দনের, বর্তমানে তিনি কুমার জন বলে খ্যাত। তার কাছ থেকে সিনেমায় গান লেখার সুযোগ পায়। গান লেখে নলিনী। হিটও হয় সেই গান। লোকসমাজে নলিনীর পরিচিতি বাড়ে কবি এবং গীতিকার হিসেবে। কিন্তু ধীরে ধীরে কবিসমাজ থেকে সে ব্রাত্য হতে থাকে তার বর্তমান যুগাপেক্ষী গান রচনার জন্য। আসলে সে গান কবির চরিত্রের পক্ষে সাজুয্য রক্ষা করে না। কিন্তু পাড়ায় তার সম্মান বেড়ে যায়। গান রচনার জন্য কুমার জনের সৌজন্যে এক ফাংশান আয়োজন হলে সেখানে নলিনীকেও পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সেই পুরস্কারই নলিনীর পরিচিতি বাড়িয়ে দেয়। পার্টির লোকেরা এই ধরনের পপুলার লোকের স্ত্রীকেই তাদের পার্টির নেত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন। ফলে সুষমাও নেতা চক্রের শিকার হয়। সুষমা স্বামীর থেকে বেশি নাম ডাক হওয়ার প্রলোভনে রাজি হয়ে যায়। নলিনীর বারণকে সে গ্রাহ্য করে না। নলিনীর কবি সত্তার পরিবর্তন ঘটে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে কবিতা তৈরি করতে করতে সে প্রকৃত কৃষ্ণাকে ইজ্জত লুণ্ঠন হওয়া থেকে রক্ষা করে। কৃষ্ণার মেকি অনুকম্পাও যেন নলিনী অনুভব করতে পারে না। কারণ তার কবিসত্তার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। যেখানে তার কেউ কদর করছে না, সম্মান করছে না সেই পর্যায়ে নলিনী এক আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু যে কবি সত্তা হাজার অবহেলা সত্ত্বেও দমিত হয় না, সেই কবি-সত্তাকেই নলিনী লালন করে চলে মনে মনে। স্বপ্নের জগতে পার্টির নেতাদের চাপ উপেক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে সে গর্জে ওঠে।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আমদের চারপাশের অদেখা চরিত্রগুলির অন্তঃপ্রকৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন বহুবার। 'কান্তকবি' উপন্যাসটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক কবিতা অন্তঃপ্রাণ

ব্যক্তি নলিনীকান্তকে। বহু কবিতা রচনা করলেও বর্তমান কবিসমাজে সে স্বীকৃতি পায়নি। তার চেষ্টা কবিসমাজ তাকে কবি বলে সম্মান করুক। নলিনীর ছোটবেলা থেকেই কবিসত্তা প্রকাশিত। কচুরিপানা, খেজুর বীজ যা দেখেছে তা নিয়েই সে কবিতা লিখেছে। স্কুলের মাস্টারমশাইদের নিয়ে বহু ছড়া বানিয়েছিল সে এক সময়। এমনকি, ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়েও সে কবিতা লিখেছিল। ভূগোল পরীক্ষায় উত্তরও সে পদ্যের আকারে দিয়েছিল। যদিও নম্বর পায়নি। মাস্টারমশাই তার কবিসত্তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ক্লাস বন্ধু জনার্দন তার প্রতিভা বুঝেছিল। জনার্দনের হয়ে প্রেমিকার জন্য কবিতায় প্রেমপত্র রচনা করে দিত নলিনী। পরবর্তী সময়ে জনার্দন সিনেমা জগতে 'কুমার জন'-এ পরিণত হয়। তার প্রতিপত্তিও বাড়ে। নলিনীকান্তের লড়াই চলতে থাকে। স্কুলের কেরানির চাকরি পর্যন্ত তার দৌড় থেমে যায়। তবে কবিতা চর্চায় কিন্তু কখনো তার ভাটা পড়েনি।

উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক নলিনীকান্তের বিবাহ পর্যায়কে বর্ণনা করেছেন। সেই পর্বেই উঠে আসে নলিনীকান্তের রুচির পরিচয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির পার্থক্য। বিয়ে বাড়িতে গান বাজানোর চয়ন তালিকা নলিনীকান্তকে মর্মাহত করে। তার স্ত্রী সুষমা। যার কাছে মামা নটবর কবিয়ালই প্রকৃত কবি। নলিনীর রচিত কবিতা তার কাছে আদিখ্যেতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে ঔপন্যাসিক নলিনীকান্তের কবিত্ব শক্তির মর্যাদার স্তরকে বোঝাতে ধীরে ধীরে পর্ব উন্মোচন করেছেন। এরপর নলিনীর কবি স্বভাবকে যদি লক্ষ করা যায় তাহলে সেখানে নলিনী জাত কবি। কারণ, সুষমা বাজারের ফর্দ এবং থলে ধরিয়ে দিলেও বারান্দায় বসে স্কুলের মেয়েদের দেখে কবিতা রচনা করার প্রবণতা দেখা যায়। সন্তর্পণে বাজারে পৌঁছেও তার স্বস্তি নেই। পাড়ার মস্তান খাবলুদা মার্ডার হওয়ায় তাকে রীতিমত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পার্টি অফিসে। খাবলুকে নিয়ে শব যাত্রায় প্লাকার্ডের লাইন রচনা করে দিতে হবে নলিনীকে। পার্টির নেতাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর কবিতা কখনো বন্দুকের নলের সামনে প্রাণের আশঙ্কার মধ্যে রচনা করা যায় না। কিন্তু নিরুপায় নলিনী। তাকে বহুকষ্টে মিলিয়ে মিলিয়ে খাবলুর হয়ে কবিতা রচনা করে দিতেই হয়। এভাবেই নলিনীকান্তের কবিজীবন চলতে থাকে।

বাঙালিরা জাত কবি। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কবিতা চর্চার নানা স্তর পার করেছে বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কবিতাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে বাংলা কবিতার ধারার বহু বাঁক বদল হয়েছে। কবিতার ভাষার বদল হয়েছে জীবনানন্দের হাত ধরে। এরপর একে একে অনেক শক্তিমান কবিরা আমাদের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবিতা রচনার পথ এখন যুগ মানসিকতার সঙ্গে পরিবর্তিত। একুশ শতকে কবিতার ভাব ভাষায় প্রকাশ না

করার প্রবণতা বড় বেশি পেয়ে বসেছে। যে যত কবিতায় অমিল এবং বিষয়ের জটিলতা দেখাবে সে ততই বড় মাপের কবি। নলিনী কবিতা লেখে বেশির ভাগটাই ছন্দ মিলিয়ে। প্রেমের কবিতায় নলিনী সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কবি সম্মেলনে তার কবিতা পাঠ হলেও শোনার লোক থাকে না। আর চেহারাগত দিক দিয়ে সে বোহেমিয়ানদের মতো হতে পারেনি। ফলে আধুনিক কবিদের কাছে কবি বলে সে জনপ্রিয় নয়। মামাশ্বশুর নটবর রায়ের কবিতা ট্রেনের হকাররা ব্যাপক হারে সেল করে। তিনি কবিয়াল বলে পরিচিত। তার কাছে আবার নলিনীর কবিতা দুর্বোধ্য। কিন্তু নতুন যুগের কবিরা বলেন নলিনীর কবিতার অর্থ ভাব সবই বোঝা যায়। তাই এযুগের কবিতায় তা ঠাঁই পায় না। এমন দ্বিমতের মাঝে নলিনীর নিজেকে নিয়ে দোলাচলতার সৃষ্টি হয়। কবি বলে কবিসমাজ তাকে পরিচিতি দিতে নারাজ হলেও সে কবিতা চর্চা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। তবে নলিনী আশাবাদী তার সুদিন আসবেই।

নলিনীর ভাগ্যাকাশে কুমার জনের আবির্ভাব হয়। তিনি অ্যালবাম তৈরি করবেন। প্রথম গানটাই তিনি নলিনীর লেখা গান দিয়ে শুরু করতে চান। বাল্যবন্ধুর কবিতার কদর প্রথম থেকেই করতেন জনার্দন ওরফে কুমার জন। তার সঙ্গে 'ওগো আমি গৃহলক্ষ্মী, আমায় মেরো না' নামে একটি সিনেমার গানের জন্যও প্রডিউসারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে নলিনীকান্তকে দিয়ে গান গাইবার জন্য। প্রডিউসার ভবদেব সাধুখাঁ নলিনীকে গান রচনা করতে বললেন। নলিনী গান রচনা করার জন্য প্রস্তুত। খুব সহজেই নলিনী সুযোগটাকে গ্রহণ করে নেয়। বাড়ি ফিরেই গান লিখে ফেলে—

"আমি তোমার আই লাইনার হাতে শাঁখা
আমি তোমার বব করা চুলে হালকা হালকা সিঁদুর রেখা।"[২৬]

নলিনী সাধারণ কবি। যে কোনো বিষয়ই তার কবিতায় স্থান পায়। তবে নারীদের প্রতি তার আকর্ষণ একটু বেশি। স্কুল কেরানি নলিনী যে ভালো কবিতা লেখে সে বিষয়ে সবাই জানে। স্কুলে নতুন জয়েন করা বাংলার দিদিমণি শ্রাবণীকে নিয়েও নলিনী কল্পনার জাল বোনে। রচিত হয় কবিতা। কিন্তু ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নলিনী ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দু'কথা শুনতে হয় শ্রাবণী দিদিমণির কাছ থেকে। পরে দিদিমণিকে রিক্সা ঠিক করে দেওয়ার প্রসঙ্গে নলিনীর ভাবনা আরো প্রসারিত হয়। সুষমাকে নিয়ে প্রথম প্রথম কবিতা তৈরি হলেও সংসার পটিয়সী সুষমা পরে আর নলিনীর কবিতার রসদ যোগাত না। তবে স্কুলের সেক্রেটারী রমেশ বড়ালের মেয়ে কৃষ্ণা বড়ালকে নিয়ে নলিনীর আলাদা অনুভূতি রয়েছে। তাকে কল্পনা করেও তার কবিতার লাইন মনে আসে।

সাধারণ কবিতা চর্চার গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাড়ায় একটি সাম্প্রদায়িক দলের উমেদার সিদ্ধিনাথ ও নলিনীর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র আলোক। আলোক বর্তমানে ব্রোকার। তার ভালোই নাম ডাক হয়েছে। তার একটা প্রশাসন পাড়ার মধ্যে চলে। নলিনীকে তারা তাদের দলের কর্মসূচির জন্য কবিতা রচনার কথা বলে। কিন্তু ছন্দ মিলিয়ে দলের জন্য কবিতায় কর্মসূচি লিখতে রাজি হয় না নলিনীকান্ত। এ কাজের জন্য তাকে নগদ চার হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে আলোচনা হয়। কিন্তু নলিনীর স্বভাব কবিত্ব নষ্ট হবে বলে সে এই কাজ করতে রাজি হয় না। মামাশ্বশুর নটবর কবিয়ালের 'কালো জামাই ফরসা মেয়ে', 'শালির প্রেমে স্ত্রী হত্যা', 'গৃহলক্ষ্মী নারীর আচরণ' এই ধরনের কবিতা ট্রেনে বহুল বিক্রি হয়। এক কথায় তিনি সমাজ বাস্তবতাকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আলোকের পরামর্শে দু'হাজার টাকার বিনিময়ে দলের কর্মসূচি রচনা করে দেওয়ার জন্য তিনি রাজি হয়ে যান। বাকি দু'হাজার নলিনী আর আলোকের মধ্যে ভাগ হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নলিনীর মনে হয় সত্যি এবার তার ভাগ্য বদল হবে। তার রচিত গান সিনেমায় হিট করে। এমনকি, তার রচিত একটি গান—

"ডালিম নয় বেলও নয়, লেবু-বাতাবি
আমি খেলব, খেলিতে চাই, খেলা কি নিবি?"[২৭]

অনেক বেশি টিনএজারদের পছন্দের তালিকায় চলে আসে। মুখে মুখে সে গান চর্চা হয়। কিন্তু এই গান যে ইভটিজিংয়ের বস্তু হয়ে উঠবে তা নলিনীর ধারণার বাইরে ছিল। যার দরুণ কবি সম্মেলন থেকে সে বাদ যেতে থাকে। কবিতা পাঠের জন্য তাকে আর ডাকা হয় না। তবে গানটি রচনা করে নলিনী নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়। সিনেমার পর্দায় তার নাম ভেসে ওঠা তার নিষ্ফল জীবনে আশার আলো সঞ্চার করে। গীতিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা তার কবিত্বের পরিচয়কে ছিনিয়ে নিতে বসেছিল। আসলে নলিনীকে তার কবিবন্ধু কার্তিক বলেছিলেন—

"... দেখুন, আপনারা সব ন্যাকা ন্যাকা কবিতা লেখেন। কবিতা উঠে আসবে
সমাজ থেকে, সমাজের শোষণ আর সংগ্রাম থেকে। এটাই হচ্ছে আধুনিকতা।"[২৮]

আসলে বর্তমানের কবিত্বের আধুনিকতার সংজ্ঞায় নলিনী অভ্যস্ত হতে পারে না। কারণ, এসময়ের কবিতার বিষয় নলিনীর ভালো লাগে না। তার চোখে বর্তমানের কবিতায় সমাজ বদলের সংগ্রাম, মুনাফালোভীদের চরিত্র বা রাজনৈতিক নেতাদের কাণ্ড নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য থাকে না। তাই সে পথে হাঁটতে নারাজ নলিনী। ফলে সে কারুর মন যুগিয়ে চলার পথে না হেঁটে ভাগ্যচক্রের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে। নলিনী উত্তর চব্বিশ পরগণার মাঝের গ্রামের বাসিন্দা। বন্ধু কুমার জনের

সঙ্গে তাকে যেতে হবে রানাঘাটে অনুষ্ঠিত একটি ফাংশানে। সেখানে জনার্দনকে শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হবে। সেই ফাংশানে নলিনীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনা তাকে বিখ্যাত করে তোলে। কবি এবং গীতিকার এই দুই পরিচয়ে তার খ্যাতি প্রচারিত হয়। তবে তার রচিত একটি গানকে অশ্লীল পর্যায়ে নামিয়ে এনে কবিসমাজ তাকে একপ্রকার তাদের জগৎ থেকে বহিষ্কার করেছে। তাতে নলিনীর কবি সত্তা আঘাত প্রাপ্ত হলেও গীতিকার পরিচয় তার ঘরে অর্থের অভাব মিটিয়েছে। মামাশ্বশুর নটবর কবিয়াল এসে দেখা করে গিয়েছেন এবং নলিনীকে আশীর্বাদও করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন প্রকৃত কবিদেরই ভাব-সমাধি ঘটে। মঞ্চে ওঠার পর নলিনীর অজ্ঞান হওয়ার সূত্র ধরে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আসলে প্রকৃত কবি যে কী আর বড় কবিই বা কী করে হওয়া যায় তা নলিনীর জানা নেই। কারণ মামাশ্বশুর নটবর দু'হাজার টাকার জন্য কবিতা রচনা করলেও যেহেতু সে কবিতা নেতাদের নিয়ে মিথ্যা প্রবচন তাই তিনি সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেন। নলিনী ভাবে নটবর রায় বড় কবি না হলে এ কাজ করার সাহস কোথা থেকে পান?

জীবনপথে নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে মেনে না নিলে পিছিয়ে পড়তে হয়। বা নিজেকে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন করে নেওয়াই জীবনকে স্বীকার করা। নলিনী নিজের অবস্থান নিয়ে দোলাচলতার মধ্যে পড়েছিল। কারণ, তার গীতিকার হিসেবে পরিচিতি পাড়ায় সম্মান বৃদ্ধি করেছিল। যার প্রভাব এসে পড়ে সুষমার ওপর। সিদ্ধিনাথ লোকাল পার্টির নেতা। আলোককে উমেদার করে তিনি পাঠান নলিনীকান্তর কাছে সুষমাকে পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড় করানোর জন্য। নলিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। ঘরের বউকে সে কিছুতেই ভোটে দাঁড়াতে দিতে রাজি নয়। কিন্তু আলোকের চোখে 'ব্যাকডেটেড' হওয়ার ভয়ে সে মেয়েদের এগিয়ে আসার কথা বলে। আলোকের বক্তব্যে সুষমাকে বাছার কারণ বেরিয়ে আসে—

> *"... গৃহবধূই তো চাই। মেয়েদের জন্য এখন সিট রিজার্ভ হয়েছে না? কুমারী মেয়ের চেয়ে গৃহবধূ খায় ভালো। মাথায় ঘোমটা দিয়ে, হাত জোড় করে ... সোনিয়া গান্ধীর ছবি দেখেননি স্যার!"*[২৯]

আসলে ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চায়েত ভোটে মেয়েদের ৫০ শতাংশ আসন বরাদ্দ হওয়ার কথা ঘোষণা হয়। সেই সূত্রেই নারীরা ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। আর গৃহবধূদের সামনে নিয়ে আসার কারণ অবশ্যই ভোটরাজনীতি। সুষমা এই সুযোগকে গ্রহণ করে। আসলে সুষমা এই সুযোগে নিজেকে একটু যাচাই করে নিতে চায়। গৃহকর্ম নিপুণা সুষমা স্বামীর কবিতা চর্চাকে প্রথম অবস্থায় আমল না দিলেও গীতিকার হিসেবে যশলাভের পর থেকে সমীহ করেই চলে। কিন্তু স্বামীর ছত্রছায়ায়

থাকতে তারও ভালো লাগে না। নিজের নামের খ্যাতি প্রচার হওয়ার নেশায় সেও প্রলোভিত হয়। কারণ নলিনীকে নিয়ে সুষমার ভিতরে একটা ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। আজ ভোটে দাঁড়াবার সুযোগে সে কথা বাইরে বেরিয়ে আসে—

> *"... কবিতা লেখার সময় কিছু বললে খেঁকিয়ে ওঠো না? তারপর কবিতা লেখা শেষ হলে জোর করে পড়ে শোনাও না! আমার ভালো লাগছে না, তবুও শুনতে হয়। তুমি জোর করে পড়ে শোনাও। এটা কি অত্যাচার নয়? আমি তো কাগজে পড়েছি স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পুরুষ যদি করে, সেটাই নির্যাতন। তুমি তো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করো, মানে পড়ো। এছাড়া যখন কোনো কাগজে তোমার কবিতা ছাপা হয়, খুব দেমাক তোমার। আমাকে চুনোপুঁটি ভাবো। এবার আর চুনোপুঁটি ভাবতে পারবে না।'*[৩০]

সুষমা মুক্ত হতে চায় তার গৃহবন্দি, পতিপরায়ণার জীবন থেকে। যে জীবনে নিজের প্রতিপত্তি থাকবে; স্বামীর মতো তারও নাম ডাক হবে, সে জীবন তার কাম্য। নলিনীর সঙ্গে ফাংশানে গিয়ে সে অনুভব করেছে স্বামী তার কত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কারণ অনেকেই অটোগ্রাফ নিতে এসেছে নলিনীর কাছে, আবার সুষমার দিকেও খাতা বাড়িয়ে দিয়েছিল তারা। নলিনী সই করার সময় ছন্দ মিলিয়ে দু'লাইন করে নামের সঙ্গে মানানসই কবিতা রচনা করে দিয়েছে। সুষমাও নলিনীর কবিতা রচনায় মিল খুঁজে দিয়ে নিজের পারদর্শিতা যাচাই করে নিয়েছে। একটা অন্য জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে জনপ্রিয়তার ছোঁয়ায়। ফলে নিজের কাছে যখন নেত্রী হওয়ার সুযোগ এলো তখন কী আর সে সেই সুযোগ গ্রহণ না করে থাকতে পারে? এলাকা জুড়ে নাম থাকবে, মিছিলে জয়ধ্বনি হবে। সবই সুষমার জন্য। আলোক নলিনীকে দলের জন্য চোদ্দ দফা কর্মসূচি লিখতে বলেছে, সঙ্গে বৌদিকে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুতও করতে বলেছে। সুষমাও তাড়া দেয় নলিনীকে তাড়াতাড়ি লেখার জন্য। বাড়িতে নিত্য পার্টির লোকেদের আগমন হয়। সুষমা তাদের আপ্যায়ন করে এবং টিভির লোকেদের আসার কথা জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে তাকে জনপ্রিয়তার নেশায় পেয়েছিল।

নলিনী চেয়েছিল কবিতার জগতে নিজেকে ধরে রাখতে। কিন্তু গীতিকার হিসেবে পরিচিতি তার কাছ থেকে কবির পরিচিতি কেড়ে নেয়। সে পথে আরও একধাপ এগিয়ে দিল সুষমার ভোটে দাঁড়ানো। চারিদিকে রটে গিয়েছিল নলিনী সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দিয়েছে। সে বলার চেষ্টা করে ভোটে সে নয়, তার বউ যোগদান করেছে। কিন্তু গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া কোনো গৃহবধূ কি ভোটে যোগ দিতে পারে? ফলে সব দায় নলিনীর ঘাড়ে এসে পড়ে। পরপর মদনপুর আর পায়রাডাঙায়

কবি সম্মেলন হয়ে গেলেও নলিনী ডাক পায় না। 'কবিতা বহ্নি' কাগজের পক্ষ থেকে উৎসবেও নলিনীকে বয়কট করা হয়। নিজের ওপর রাগে নলিনী কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু কবিতা যে নলিনীকে পায়। সে কবিতা না লিখতে চাইলেও কবিতা যে তার পিছু ছাড়ে না—

"তবু না লিখে পারা যায় না। বুকের ভিতরে কী একটা কাজ করে। বিপন্ন বিস্ময়। শুকনো ডাল ফুঁড়ে বের হওয়া বসন্তের পাতার মতন, উথলানো দুধের ফেনার মতন, গোয়ালার হাত ফসকানো বাছুরের মতন, লিক সাইকেল টিউবের হাওয়ার মতন, কবিতা বেরিয়ে আসতে চায়। নলিনী দুটো লাইন পেয়েছে সম্প্রতি—

শয়তান আজ ঈশ্বরের মুখোশ পরে কইছে কথা,
বলছে আমি তোর রক্ষাকর্তা, আমিই তোর ত্রাতা।'[৩১]

নলিনী তার রচিত কবিতার প্রকাশ মাধ্যম খোঁজে। স্কুলের সেক্রেটারি রমেশ বড়াল আধ্যাত্মিক কবিতা লেখেন এবং তাদের আলাদা পত্রিকাও আছে। নলিনী তার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। রমেশ বড়ালের মেয়ে কৃষ্ণার জন্য যতই আলাদা জায়গা তার মনে থাকুক না কেন আজ নলিনী যাবে শুধু কবিতার স্বার্থে। অন্যদিকে দেশপ্রেমিক (জি) দলের জন্য কবিতা লিখতে হবে। সিদ্ধিনাথদাও তাকে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কবিতা রচনার জন্য রসদ চাই। নলিনী গঙ্গার ধারে সাইকেল চালাতে চালাতে কবিতার রসদ পেয়ে যায়। নলিনীর জীবন তাকে বড় বেশি অভিজ্ঞ করে তুলেছে। কবিতা তাকে প্রকাশ করতেই হবে। রমেশ বড়ালের বাড়িতে পৌঁছে যায় নলিনী। রমেশ বড়াল পুজো করতে ব্যস্ত থাকায় নলিনী অপেক্ষা করে। বাড়িতে কৃষ্ণার উপস্থিতি সে অনুভব করে। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে। রমেশ বড়ালের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে তার প্রাইভেট টিউশনির ছেলেটির জন্য গরুর আত্মজীবনী লিখতে থাকে। রমেশ বড়াল এলে তার সঙ্গে কথা হয়। তিনি নলিনীকে তাঁদের ছাপানো 'শঙ্খচক্র' পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়তে বলেন। এতে নলিনীর আধ্যাত্মিক মার্গের কবিতা লিখতে সুবিধে হবে। প্রকাশ মাধ্যম চাই নলিনীর। বহু কবিতা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। নলিনী ভাবে তার কবিতা শোনার লোক কোথাও নেই, তবুও কবিতারা শিশুর মতো জন্ম নেয়। রমেশ বড়ালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একাকী সাইকেল চালাতে চালাতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত্রি সমাগত। আকাশ জুড়ে মেঘের মাঝে তারাদের খেলা নলিনীকে প্রলুব্ধ করে। এই মধুর যামিনীতে কৃষ্ণা বড়ালের কথা মনে উদয় হয় নলিনীর। তাকে নিয়ে কবিতা বাঁধতে মন চায়। কিন্তু নলিনী জানে তার বুকের মাঝে হিল্লোল সৃষ্টিকারী কৃষ্ণার একদিন বিয়ে

হবে। সে সিঁদুর পরে গৃহবধূ হবে। গৃহবধূকে নিয়ে কবিতা রচনা আর সম্ভব হবে না। এই চিন্তার মাঝে তীব্র গতিতে মটরসাইকেলের আওয়াজ সমস্ত ভাবনায় ছেদ টানে। সে একাকী আবৃত্তি করে—

"আজি কৃষ্ণার বুকে হিংস্র আলোর
ছবির তীক্ষ্ণ ফলা।
বস্ত্রহরণ পালা।'[৩২]

নলিনীর কবিতা আজ সত্য রূপে প্রতিপন্ন হয়। বাস্তবের কৃষ্ণা আজ আলোকের হাতে ধর্ষিত হচ্ছিল। নলিনীর উপস্থিতি এবং কবিতা আজ সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কৃষ্ণা মুক্তি পেয়ে নলিনীর কাছে আশ্রয় নেয়। কৃষ্ণার উদ্ধারকর্তা আজ নলিনী। নলিনীর কবিতা আজ উদ্ধারকারীর ভূমিকা পালন করে। নলিনীর জিজ্ঞাসাবাদে কৃষ্ণা জানায়— আলোক কৃষ্ণাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় কৃষ্ণা রাজি না হলেও তারা মেলামেশা করত। কৃষ্ণার বিয়ে ঠিক হয়েছে। এই সময় আলোক তার কাছে দেহসুখ উপভোগ করতে চায়। কিন্তু কৃষ্ণা সে প্রস্তাবে নারাজ। আর সেই সুযোগে চাকু দেখিয়ে কৃষ্ণাকে ধর্ষণ করতে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সঠিক সময়ে নলিনীর উপস্থিতি কৃষ্ণাকে উদ্ধার করে। কৃষ্ণা নলিনীকে সব কথা জানিয়েছে। কৃষ্ণা তার বাবাকে এই ঘটনা জানাতে বারণ করে। তার হবু বর ব্যাঙ্কের অফিসার। বিয়েটা যেন ভেঙে না যায়। তাই নলিনীকে আজ 'কাকু' সম্বোধন করে কৃষ্ণা, এই ঘটনা চেপে যাওয়ার অনুরোধ করে। কৃষ্ণার আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে গর্ব অনুভব করে নলিনী। জীবনকে বড্ড রহস্যঘন মনে হয় নলিনীর। তার গতিপথ এক স্বচ্ছ কবির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? রাতের অন্ধকার তাকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। যেখানে সে স্বপ্নপূরণ হওয়ার অনেক কাছে পৌঁছে যায়। নলিনী শুধু চেয়েছে কবি হিসেবে পরিচিতি। সেই পরিচিতি রমেশ বড়াল তাকে স্বপ্নে দিয়েছেন। 'কান্তকবি'র উপাধি, সঙ্গে মানপত্র। স্বপ্নে শুধু কবি হিসেবে পরিচিতিই নয় আসে কবিত্বের অপব্যবহারের স্বপ্নও। আলোক, সিদ্ধিনাথ এরা সবাই, এমনকি, সুষমা পর্যন্ত দলের হয়ে চোদ্দদফা কর্মসূচি লিখে দিতে তাড়া দেয়। অনন্য উপায় নলিনী কবিতা লেখে। আলোকের চোখরাঙানিকে সে ভয় করে না। সিদ্ধিনাথকেও না। স্বপ্নেই নলিনীর প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠে। সে ভরা মঞ্চে নেতাদের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করতে থাকে—

"শোনেন বন্ধুগণ।
শোনেন বন্ধুগণ দিয়া মন করুণ কাহিনি
নিরীহ কবিরে নিয়া করে টানাটানি।
কবি বুঝে কম।

কবি বুঝে কম, নাই দম কলম সম্বল।

টাকায় দীন, শরীর ক্ষীণ, পেটেতে অম্বল।

তবু কলমখানা

তবু কলমখানা বেচিব না, যতই বলো না

নেতার কুমন্ত্রণা কী যন্ত্রণা, আর শুনিব না।

সব করব ফাঁস ... দিব বাঁশ এই আসরেতে...'[৩৩]

নলিনীর প্রতিবাদ স্বপ্নে হলেও সে অনুভব করে তার ভিতরের যন্ত্রণাকে। মিথ্যে বলা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। নটবর কবিয়াল পারেননি। আজ নলিনীও পারবে না। তার নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসে। স্বপ্নের ঘটনাকে নলিনী বাস্তব রূপ দিতে চায়। ঘুম থেকে উঠে সে তার প্রিয় দুটাকা দামের ডট পেন নিয়ে বাস্তবের মাটিতে ভর দিয়ে চলতে চায়। প্রতিবাদে গর্জে উঠতে চায়। নলিনীকান্ত আজ খান্ত হবে না। স্বপ্নকে সে বাস্তবে রূপ দেবে। জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চায় সে। আনুগত্যহীন জীবনই কবির কাম্য। সে পথেই পাড়ি দেবে নলিনীকান্ত। প্রকৃত কবিসত্তা আজ তাকে আবিষ্কার করেছে। অন্তরের কবি সত্তার কাছে বাধা পেয়ে তার হাত ধরেই নলিনী কবিতা চর্চায় সৎ পথে চলতে শুরু করে। সে নিজের প্রতি আস্থা ফিরে পায়, তাই নিজের কবি সত্তার হাত ধরে অজানার দিকে পাড়ি দেয় 'কান্তকবি'।

নলিনীকান্ত একজন সংসারী কবি। স্ত্রীর সঙ্গে তার সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী নলিনীকান্তকে এমন এক কবি চরিত্রের জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন যাকে সংসার, সমাজ এবং রাজনীতির চাপ সহ্য করতে হয়। কবিসত্তাই তার জীবনের মূল। যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক না কেন সে তার কবিসত্তাকে বিসর্জন দিতে পারে না। আমাদের সমাজে নলিনীর মতো বহু কবি রয়েছেন যারা তথাকথিত বোহেমিয়ান গোছের নয়। তারা সংসার জীবনের সমান্তরালে কবিতা রচনা করতে করতে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু এর ফলে সে হয়ে পড়ে 'না ঘরকা না ঘাটকা'। অর্থাৎ প্রকৃত কবিসমাজ তাকে কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। নলিনীকান্তের মতো চরিত্ররা অতি-আধুনিক কবিদের মতো কবিতা লিখতে পারে না। কবিতার ভাব তাদের বক্তব্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এ কবিতা তো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। আজকের কবিতা রচনা বক্তব্যকে অব্যক্তই রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কান্তকবিরা তো সে পথে হাঁটতে পারে না। তাই তারা কবিগোষ্ঠী থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। আসলে নলিনীকান্তের মতো ব্যক্তিরা জনস্রোতে তাদের সামাজিক জীবনকে উপেক্ষা করতে পারে না। উপরন্তু যদি রাজনৈতিক নেতাদের

চাপ থাকে তবে তাদের কবিতার দফারফা হওয়ার সামিল হয়। নলিনীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে শত আঘাত, প্রত্যাঘাত সহ্য করেও কবিসত্তা সদা জাগ্রত থাকে। নলিনী তার উদাহরণ। সৎ কবিদের বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়। নলিনীকেও হয়েছে। তবু সে তার জৈবিক কবি সত্তাকে হত্যা করেনি। কবিতা তো তার অন্তরে বসবাস করে। তারা যে কোন সময় নলিনীকে ব্যস্ত করে তোলে বাহিরে প্রকাশ পাবার জন্য। নলিনী তাদের মুক্তি দেয় নিজের ছন্দে। কবি হিসেবে তার পরিচিতি পাওয়ার জন্য নয়। এক প্রকৃত কবির চিত্রই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালি জাতির কাব্যচর্চায় সুখ্যাতি রয়েছে। সেই সুখ্যাতির মাঝে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তথ্যসমৃদ্ধ 'কান্তকবি' উপন্যাস এক কবির ব্যক্তিজীবনের চিত্রকেই পরিস্ফুট করে। আসলে এক প্রকৃত কবির কাছে স্বীকৃতিই মূল বিষয় হতে পারে না। তার রচনাই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। নলিনীর কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা সে কথাই প্রমাণ করে। উপন্যাসের মধ্যে এক কবি জীবনের ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে, যা ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর চরিত্র নির্মাণে আরো এক মাত্রা যোগ করেন। এবারে আমরা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর অনন্য সৃষ্টি 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের দিকে অগ্রসর হব।

৪

'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন করেন সমাজের জলজ্যান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যে ঘটনা মানুষের জীবনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের চলমান জীবনকে প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন করায়, সে সব আত্মজিজ্ঞাসার নিরসন করেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিকগত দিক দিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এযাবৎ ঔপন্যাসিকেরা করে চলেছেন। একুশ শতকের জটিল সমাজ শরীরে একাধিক আন্তর্বিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার চিহ্ন হিসেবে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' এক পালাবদলের পরিচায়ক। ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত 'রোববার' পত্রিকায় ২০১২-২০১৩ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই উপন্যাসটি পাঠকবর্গের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর 'আনন্দ পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়। উপন্যাসটিকে রূপান্তরকামী মানুষদের শরীর মনস্তত্ত্বের আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এর বিস্তৃত কাহিনি আখ্যান থেকে। রূপান্তরকামী মানুষদের সম্পর্কে আগ্রহের কারণ বলতে গিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেছেন—

"ছোটবেলা থেকেই তথাকথিত 'মেয়েলি ছেলেদের' অপমানিত হতে দেখেছি

সমাজের নানা ক্ষেত্রে। ওদের কষ্ট পাওয়া উপলব্ধি করেছি। মানুষের লিঙ্গপরিচয় এবং লৈঙ্গিক আচরণের আলোছায়া বুঝতে চেষ্টা করেছি।'[৩৪]

এই বুঝতে চাওয়ার তাগিদ থেকেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক আখ্যানকে তুলে ধরা। ১৪২০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। রূপান্তরকামী বা বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সর্বোচ্চ আদালত। আদালত নারী ও পুরুষদের মতই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপেরও নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর পরেও আমাদের সমাজের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে কি? এ প্রশ্ন রয়েই যায়। ট্রান্সজেজণ্ডার, সমকামী, উভকামী এই ধরনের মানুষদের কথাই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ইতিপূর্বে অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু হিজড়ে সমাজ ও পুরুষ যৌনকর্মীদের নিয়ে গবেষণামূলক কর্মে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী এবং ভারতবর্ষের এক বিশাল চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁরা। তথ্য সমৃদ্ধ তাঁদের গ্রন্থগুলি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে ঠিকই। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমাজের অন্যপরিচয় বহনকারী মানুষগুলির আঁতের কথাকে তুলে ধরলেন 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে। রূপান্তরকামী মানুষগুলোর জীবন সংকটের ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন পর্যায়কে আত্মিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন। যারা অস্ত্রপচার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অস্ত্রোপচার করে রূপান্তরকামী মানুষগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে পারে। সে সম্পর্কে তথ্য 'পুরুষ যখন যৌনকর্মী' গ্রন্থের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে—

> *"আমাদের দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পক্ষে এর ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই কৈশোর ও যৌবনে নিজেদের ভিন্ন-যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার মধ্যে এরা বহুগামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবেই চলতে চলতে কেউ কেউ যৌনব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যাদের আর্থিক ক্ষমতা আছে তাদের অনেকেই আবার লিঙ্গচ্ছেদনের ভয়ে পিছিয়ে আসে। লিঙ্গচ্ছেদন করে নারীরূপ ধারণ করলেই যে ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।'*[৩৫]

একটা আগাম বার্তা বক্তব্যটি থেকে প্রকাশিত হয়। আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সমাজের সর্বপ্রথম প্রয়োজন। তা না হলে একটু আলাদা লিঙ্গ পরিচয় বহনকারী মানুষগুলির জীবন অনিশ্চয়তার

মধ্যে ডুবে যায়। এক আত্মজিজ্ঞাসা নিয়েই স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমাজের তথাকথিত আলাদা লিঙ্গ পরিচয়বাহী মানুষগুলির আখ্যান রচনা করলেন 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে।

উপন্যাসের পটভূমির সূচনা কলকাতার আকাশবাণীকে কেন্দ্র করে। আকাশবাণীতে কর্মরত অবস্থায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'সন্ধিক্ষণ' নামে যৌন শিক্ষা কেন্দ্রিক একটি অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্‌গম। এর পর তথ্য অনুসন্ধান করতে তিনি হাত বাড়িয়েছেন প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, জেনেটিক্স, নৃতত্ত্ব, মিথ-পুরাণ আর বহির্ভারতে যৌনতাকে কেন্দ্র করে সামাজিক অবস্থার দিকে। এসবের মধ্যে যোগ দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির।

'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য লড়াই করা মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে। 'ঈশ্বরের ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট' ভাবা হত যে মানুষগুলিকে তাদের জীবনবৃত্তই এই উপন্যাসের আধার। একই সঙ্গে পুরাণ ও লোককথায় রূপান্তরকামী বা বৃহন্নলাদের যে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রয়েছে, সেই ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরতে ভুলে যাননি ঔপন্যাসিক।

মানুষ এবং জীবজগতের রহস্য উন্মোচন করলে দেখা যায় এ দুটি বহু বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ। মহাকাশের বিভিন্ন বল ও গতিবেগের এদিক-ওদিক হলে অনর্থ হয়ে যায়। সূক্ষ্ম অনু-পরমাণুর মধ্যেও নিয়মের কড়াকড়ি। এই নিয়ম সমাজ শরীরেও বিদ্যমান। দ্বৈত পরিচয় নিয়ে জন্মানো মানুষগুলির সঙ্গেও যেন অনু-পরমাণুর সম্পর্ক। সমাজের চলমান গতিপথে তাদের আচরণ তাই অন্যদের কাছে নীতিবিরুদ্ধ মনে হয়। এদের করে দেওয়া হয় ব্রাত্য, আইনের জটিলতায় এদের ব্যক্তি জীবন হয়ে যায় শৃঙ্খলিত। এমন মানুষদের কথাই স্বপ্নময় চক্রবর্তী তার 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

প্রতিটি মানুষের রক্তে জিনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই ব্যক্তিভেদে চরিত্রগত পার্থক্য সচরাচর চোখে পড়ে। শৈশবকাল থেকেই প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বহু বিচিত্র আচরণ তাঁর পরবর্তী জীবনাধ্যায়ে বাঁকবদলের মধ্যে দিয়ে সেই ব্যক্তিকে সমাজ-উপযোগী করে তোলে। কিন্তু জৈবতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ, মানুষের মনের সংযোগ সম্পর্ক এসব নিয়ে বহু বিচার যুক্তি থাকলেও সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা জানতাম না যে-মন বলতে আলাদা একটি সত্তা আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে পরিচালনা করে। মানবমন আর মানবশরীর যে একে অপরকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ধরে আছে এই সত্য আমরা মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের আগে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শিখিনি। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড 'The

Intrepretation of Dreams' (১৮৯৯) এবং 'Psychopathology of Everyday Life' (১৯০১) নামে দু'খানি গ্রন্থ লেখেন— যার মধ্যে আমাদের ধারণার বিপুল পরিবর্তন সাধিত হল। তিনি ১৯০৫ সালে যৌনমানস সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন 'Three Eassy on the theory of Sexuality' নামক গ্রন্থে। এই তত্ত্বটি 'লিবিডো তত্ত্ব' নামে পরিচিত। অন্যদিকে তিনি বলেন— শৈশবের সব আচরণ ও ইচ্ছে যৌনতা ভিত্তিক। যার নামকরণ করেছেন 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'। এই তত্ত্ব অনুসারে মাতার প্রতি পুত্রের কামেচ্ছা এবং এই কামেচ্ছা নিবারণে পিতাকে সে পথের কাঁটা মনে করে। অন্যদিকে কন্যা সন্তানও মাকে অন্তরায় ভাবে যা 'ঋণাত্মক ইডিপাস কমপ্লেক্স' নামে চিহ্নিত হয়। এই তত্ত্ব অনুসারেই মেয়ে বা ছেলেদের মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তি সত্তার দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। কারণ বহু পুত্র বা কন্যা সন্তান পিতা বা মাতা ছাড়াই সমাজদেহে বড় হয়ে ওঠে। তাদের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব খাটে না। তবে মন যে মানবজীবনের বহু বিচিত্র কর্মজগতকে পরিচালনা করে এই তত্ত্বকে মেনে নেওয়া যায়। আর এ থেকেই জৈবিকসত্তা আর মানবিকসত্তার দ্বন্দ্ব শুরু। পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মালেও মনটি তার বারবার নারীর অঙ্গ কামনা করে, অন্যদিকে নারীর অঙ্গেই যেন নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে চায় না অন্য মেয়েটি। এই ধরনের দ্বৈত সত্তার মানুষদের আমরা কোন তত্ত্বে বিশ্লেষণ করবো? প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জৈবিক বা মানসিক কোন তত্ত্বই যেন জোরালো হয়ে উঠতে পারে না। 'হলদে গোলাপ' সেই উপন্যাস যেখানে সমাজের সেই মানুষদের কথাকে আত্মকথায়, বর্ণনায়, নানা ব্যাখ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

উপন্যাসটির কেন্দ্রিয় চরিত্র অনিকেত। তাকে কেন্দ্র করেই রূপান্তরকামী মানুষগুলোর অন্তরাত্মাকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। অনিকেত আকাশবাণীর স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের প্রযোজক। সেই সূত্রে শহরের বহুপ্রান্ত বা গ্রামগঞ্জ থেকে বহু সমস্যা কেন্দ্রিক চিঠিপত্র আসে। এই চিঠিপত্রগুলিকে কেন্দ্র করেই অনিকেতের মাথায় যৌন শিক্ষার অনুষ্ঠান করার কথা আসে। অনুষ্ঠানের সূত্রেই তাঁকে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে হয় সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে। উঠে আসে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণ ঘোষদের জীবন কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে আপাত নিম্নস্তরের পরিচয় সন্ধানী মানুষের কথা। পরি, দুলালী, মন্টু, আইভি, তৃপ্তি সামন্ত, সমাজের যারা 'বোঝা', 'ডিফেক্ট' হিসেবে পরিচিত তাদের সমস্যার কথা, তাদের উপলব্ধির কথাই 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের কথাবস্তু।

উপন্যাস কাহিনির গতি শুরু হয়েছে অনিকেতের কাছে জমা হওয়া এবং উত্তর দিতে না

পারা কিছু চিঠির ভবিষ্যৎ নিয়ে। চিঠিগুলির কোনটিতে বয়ঃসন্ধির নানা সমস্যা, কোনটিতে কিশোরীদের যৌবনাগমের দুঃশ্চিন্তা, কখনো বা ইভটিজিংয়ের শিকার হওয়া কোন সময়ের কথা, আবার কখনো বাড়িতেই কোন মেয়ের শ্লীলতাহানির মতো দুষ্কর্মের প্রসঙ্গ। এর সঙ্গে 'প্রেমার্থ কবি'র পুরুষ শরীরের ভিতর নারীর মন ও শরীরের বাসনা নিয়ে নানা প্রশ্ন সংবলিত কবিতা এসে অনিকেতকে ধাক্কা দিয়েছিল। কবিতাটির গঠনগত ও বিষয়গত সংরূপ উপন্যাসের সূচনাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

"তুমি নারী নিউটন— ফেলে আকর্ষণকরণী
তুমি নারী আলফা বিটা গামা গামিনী
তুমি নারী চুমি তব নিশিত যাপন
তুমি মম স্নিগ্ধ প্রতিমা
তুমি স্তনদ্বয়ে মণ্ডিতা
তুমি মম পুষ্প রূপিণী
তুমি আকাশের চন্দ্রের সমা
তুমি মম হৃদয় মহিমা
তুমি রহিমা, তুমি গরিমা
তুমি মম হৃদয়ের ঝিমঝিমা।
কিন্তু তুমি সত্যিই কি নারী?"[৩৬]

মানব মন ও শরীর নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনিকেতকে অনুসন্ধানী করে তোলে। নারী শরীরের মধ্যে এমন কী রয়েছে যার জন্য প্রেমার্থ কবির চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে? একে একে বহু চিঠি অনিকেতের মনকে উত্তর খোঁজার দিকে নিয়ে যায়। অনিকেত দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করেছে ধীরে ধীরে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে গণমাধ্যম। মানুষ এখন গণমাধ্যমের ক্রিড়নক মাত্র। উপন্যাসটির সূচনাকাল নির্দিষ্ট করেছেন ১৯৯৫ সালকে। ফলে বিশ্বায়ন যে মানুষের জীবনকে দোলাচলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল সেটা অনুমান করা যায়। তাছাড়া গণমাধ্যমের হস্তক্ষেপে সাধারণ মানুষের জীবনের পট পরিবর্তনকে অনিকেত খুব কাছ থেকে দেখেছে। ফলে তার সামনে আগামী সময়ের চিত্রটি স্পষ্ট। তবে যে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম কাজ করেনি সে বিষয়টির প্রতিই অনিকেতের আগ্রহ। সে বলেছে—

"আর একটা ব্যাপার দেখুন, নিজেদের শরীরের ওপর এই আধুনিক প্রজন্মের কোনও 'সে' নেই। সবই মিডিয়া-নিয়ন্ত্রিত। মিডিয়া বলে দিচ্ছে তোমাদের

শরীর কেমন হবে। কোনও বিজ্ঞাপন বলছে, অমুক তেল ব্যবহার করো, তাতে তোমাদের ব্রেস্ট বাড়বে। ব্রেস্ট ছোট থাকা খুব খারাপ। নারীই হলে না তুমি। আবার মিডিয়াই বলছে জিরো ফিগারই হল আইডিয়াল। রোগা হও। স্তন ছোট রাখো। ছোটখাটো ফিগারের মেয়েরাই হল সুন্দরী। মেয়েরা ডায়েটিং করছে। কিচ্ছু খাচ্ছে না। দুর্বল হয়ে পড়ছে।''[৩৭]

এই ধরনের সমস্যায় মেয়েদের জীবন যে কীভাবে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তা ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী খুঁজে বের করেন। অনিকেত 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ওরফে প্রধান চরিত্র। তারা অনুসন্ধিৎসু মনের তাগিদেই অন্য মানুষগুলির ভিন্নস্বর অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে উপন্যাসটির মধ্যে। অনিকেতের কর্মজগৎ পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে।

স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে অনিকেত 'সন্ধিক্ষণ' নামক একটি অনুষ্ঠান শুরু করে। অনুষ্ঠানের অ্যাডভাইসরি বোর্ড হিসেবে সাইকোলজিস্ট, গাইনোকলজিস্ট, শিক্ষাবিদ, স্যোলিওলজিস্টদের রাখা হয়। যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঠক্রমে এডোলেশন্স এডুকেশন চালু হয়নি, সে সময় প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগিয়ে আকাশবাণীতে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানের এপিসোড শুরু হয়। শরীর বিবর্তন, কোষ, ক্রোমোজম, প্রজনন অঙ্গ, শুক্রাণু, ডিম্বাণু, যৌনতা, বিকৃত যৌনতা ইত্যাদি বহু বিষয়কে কেন্দ্র করে এপিসোডের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। রূপান্তরিত মানুষদের পরিচয়, তাদের জীবনচর্যা জানতে যেতে হয় হিজড়েদের 'খোল'-এ, আর সেখান থেকেই অনিকেত উদ্ধার করে বহু রহস্যমণ্ডিত মানব রূপের চিত্র।

রূপান্তরকামী মানুষদের সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে অনিকেত। সেই সূত্রে সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার কাহিনি জানতে পারা যায়। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তরের ইতিহাস ও ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে অনিকেতের জানার পরিধি বৃদ্ধি পায়। সেই সূত্রে পরি ও দুলালী আখ্যানের পরিব্যাপ্তি। অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তর সজ্জিত। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রূপান্তরকামী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে হয়ত ততটা যুঝতে হয়নি। কিন্তু যেসব রূপান্তরকামী মানুষেরা যারা দারিদ্র্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ তাদের জীবন-ইতিহাস আলাদা। এই শ্রেণির মানুষগুলির হয়েই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কলম ধারণ। আমাদের সমাজ নারী বা পুরুষ তৈরি করে। সিমোন দ্য বোভেয়র তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' বইতে সে সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু তথাকথিত লিঙ্গ পরিচয়ের বাইরের মানুষগুলিকে নিয়ে আমাদের সমাজ সবসময়ের জন্য ভিন্ন মানসিকতা পোষণ করে। 'হলদে গোলাপ'

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পবন ধলের মধ্য দিয়ে সে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন—

> *"গোলাপের রং তো আমরা গোলাপ-ই বুঝি। পিংক। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে শিল্পীসত্তা আছে, পরের জন্য দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে, আবার হিংসা— পরিশ্রমীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।'"*[৩৮]

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় মানুষদের ভিন্ন স্বরের অনুসন্ধানী। তাঁর দেখা ক্যানভাসের মধ্যে তিনি মানুষের শরীর ও মনের ভিন্ন স্তর নিয়ে প্রশ্নধারণকারীদের আত্মবিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে।

অনিকেতকে কেন্দ্র করেই বেরিয়ে আসে বহু চরিত্রের আত্মকথা। প্রথমেই উঠে আসে পরির কথা, পরির স্বর। পরির আত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মা মঞ্জুর জীবন জিজ্ঞাসা। ফলে ঔপন্যাসিক পরপর দুটি অধ্যায়ে পরি ও মঞ্জুর আত্মকথাকে তুলে ধরেছেন। অনিকেতের বাল্যবন্ধু মঞ্জুর ছেলে পরিমল। কিন্তু পরিমল নয়, 'পরি' নামের মধ্যেই সে নিজেকে বেশি খুঁজে পায়। পরির মধ্যে 'মেয়েলী' ভাবের পরিচয় পেয়ে মঞ্জু চিন্তিত। আকাশবাণীতে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে দুটি পর্ব হয়। সেই পর্বের মধ্যে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পদক্ষেপের কথা আলোচনা হয়। এইসূত্রে মঞ্জু অনিকেতের কাছে আসে যদি তার ছেলের মেয়েলীভাবের যে 'অসুখ' তার কিছু সমাধান করা যায়। লক্ষণীয়, মঞ্জু তার ছেলের স্বাভাবিক আচরণকে 'অসুখ' বলে মনে করছে। তাই সে অনিকেতের দ্বারস্থ। দীর্ঘদিন পরে মঞ্জুর সঙ্গে অনিকেতের দেখা। মঞ্জুর জীবনে ঘটে যাওয়া বহু শারীরিক অত্যাচার, স্বামীর ঘর করতে গিয়ে গঞ্জনার শিকার, পরির বাবার দ্বিতীয় বিয়ে ইত্যাদি বিষয়গুলি অনিকেত জানতে পারে। পরি কখনো বাবার মতো হতে চায়নি। কারণ যে ব্যক্তি পুরুষত্ব দেখাতে গিয়ে বউকে পেটায়, 'মরাকাঠ' বলে অরুচি দেখায়, অন্য নারীমুখী হয়, সেরকম পুরুষত্বের অধিকার সে চায়নি। বরং পরির মধ্যে একটা আফসোস-বোধ জন্মায়— সে নারীর শরীর নিয়ে কেন জন্মায়নি? নারীর শরীর তার কাম্য। সে তার মনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারে। ঈশ্বর প্রদত্ত শরীরটি তার মনঃপুত নয়। তাই বোধ জন্মাবার পর থেকেই সে বারবার নিজের শরীরকে সংশোধন করতে চেয়েছে। নারীর শরীরে গঠন তার আত্মার আত্মীয়। তাই সে ভেবেছে—

> *"আমার বুকটা যদি ওরকম ভরাট আর ভরন্ত হয়ে যেত, তা হলে কত ভাল*

হত। ওরকম ফুলের মতো বুকের মাঝখানে হারের লকেটটা ঝুলবে। সেখানে দু'টো স্তন তাদের আলাদা-আলাদা রূপ পেয়েছে, সেই জায়গাটাকে ক্লিভেজ বলে। নাটকাও সুন্দর, দেখতেও সুন্দর। আমার চোখেই এত সুন্দর লাগে, তবে তো ছেলেদের চোখে আরও সুন্দর লাগবে। সুন্দরী মেয়েদের দেখলে আমার কেমন যেন একটা হিংসে হয়। মাইরি বলছি। মান্না দে-র ওই গানটা মনে পড়ে। 'ও কেন এত সুন্দরী হল ...।' আমি কেন হলাম না?'[৩৯]

পরি নিজে পুরুষ হয়েও সে নিজেকে নারী মনে করে। নারীর মন নিয়ে সে তার সমগ্র জীবনটাকে সাজাতে চায়। তাই বাবা নয় মায়ের আচার, আচরণ, সাজগোজ সবই পরির ভালোলাগে। কিন্তু মা যখন বলেছে— 'পুরুষ হয়ে ওঠ', পরি পারেনি মায়ের কথা রাখতে। মামাতো দাদারা বাজে বই পড়তে দিয়েছে, জিমে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। কারণ মনেপ্রাণে নারী হতে চেয়েছে সে। নারী শরীর কামনা করে সে কবিতা লেখে। কবিতা পত্রিকা 'প্রবর্তক'-এ তার কবিতা ছাপাও হয়। তবে মনে নিজের সত্ত্বাকে নিয়ে একটা দ্বিধা শুরু হয় পরির মধ্যে—

"সেভেন-এইট'-এ হিন্দি ছিল স্কুলে। হিন্দির লিঙ্গ-টিঙ্গগুলো ভারি ইয়ে ...। দোয়াত পুংলিঙ্গ, কলম স্ত্রী লিঙ্গ। তালা স্ত্রী লিঙ্গ, চাবি পুংলিঙ্গ। যা কিছু গ্রহণ করে, সব স্ত্রীলিঙ্গ। বোতাম যদি পুংলিঙ্গ হয় তবে বোতামের ঘর স্ত্রী লিঙ্গ। পরিমল তো পুংলিঙ্গ। পরি কি লিঙ্গ তবে? পরি আর পরিমল নিয়েই তো আমি। আমি কী লিঙ্গ? আমাকে তো পাড়ার অনেকে কী সব বলে। হিজড়েও বলে। হিজড়েদের ভালোকথায় 'ক্লীব' বলে! আমি কি ক্লিব লিঙ্গ?"[৪০]

দ্বৈতসত্তার সমন্বয়ে পরি নিজে পরিমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করতে থাকে। 'প্রবর্তক' পত্রিকা সূত্রে আরো অনেক রূপান্তরকামী, সমকামী মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অন্যদের মত তার মনেও তৈরি হয় সমাজে নিজের সত্ত্বাকে আলাদা রূপে পরিচয় দানের ইচ্ছে। কিন্তু প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। কারণ মায়ের রোজগারের উপরই তাকে নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে পরি জানে মা তার আর অরূপদার সম্পর্ক কোনদিন মেনে নেবে না। অরূপ উভকামী জেনেও অরূপদার জন্যই নিজেকে বদলাতে চায় পরি। পুরুষের রূপ বদলে হতে চায় পূর্ণাঙ্গ নারী। কারণ পরির নারী হৃদয় অরূপদাকে ভালোবাসে।

পরিকে বারবার তার দ্বৈতসত্তার জন্য পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে কুমন্তব্য শুনতে হয়। এই অছিলায় ছেলেরা তার সঙ্গে মিশতে চাইত না। কিন্তু পরি এসবের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের

সম্পর্কে সচেতন। সে জানে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, 'প্রবর্তক' গোষ্ঠীর রূপান্তরকামী মানুষগুলোর কথা। তাই রূপান্তরিত হয়ে সে চায় সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে।

অর্থাভাবে ভিন্ন পথে অর্থ উপার্জন করে পরি, কারণ তাকে নিজের সার্জারি করাতে হবে। পরি বাংলা অনার্স শেষ করে ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর কোর্স করতে চায়। কিন্তু মায়ের ছিল চূড়ান্ত আপত্তি। তাই মায়ের মৃত্যুর পর শুরু হয় তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। মায়ের LIC -তে জমানো টাকা দিয়ে ফ্যাশান ডিজাইনিং-এর কোর্স করে এক কোম্পানীতে চাকরি নেয় সে। বাবার অসুখ হলে নিজের ফ্ল্যাটে এনে মেয়ের মতো সেবা করে। পরির জীবনের পট পরিবর্তন হতে থাকে ধীরে ধীরে। অরূপদার দ্বিচারিতার জন্য পরির জীবনে চয়নের প্রবেশ। আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বচ্ছল হলে পরি সার্জারির দিকে পা বাড়ায়। পরির জীবন বৃত্তান্তের লড়াই সেইসব রূপান্তরকামীদের লড়াই যারা অর্থনৈতিক কারণে পরিবারের সহযোগিতা পায় না এবং নিজের অন্তরাত্মাকে দমন করে রাখে। তাদের আশার আলো হিসেবে এক যুগান্তরকারী পরিণতির মধ্য দিয়ে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত পরি। কিন্তু পরির জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি আমাদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য প্রশ্ন রেখে যায়।

পরির পরবর্তী জীবনের পদক্ষেপে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাকে। অফিসের বস চয়নকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে পরির নতুন সার্জারি করা যৌবন দাবি করে। পুরুষ শরীর ত্যাগ করে নারীতে রূপান্তরের পথে প্রথম যাত্রা শুরুর দিনেই আসে বাধা। কিন্তু পরি থেমে থাকেনি। চয়নকে বিয়ে করে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়াতে চায় সে। কিন্তু নিজের অপরিণত নারীত্বকে বিসর্জন দিতে হয় বস গর্গ-এর কাছে। 'ব্লিড' করতে থাকে পরির সিলিকোন ভরা ব্রেস্ট সার্জারি। পরির জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারত, কিন্তু পরির হলুদ পাপড়ি ঝরে পড়ার দিকে এগোতে থাকে। ট্রান্স সেক্সুয়ালদের প্রতিনিধি রূপে দাঁড় করানোর পরেও রূপকথার গল্পটির মতো ঔপন্যাসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পরির জীবনের ইতি টেনেছেন। এদিক দিয়ে আমরা যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যূপকাষ্ঠ থেকে বেরোতে পারি না। সেই ইঙ্গিতই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

উপন্যাসে আর একটি রূপান্তরকামী চরিত্র দুলাল। অনিকেতের বাড়ির কাজের মাসি দুলালের মা। সেই সুবাদেই দুলালের রূপান্তরকামী মানসিকতা অনিকেত জানতে পারে। দুলাল একসময় তার বউ বাচ্চাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যখন ফিরে আসে তখন সে হিজড়ে দলের বহিষ্কৃত। দুলাল রূপান্তরিত হয় দুলালীতে। তার 'নথ ভাঙা' হয়েছে, সে এখন 'মা বহু চেড়া'র (হিজড়েদের দেবতা) উপাসক। কিন্তু দুলালের এইডস হওয়ায় তাকে দল থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে দুলাল মা ও ছেলের কাছে নারী রূপেই পরিচিতি চায়। ছেলেকে বলে মা বলে ডাকতে।

কিন্তু তার সাধ অপূর্ণই থাকে। অসুস্থতার কারণে অকালে প্রাণ হারাতে হয় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে। দুলালের জীবনের পরিণতি অনিকেতকে ভাবিয়ে তোলে। অনিকেত শুরু করে দুলালী আখ্যানের কাহিনি লিখতে।

তথাকথিত মেয়েলী ছেলে দুলাল। হিজড়েদের জীবনই তার কাছে কাম্য, তার ভালোলাগা। তাই স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পেরে সে চলে যায় হিজড়েদের দলে। সেই দলের বৃত্তান্ত, হিজড়ে সমাজের কথা সবই অনিকেত তার গবেষণার দ্বারা তুলে এনে লিপিবদ্ধ করে। উঠে আসে ক্রমোজমের কী ধরনের গঠনের ফলে মানুষের যৌনজীবনের পরিবর্তন হয় সেসব কথা। এসেছে হিজড়েদের গুরুমা নাগেশ্বরীর কথা, হিজড়ে খোলের অন্যান্য প্রতিনিধি চাত্তারা, ঝুমকো, হাসি, ফুলি, ঝুনিয়াদের কথাও। বাদ যায়নি তাদের শয্যাসঙ্গিনীদের কথাও। উঠে এসেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও যৌনজীবনের যন্ত্রণা, দ্বন্দ্বের কথাও। দুলালের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি অনিকেত তার অভিনব দৃষ্টিতে তুলে ধরেছে।

উপন্যাসের গতিপথে দুলালের ছেলে মন্টুর মধ্যে দুলালের জেনেটিক প্রভাব কীভাবে পড়েছে সে বিষয়টি অনিকেতকে ভাবিয়ে তুলেছিল। জিন বা পরিবেশ কোনো বিষয় কি মানুষকে সমকামী বা রূপান্তরকামী করে তোলে? যদি এমন হয় তবে কি মন্টু দুলালের ঔরসজাত? এইসব প্রশ্ন অনিকেতকে প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়। দুলালের মেয়েলী স্বভাব তাকে সন্তান উৎপাদনে বাধা দেয়, ফলস্বরূপ দুলালের স্ত্রী বিপথগামী হয়। দুলালের ধারণা ছিল মন্টু তার নিজের সন্তান নয়। কিন্তু তা বলে মন্টুর প্রতি তার কোনো অবহেলা ছিল না। অনিকেতের সব হিসেব এলোমেলো হয়ে যায় যখন মন্টুর মধ্যেও দুলালের আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ হয়। দুলাল মারা যাওয়ার পর অনিকেতের স্ত্রী শুক্লা মন্টুকে নিজের কাছে রেখে পড়াশুনো করানোর ব্যবস্থা করে। অনিকেতের বাড়িতেই প্রথম মন্টুর কুকীর্তি অর্থাৎ সমকামীভাব ধরা পড়ে। শুক্লা মন্টুকে আর নিজের কাছে রাখতে চায় না। ফলে অন্য পথ ভাবতে হয় অনিকেতকে। মামাতো ভাই বিকাশের ছেলে মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যায়। মন্টুকে বিকাশের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় অনিকেত আর শুক্লা। সেখানে বিকাশের যাবতীয় কাজের সঙ্গে পড়াশুনোও চালিয়ে যায় মন্টু। কিন্তু বিকাশের কুরুচিপূর্ণ যৌন আকাঙ্ক্ষা মন্টুর মেয়েলী সত্তাকে আঘাত দেয়। মন্টুর গনোরিয়া হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে অনিকেত জানতে পারে বিকাশ আর মন্টুর যৌন সম্পর্কের কথা। মন্টু চেয়েছিল বিকাশ কাকুর বউ হিসেবে নিজেকে দেখতে। কিন্তু বিকাশের একাধিক নারী সঙ্গ মন্টুর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঘটনাচক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয় মন্টু আর বিকাশ। এই

আখ্যান শুধু মাত্র অনিকেতের জানা। এক বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ বিকাশ, মন্টুর মানসিকতাকে বুঝতে না পেরে মন্টুর সত্তাকে, মন্টুর স্বপ্নকে অচিরেই বিনষ্ট করে দেয়। দুলাল আর মন্টু অধ্যায়কে নিয়ে অনিকেত গবেষণা করে, বেরিয়ে আসে মানব অস্তিত্বের বহু বিচিত্র কাহিনি। পরিচয় হয় রূপান্তরকামী মানুষগুলির দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে।

অনিকেত রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে কাজ করেছে, তাই তার মধ্যে সেই সমস্ত মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব, অনুভূতি এসব বিষয়ে কোন রকম ছুতমার্গে সে বিশ্বাসী নয়। অন্যদিকে স্ত্রী শুক্লা সংস্কারপন্থী এবং সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। তাই দুলালের মৃত্যুর পর সে মন্টুকে নিজের কাছে রাখে। কিন্তু ধীরে ধীরে মন্টুর আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয় তার। কারণ সমকামী মানুষগুলিকে তাদের মত করে দেখার দৃষ্টি শুক্লার সৃষ্টি হয়নি। ফলে মন্টুর ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব সে নিতে চায়নি। কিন্তু মন্টুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। অন্যদিকে অনিকেত কিছুদিনের জন্য মঞ্জুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে সে কথা শুক্লা জানতে পারে এবং হাতেনাতে ধরে ফেলার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মঞ্জুর অনুশোচনা হয় এবং সে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। পরির মাতৃহীন জীবনকে শুক্লা অনুভব করে। তাই সে পরিকে নিজের কাছে টেনে নেয় মাতৃস্নেহে, যাতে মৃত মঞ্জুর আত্মা শান্তি পায়। পরির নারী সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শুক্লার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। এমনকি পরি ও চয়নের বিয়ের বন্দোবস্তোও সে নিজের হাতে করে। সেই সঙ্গে পরির প্রতিটি সার্জারির সময় অনিকেতকে খোঁজ নিতে, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পাঠিয়েছে শুক্লাই। শুক্লার মানসিক পরিবর্তন সমাজে এক শ্রেণির মানুষের পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। আসলে ট্রান্সজেন্ডাররা নিজের ও সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে এক ধরনের অস্তিত্বের সংকটে ভোগে। সমাজের সমান ধারার মানুষগুলির তাদের মানসিকতাকে বোঝার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু অনিকেত বোঝে পরিদের মত মানুষগুলির মানসিকতাকে। তাই পরির অপারেশনের পূর্বে তাকে যে চিঠি অনিকেত পাঠিয়েছে তা থেকেও এক মনজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে—

> *"শরীর তোমার। তোমার শরীরে তোমারই অধিকার। কিন্তু ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু করো না— যা তোমাকে নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত করবে। মনটাই আসল। মন-ই হরমোনে নিয়ন্ত্রক। বাইরের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ভিতরের মন। বাইরের শরীরটা ইগনোর করতে পারলে, সমস্যা নেই।"*[৪১]

অনিকেত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। অনিকেতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভিন্ন স্বর অর্থাৎ ভিন্ন আত্মজিজ্ঞাসার পরিচয় উঠে আসে। অনিকেতের যৌন জীবনের পরিচয় উপন্যাসের মধ্যে

সমাজের একশ্রেণির মানুষের মানসিকতার পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলে। একদিকে অনিকেত এল.জি.বি.টি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির ভিন্ন স্বরকে তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে নিজে বাল্যবন্ধু শুক্লার সঙ্গে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। স্ত্রী শুক্লা সে সম্পর্কে অজ্ঞ। অনিকেতের বিপথগামীতার কারণ শুক্লার যৌন উত্তেজনার অনুভব বহনকারী অঙ্গের শরীর থেকে বাদ যাওয়া। শুক্লার জরায়ু এবং ডিম্বাশয় অপারেশন করে বাদ দেওয়ার পর তার যৌন উত্তেজনা অনুভূত হয় না। ফলে দীর্ঘদিন অনিকেত এবং শুক্লার মধ্যে যৌনসম্পর্ক সংঘটিত হয়নি। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে অনিকেতের মধ্যে কৈশোর কালের মঞ্জুকে সম্ভোগেচ্ছা জেগে ওঠে। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। মঞ্জুর শরীর স্বামীর কাছে কোনো পরিস্থিতিতেই জেগে উঠত না। সেই শরীরকে অনিকেতের ছোঁয়ায় সে পরীক্ষা করতে চায়। অনিকেতও দ্বিধা করে না। শুক্লার অজান্তেই চলতে থাকে দু'জনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক। উপন্যাসের মধ্যে অনিকেত এবং শুক্লার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি দিক স্পষ্ট হয়— স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক অনেকটাই যৌনতার তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু মঞ্জু-অনিকেতের যৌন সম্পর্ক যদিও শেষ পর্যন্ত আত্মগ্লানির মধ্যে পর্যবসিত হয়। কারণ সে সম্পর্ক শুক্লার সামনে ধরা পরে যায়। শুক্লা আঘাত সহ্য করতে না পেরে প্যারালাইজড হয়ে যায়। অনিকেতের অনুশোচনা শুরু হয়। মঞ্জু আত্মহননের পথ বেছে নেয়। প্রতিটি চরিত্র তাদের উত্তরণের পথে অগ্রসর হয়। অনিকেত তার ভুল বুঝতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত জীবনকে সমাজের সাধারণ মানুষের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অনিকেত আবার অগ্রসর হয় সমাজের ভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভিন্ন স্বর অনুসন্ধানের পথে।

মানুষের জীবনে শরীর নিয়ে 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস' এক বড়ো ধরনের বিপত্তি। উপন্যাস মধ্যে নারীর শরীর নিয়ে জন্মানো রূপান্তরকামী মনোভাবকে তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক আইভি এবং তৃপ্তি সামন্ত চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। আইভি অনিকেতের কলিগ। বহিরঙ্গে সে নারী কিন্তু মনে প্রাণে সে পুরুষ হতে চায়। আর পরির পরিচিত বান্ধবী তৃপ্তি সামন্ত, সে ন্যাশনাল পর্যায়ের এথলেটিকস। চাকরিও করে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে। কিন্তু বাড়ির পরিচারিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে তাকে জেলে যেতে হয়। তার আইডেন্টিক্যাল সংশয় শুরু হয়। এতদিনের বাহ্যিক পরিচয়ে বাধা আসে। তবে বহিরঙ্গে তার পরিচয় নারী হলেও মনে প্রাণে সে পুরুষ। কিন্তু সর্বসমক্ষে তার ব্যক্তিত্ব, তার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন তোলে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজনেরা। তৃপ্তি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল সার্জারি করে পুরুষ হয়ে নিজের আইডেন্টিক্যাল সফলতার জন্য। কিন্তু তৃপ্তির লিঙ্গগত জটিলতা তার এই স্বপ্ন পুরণের পথে বাধা দেয়। তৃপ্তি সামন্ত তাই

‘আইডেন্টিক্যাল সাসপেক্ট’-এ পরিণত হয়। সে নিজের কাছেই এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তার চাকরিটি থাকবে না যাবে? কারণ চাকরির জয়েনিং-এ সে একজন মহিলা। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় সে পুরুষ তাহলে চাকরিটি তার চলে যাবে। এরকম সংশয়াপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই রূপান্তরকামী মানুষদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তারা নিজের সমাজ এবং পরিবার সকলকেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। হয়ত একারণেই সমাজ-শরীর মানব-শরীরের মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে চায় না। তাই মানসিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হতে হয় আইভি, তৃপ্তি, মন্টু, পরি, দুলালীদের মতো রূপান্তরকামী লোকজনদের।

উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রবিন্দু রূপান্তরকামী মানুষগুলির সামাজিক ও মানসিক টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই উপন্যাসের প্রেরণার মূল রূঢ় বাস্তবের মানুষ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথার পাশাপাশি প্রধান কাহিনিগুলি পরি, দুলালী আখ্যানের মধ্যে পরিবৃত হয়। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইটা অন্য জায়গায়। তাঁর পরিবার বা প্রতিবেশ তাঁর উপর ততটা বাধা নিষেধ আরোপ করেনি। কিন্তু পরি বা দুলালীর মত মানুষদের একটু একটু করে মানিয়ে নিতে হয় পরিবেশের সঙ্গে। আর এই মানুষগুলির কাহিনিই হয়ে উঠেছে ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসের কথাবস্তু। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কর্মজগতে পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি নারী সত্তার রূপান্তরকামী। তাঁকে আইন-আদালত, কর্মজগতের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। নারীসত্তায় রূপান্তরের পর তিনি বিয়ে করেন কিন্তু স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হন। ১৬ জুলাই ২০০৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় তার একটি ইন্টারভিউ বের হয়; প্রবন্ধের নাম ‘স্বামী আমার প্রতারক’। এই তথ্যটি ঔপন্যাসিক উপন্যাস মধ্যে তুলে ধরেছেন। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ, লিঙ্গ পরিচয়ের জটিলতা ধীরে ধীরে চলে যাবে। কলকাতার বুকে তার দেখানো পথ বা তার লড়াই অন্য রূপান্তরকামী মানুষগুলির প্রেরণা। পরিও মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ব্রেস্ট সার্জারি করিয়ে সে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু তার জীবনও প্রতারিত হয় অফিসের বস-রূপী পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজের দ্বারা। অন্যদিকে দুলালী বা মন্টুকেও প্রাণ হারাতে হয় ভুল পথে পা বাড়িয়ে। জীবন তাদের মনের ইচ্ছের দাম দেয়নি। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজেকে নিয়ে এক গভীর জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসার নিরসনের পথে তথাকথিত ‘অন্য পরিচয়বাহী মানুষ’গুলো উত্তর খুঁজে পায়না। কিন্তু আত্ম-অনুসন্ধানের পথ থেকে তারা কেউই কিছুপা হয়নি। আসলে এই শ্রেণীর মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তার চিত্রটিই ঔপন্যাসিক গভীরভাবে মমত্ববোধের সঙ্গে তুলনা ধরেছেন।

নামকরণগত দিক দিয়ে উপন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ। গোলাপের রঙ শুধু গোলাপি রঙের হয় না। হলদে গোলাপও দেখা যায়। সে পাপড়ি মেলে, বিকশিত হয়, সবাইকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মানব সমাজে সাধারণ নারী পুরুষের আবরণের বাইরের মানুষদেরকে আমরা আমাদের মতো দেখি না, তাদের হলুদ পাপড়ির ডানা মেলাকে কটুক্তি করি, তাদের পাপড়িকে যতটা পারি ছেটে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কেন? যদি হলদে গোলাপকে বাগানে স্থান দিতে পারি তবে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী, ট্রান্সজেন্ডারদের অন্য চোখে দেখি কেন? কেনই বা সমাজ থেকে বহিষ্কার করার কথা ভাবি? কেনই বা আঙুল তুলি? ক্রমোজোম সজ্জার ভিন্নতার জন্য যে মানুষগুলি একটু অন্য ধরনের, তাদেরকেই হলদে গোলাপ নামে অভিহিত করা হয়েছে আখ্যানটিতে। তথাকথিত 'Wrong body' নিয়ে যারা জন্মেছে তাদের কথাই 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস।

ভারতীয় সাহিত্যে এ ধরনের বিষয় নিয়ে লেখার সাহসিকতা খুব কম সাহিত্যিকদের মধ্যেই দেখা যায়। 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপন্যাস সাহিত্যে এক মাইলস্টোন স্থাপন। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন-ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একুশ শতকের মাইলস্টোন হিসেবে পরিগণিত হওয়ার দাবি রাখে। উপন্যাসে পরির মতো 'হলদে গোলাপ' মানুষগুলো তাদের জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দিতে চায়। তাদের মন ও শরীরকে এক করে তারা সমাজে বাঁচতে চায়। কিন্তু সমাজ তাদেরকে কী মূল স্রোতের মানুষ মনে করে? এখানে প্রশ্ন থেকে যায়। ক্রমোজোমের সামান্য এদিক-ওদিক গঠনে যে মানুষগুলির জীবনে সংশয় দেখা যায় তারা তাদের আত্মপরিচয় নিয়ে সংকটে পড়ে যায়। কোন পথে এগোলে তারা তাদের পরিচয়কে সংশোধন করতে পারবে? তার উত্তর খোঁজে প্রত্যেকে। পরিও চেয়েছিল নিজের পরিচয়কে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে। প্রেমিক চয়নের জন্য সে পূর্ণরূপে নারী হতে চেয়েছিল। কিন্তু চয়নের জীবন-চর্যার পাতায় পরিকে যোগ্য মর্যাদা সে দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। একজন নারী তার সঙ্গীকে সাবলম্বী করার পথে আত্মত্যাগ করে, পরিও করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরি তার যোগ্য মর্যাদা পাকে কি? এক প্রশ্ন চিহ্ন রেখে দেন ঔপন্যাসিক। আসলে মূল ধারার নারী এবং পুরুষদের, এল.জি.বি.টি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির অস্তিত্বের সংকটকে অনুভব করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফলে সমাজের ভিন্ন স্বরের মানুষগুলির আত্মানুসন্ধান করে তাদের স্বরকে তুলে ধরে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসকে বিশেষ মাত্রা দান করেছেন। প্রতিটি চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসা উপন্যাসটিকে অনন্য করে তুলেছে। এবার আমরা পরবর্তী উপন্যাসের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসার পরবর্তী পর্বকে অনুসন্ধান করব।

৫

‘ভেজা বারুদ’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে। উপন্যাসটি মূলত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মানুষগুলির জীবন কীভাবে রাজনৈতিক নেতারা নিয়ন্ত্রণে রাখেন সে বিষয়টি ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন। হরিপদ চক্রবর্তী এবং তার পরিবারের সদস্যদের চিত্রকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। হরিপদ চক্রবর্তী সাধারণ ব্যক্তি। সমাজে তাকে পাত্তা দেওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। বরানগরে জমিদার পরিবারের এক কামরায় তিনি ভাড়া থাকতেন। কিন্তু একসময় রামপিয়ারি নামের এক তোলাবাজ গুণ্ডা তাদেরকে সেখান থেকে তুলে দিয়ে নফরগঞ্জের দিকে একটা ফ্ল্যাট দেয় ২ লাখ টাকার বিনিময়ে। ব্যাঁকা সাহা ওরফে বঙ্কিমচন্দ্র সাহার ফ্ল্যাট ‘ইন্দ্রবাটি’ যা বর্তমানে ‘ইঁদুরবাটি’ নামে পরিচিত, সেখানেই হরিপদর আস্তানা। সেই দুই কামরার ফ্ল্যাটে হরিপদর ভালোই চলছিল। নতুন ফ্ল্যাটে নতুন জায়গায় হরিপদর মানিয়ে নিতে অসুবিধে হয় না। পাড়ার গুরুপদ কর্মকারের সঙ্গে ইংরেজি চিঠি পড়ে দেওয়ার সূত্রে পরিচয়। গুরুপদ ও ব্যাঁকা সাহা দুজনে এলাকার লিডার। একই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার খেসারত দিতে হয় হরিপদকে। হরিপদর পিতৃতর্পণ সূত্রে গুরুপদর চামচা কিট্টুর সঙ্গে বচসা বাঁধে এবং সেখান থেকে গুরুপদই উদ্ধার করে এবং বাড়িতে এসে হরিপদর ছেলে চন্দনের জন্য নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরির প্রস্তাব দেন। গুরুপদর সমস্ত অফিসিয়াল কাজ করে চন্দন। সমস্ত কম্পিউটারের কাজগুলো, বিজনেস ডিলের কাগজপত্র, ছেলেকে মেইলে চিঠি লেখা সবই করে। ধীরে ধীরে গুরুপদর সমস্তরকম কাজের সাক্ষীও হয়ে যায় সে। চন্দন বুঝতেই পারে না বাড়িতে সুন্দরী দিদির প্রতি গুরুপদর কুনজর রয়েছে। গুরুপদ চক্রান্ত করে নিজের স্ত্রীকে অ্যাসিড খাইয়ে মেরে ফেলেন। কিন্তু টাকা দিয়ে তিনি সাধারণ মৃত্যুর ডেথ সার্টিফিকেট বের করেন। এরপর মনের শান্তির জন্য হরিদ্বারের পথে রওনা হন। এর মধ্যে গুরুপদর বারডান্সার পাপিয়াকে দিয়ে চক্রান্ত করে দীঘায় ব্যাঁকা সাহাকে মার্ডার করান। এসব ঘটনা একের পর এক সূত্র ধরে চন্দনের সামনে উপস্থিত হলেও প্রমাণ নেই চন্দনের কাছে। চন্দন বোঝে গুরুপদর কেনা গোলামে পরিণত হয়েছে সে। বাবা হরিপদ সরল সাধাসিধে মানুষ। গুরুপদর পোষাগুণ্ডারা হরিপদর কাছ থেকে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই কাগজে ব্যাঁকা সাহার নামে গুরুপদর লোকেরা মিথ্যে লিখে থানায় জমা দেয়। সেই সূত্রে হরিপদও ব্যাঁকা সাহার শত্রুতে পরিণত হন। ব্যাঁকা সাহার মার্ডারের পর হরিপদর বাড়িতে চড়াও হয় ব্যাঁকা সাহার গুণ্ডারা। চন্দন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে গুরুপদর দলে কাজ করার জন্য তার পরিবারের ওপর আজ এই বিপত্তি। কিন্তু সে কাপুরুষের পরিচয় দেয়। ঘরের

বাইরে না বেরোনোর জন্য গুণ্ডারা সুলতাকে রেপ করে। রেখাকে হাত বেঁধে বাথরুমে ঢুকিয়ে রাখে। এই বিপর্যয়ের কাহিনী পরিবারের তিনজনই লুকিয়ে যায় হরিপদর কাছে। চন্দন চেষ্টা করেছিল তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা পাড়া-পড়শি যাতে না জানতে পারে। কিন্তু এই ঘটনা চাপা থাকে না। পার্টির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের শিকার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিটি মানুষ। এখানেই থেমে থাকা নয়। চন্দন এবং হরিপদও কোথায় যেন সে বশ্যতা মেনে নেয়। তাই গুরুপদর বারে রিসেপশনের এটেনডেন্ট হিসেবে সুলতাকে বসাতে চাইলে চন্দন রাজি হয়ে যায়। কিন্তু বিপর্যস্ত মা ও মেয়ে দুজনেই ভেজাবারুদের মতো চিৎকার প্রতিবাদ করে। এভাবেই উপন্যাসে সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

'ভেজা বারুদ' উপন্যাসের মূল চরিত্র যদি ধরতে হয় তাহলে হরিপদ চক্রবর্তী ও তার ছেলে চানু ওরফে চন্দনকেই ধরতে হবে। কারণ একটি পরিবার যারা নিতান্তই মধ্যবিত্ত পরিবারের ধ্বজাধারী তাদের জীবন বৃত্ত একটি সময়ের আবর্তে কীভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে সেই কাহিনিই উপন্যাসটির অঙ্গ। উপন্যাসটিতে এক সাধারণ মানুষের জীবনে হঠাৎ রাজনৈতিক বাতাবরণের ছায়া কীভাবে তার জীবনবোধকে পাল্টে দেয় তার চিত্র আঁকা হয়েছে। উপন্যাসটিতে পরিবর্তনের রাজনৈতিক ছবি ধরা পড়েছে। একুশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে সর্বত্র পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখা দিতে শুরু করে। প্রথম থেকেই সে পরিবর্তন নতুন রূপে পশ্চিমবাংলার মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। পরিবর্তনের ধরনে সাধারণ মানব জীবন বহুভাবে দোলাচলতার মধ্যে পর্যবসিত হয়। সেই দোলাচলতা কাটিয়ে উঠতে জনগণ অনেক সময় বিপথে চালিত হয়। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের কাছে 'পাইয়ে দেওয়ার বাতাবরণ' অনেকটাই স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করার প্রবণতা চলে আসে। উপন্যাসের মধ্যে আমরা যুবসম্প্রদায়ের বিবর্তনের রূপটিকেও দেখতে পাই। আর যে বিষয়টি সবার আগে নজরে আসে তা হল মিডিয়ার ব্যবহার। বিশ্বায়নের ফলে সামাজিক মাধ্যম এবং গণ মাধ্যমের ব্যবহার মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে টেলিভিশনের বহু চ্যানেলের উদ্ভব এবং মানুষকে চমকপ্রদ খবর ও সিরিয়ালের মধ্যে বা রিয়ালিটি শো-এর মাধ্যমে বেঁধে রাখার এক কৌশল শুরু হয়। সেই কৌশলে অবলীলায় বাঁধা পড়ি আমরা। ফলে সাধারণ জনগণের বোধ এবং বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে চলমান সময়ে।

বছর সাতান্নর হরিপদ চক্রবর্তী খুব সাধারণ এক ব্যক্তি। মাড়োয়ারীদের গদিতে চাকরি করেন। নফারগঞ্জের ইঁদুরবাটি ওরফে ইন্দ্রবাটী ফ্ল্যাটটি কেনা হয়েছে বউয়ের গয়না বিক্রি করে আর নিজের জমানো টাকা দিয়ে। মেয়ের বয়স সাতাশ হলেও তাকে বিয়ে দেওয়ার কোন তোড়জোড়

নেই হরিপদবাবুর। মেয়েকে বি.এ. পাশ করিয়েছেন। ছেলেও বি.কম পাশ। ছেলের চাকরির জন্য সপ্তাহে একটা করে ইংরেজি খবরের কাগজ কেনেন। ইংরেজি চর্চাটা থাকা ভালো বলে। বাজারে গিয়ে দেখে শুনে অনেক সময় ধরে বাজার করেন। কিন্তু একটু সাদামাটা ব্যক্তি বলে অনেক সময় তিনি ঠকে যান। অনেক সময় আবার তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্যেরা বাজার সেরে ফেলেন। বর্তমান যুগ সম্পর্কে তার ধারণা খুবই কম। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্অ্যাপ এই নামগুলো শোনা, কিন্তু এতে কী হয় কীভাবে হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। ফোন অবশ্য তিনি ব্যবহার করেন। তাতে রিচার্জ খুবই কম করেন। শুধু ফোন আসার জন্য ফোনটি খোলা রাখেন। অবশ্য মালিকই তাকে ফোনটি দিয়েছেন। সিনেমা জগতের বর্তমান নায়ক-নায়িকাদের নাম জানেন কিন্তু শুধু দেব ছাড়া কাউকে চিনতে পারেন না। কারণ দেব ঘাটালের প্রার্থী। জীৎ গাঙ্গুলীর রচিত এবং প্রযোজিত গানগুলি শুনেছেন কিন্তু মানে বুঝতে পারেননি। আর ইন্টারনেটের ব্যবহার করার জন্য সাইবার ক্যাফে দেখেছেন কিন্তু 'ক্যাফে'র শব্দের সঙ্গে মিল খুঁজে পাননি। ঔপন্যাসিক হরিপদ চক্রবর্তীকে এইভাবে খুব সামান্য বিশেষণে পাঠকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। যিনি বিশ্বায়নের দাপটকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু তার কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন।

হরিপদ চক্রবর্তীর ছেলে চন্দন। উপন্যাসে চানু বলেই পরিচিত। পুত্রের প্রতি অগাধ স্নেহ হরিপদর। চানু গ্রাজুয়েট হয়েও নিরাশ। চাকরির বাজারে নিতান্তই মন্দা চলছে। বহু জায়গায় চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েছে। কিন্তু চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক আসেনি। বর্তমান প্রজন্মে কম্পিউটার শেখার প্রয়োজন আছে বলে হরিপদ ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিতে না পারলেও শিখিয়েছেন। কিন্তু চানুর নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা রয়েছে। সে চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলেও মনোযোগী হতে পারে না। তবে পিতা হিসেবে হরিপদ তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে চান। হরিপদর বড় সন্তান সুলতা। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও কোনো তোড়জোড় নেই হরিপদবাবুর। হাতের জমানো টাকা তো ফ্ল্যাট কেনার সময় খরচা করে ফেলেছেন, ফলে আইবুড়ো মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তবে মেয়েটি তার নিতান্তই ভদ্র। মাথা নিচু করে কলেজ শেষ করেছে। ছেলেদের টিটকিরিকে পাত্তা দেয়নি। লুকিয়ে প্রেম করেনি। রূপ সজ্জার জন্য বাজে খরচা করেনি। তবে রূপ যথেষ্ট থাকায় তাকে কুনজরে পড়তে হয়েছে বহুবার। মাকে সে সব কথা বলেছে। হরিপদবাবু কিন্তু মেয়েকে নিয়ে একটু অন্যরকমই ভাবেন। তিনি ভাবেন মেয়েটি তাঁর ভালো ছেলে দেখে প্রেম করলে তিনি মেনে নিতেন। জাত-পাত বিষয়ে ছুতমার্গের দিকে হাঁটতেন না। কিন্তু মেয়েটি তাঁর ভদ্র। বাবার দিকে মুখ চেয়ে অপেক্ষা করেছে। অনেকটা দায়ভার মুক্ত হতে

পারতেন, যদি কেউ যেচে তার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইত। সুলতাও প্রেম করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। কারণ তার কাছে মোবাইল ছিল না। অনন্য নামের একটি ছেলে তাকে 'ফলো' করত। কিন্তু তার দিকে মাথা তুলে দেখার সাহস হয়নি সুলতার। মধুমিতা সুলতার বন্ধু। মধুমিতার অনেক 'বয়ফ্রেন্ড'। কিন্তু প্রকৃত 'লাভার' কেউ নয়। আসলে বর্তমান জেনারেশন-এর 'টাইম পাশ' গোছের মানসিকতা মধুমিতার মধ্যে লক্ষ করা যায়। কিন্তু সুলতা পারেনি তাদের মত হতে। সুলতা অনুভব করে তার না পারার পিছনের কারণকে—

> *"প্রেম করতে গেলে একটা মোবাইল লাগে। ও দেখেছে যারা প্রেম করে তারা সব সময় পিটপিট করে মোবাইল টেপে। ওর তো মোবাইল নেই। আর কী লাগে? সাহস। ওটাও তো ওর নেই। ওর ভয় করে। ওর বাবার মতন। ওর ভূতের ভয় করে, ওর যৌবনকেও ভয় করে। ওদের বরানগরের বাড়ির কলঘরে আয়না ছিল না, এ বাড়ির বাথরুমে আয়না আছে। আয়নায় নিজেকে দেখে ভয় করে।'*[৪২]

সুলতা যে সুন্দরী সেটা সে জানে। বরানগরের পাড়ার ছেলেরা তাকে সুন্দরী বলে গানও গাইত। কিন্তু সেদিকে ঘুরে তাকাবার প্রয়োজন মনে করেনি সুলতা। সুলতা ধরেই নিয়েছে তার বিয়ে হবে না। তার বিয়ের জন্য জমানো টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে। ফলে বিয়ের সম্ভাবনা নেই। সে ভাবে বিয়ে হলে বাবার বোঝা কিছুটা কমত। বাড়িতে বসে অন্ন ধ্বংস করতে আর ভালো না লাগলেও উপায় নেই। কারণ সে পড়াশোনায় ভালো নয়। তার জন্য যে সমস্যা তা যুগের সমস্যাকেই তুলে ধরে—

> *"সবাই ইংলিশ মিডিয়ামের ম্যাম চায়, ম্যাম। সবাই এখন কম্পিউটার শেখে। কম্পিউটার? ও ব্বাবা! অনেক টাকা। তা ছাড়া কঠিন। এসব ভাবলেই ভয় করে।'*[৪৩]

যুগের সঙ্গে সুলতা তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। কিছুটা ঘরমুখো থেকে আর টিভি কেন্দ্রিক জীবনকে বেঁধে ফেলার জন্য তার জানার পরিসরেরও ব্যাপকতা কমে যায়। তার সৌন্দর্যও অনেকটা তার ঘরমুখো হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরকম মেয়ের জন্য বাবা হিসেবে হরিপদ পাত্র-পাত্রী চাই গোছের বিজ্ঞাপনের দিকেও যথেষ্ট মনোযোগী নয় বলে সুলতার আক্ষেপ। আর যখন হরিপদবাবু মেয়েকে পুঁটি মাছ কাটা শেখাতে চান শ্বশুরবাড়িতে কাজে লাগবে বলে, তখন বিষয়টা সুলতার কাছে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতোই মনে হয়। সন্তানদের কথার পরে হরিপদবাবুর স্ত্রী

রেখার কথায় আসা যাক। অতি সাধারণ পরিবারের স্ত্রী রেখাও অতি সাধারণ। সংসারে আর পাঁচজন রমণীর মতো তার কোনো চাহিদা নেই। স্বামীর প্রতি সে অনুগত। কারণ সংসারের হাল সে বুঝেছিল বলেই লাউ-কুমড়ো-কাঁচকলার খোসাকে রান্নার পদে উত্তরণ ঘটিয়েছে। শিল্কের শাড়ির বায়না করেনি বরং জোড়া দেওয়া শাড়িকেই সাদরে গ্রহণ করেছে। হরিপদ তার স্ত্রীর গুরুত্ব বুঝেছেন। কীভাবে রেখা তার দোসর হয়ে উঠেছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে —

> *"জোড়া শাড়িগুলোই ওর 'তোলা' শাড়ি। আর বাবার পাওয়া মোটা শাড়িই পরেছে। ছোটবেলা থেকেই ছেলে মেয়েদের বুঝিয়েছে লজেন্স-চকলেট খেলে কিরমি হয়, আর বিস্কুটে খোস-প্যাঁচড়া।"*[৪৪]

স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে হরিপদর অতি সাধারণ জীবন। স্ত্রী বা মেয়ের কোনো অতিরিক্ত চাহিদা নেই। ছেলে চানু চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। জীবন স্রোতে একটা স্বাভাবিক চলমানতা নিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন হরিপদবাবু। তার এই সাধারণ জীবনটা হঠাৎ অন্য খাতে বইতে শুরু করবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার ছিল না। আসলে সাধারণ জনগণের জীবনে যেখানে বৈচিত্র্যের কোনো সম্ভাবনা থাকে না সেখানে হঠাৎ পরিবর্তনটা মেনে নেওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাসের ভূমিকাংশেই স্বীকার করেছেন এটি রাজনৈতিক উপন্যাস—

> *"এই উপন্যাসটি সমসময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা, মূল চরিত্র সাধারণ জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।"*[৪৫]

হরিপদবাবুর নফরগঞ্জের ফ্ল্যাট জীবন এবং সেখানকার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিই আসলে তাঁকে অন্য ভাবনায় ভাবিত করে। হরিপদবাবু প্রতি বৃহস্পতিবার ছেলের জন্য ইংরেজি কাগজ নিতেন। সেরকমই এক বৃহস্পতিবার হরিপদবাবুর কাছে ইংরেজি খবরের কাগজ দেখে এলাকার সমাজবন্ধু পার্টির কর্মকর্তা গুরুপদ কর্মকার একটি চিঠি নিয়ে উপস্থিত হন। গুরুপদ কর্মকারের ছেলে দার্জিলিংয়ের কনভেন্টে পড়ে। সে ইংরেজিতে চিঠি লিখে পাঠায়। কিন্তু গুরুপদ কর্মকার ইংরেজি ভালো জানেন না, তাই চিঠির অর্থ উদ্ধার অনেক সময় তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। হরিপদকে দিয়ে অর্থ উদ্ধার করে সে যাত্রায় তিনি স্বস্তি পান। হরিপদর সঙ্গে তিনি আলাপও করেন। ব্যাঁকা সাহা ওরফে বঙ্কিম সাহার ফ্ল্যাট ইঁদুরবাটিতে থাকার বিষয়ে তথ্য দেওয়া থেকে শুরু করে ফ্ল্যাটের দুনম্বরি কাজের বিষয়েও গুরুপদ কর্মকার হরিপদকে নেতিবাচক কথাই বলেন। গুরুপদ কর্মকারের রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। গুরু নামেই তিনি এলাকায় পরিচিত। গুরুপদ কর্মকারের ঠাকুরদা ১৯৭১সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বরিশাল থেকে পশ্চিমবাংলায় আসেন।

গুরুপদর ঠাকুরদা এবং বাবা দু'জনেই কামারের কাজ করেছেন। গুরুপদর 'রিয়াল এস্টেটে'-এর কারবার। অর্থবান ব্যক্তি হয়েছেন। বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তানকে স্বাচ্ছন্দ দানে সমর্থ। বউ-এর সখে ছেলেকে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়িয়ে নিজের 'স্টেটাস' বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। গুরুপদর নিজের পড়াশুনোর দৌড় বেশিদূর পর্যন্ত নয়। ফলে হরিপদর সাহায্যে তিনি ছেলের মেইল পড়ে বাংলা অর্থ উদ্ধার করাতে চান। হরিপদর নিজেকে দামী মনে হতে থাকে। ফ্ল্যাট কালচারে এসে এই প্রথম তিনি যথার্থ মর্যাদা পেলেন বলে মনে করেন।

বরানগর থেকে রামপিয়ারি গুণ্ডার দৌলতে ব্যাঁকা সাহার ফ্ল্যাটে আসা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হরিপদ নিজের দিন-চর্যাকে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ফ্ল্যাটে আসার পর হরিপদ তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে শ্রাদ্ধ করতে চান। কিন্তু পুরোহিতের সন্ধান তার জানা নেই। গুরুপদবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনিই সন্ধান দেন সিন্ডিকেট জগতের। গুরুপদর ভাই সিন্ডিকেট চালায়। সিন্ডিকেট রাজের বিষয়ে গুরুপদর বক্তব্য বর্তমান সময়ের পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে—

> *"এলাকায় একটা ডিসিপ্লিন রাখার জন্য একটা সিন্ডিকেট করছি। নতুন নতুন লোক আসতাছে, সবারই ঝি দরকার কামের লোক দরকার, অনেক বাড়িতে বুড়ি-বুড়া আছে, মিঞা বিবি নোট কামাইতে বাইর হইয়া যায়, ঘরে আয়া দরকার হয়, সেই কারণে সিন্ডিকেট করলাম।"*[৪৬]

হরিপদবাবু সামনে নতুন জগত ধরা পড়ল। এতদিন তিনি জানতেন সিন্ডিকেট বড় জায়গায় হয়। কিন্তু মধ্যমগ্রামের 'ব্যাক সাইড'-এর এলাকা নফরগঞ্জেও সিন্ডিকেটের ব্যবস্থা হরিপদকে ভাবিয়ে তোলে। সমাজবন্ধু অফিসে গিয়ে পুরোহিতের খোঁজ করার পর হাফশার্ট আর পাজামা পরা জয়রাম ভট্টাচার্য এলেন। তিনি মূল পেশায় কবিরাজ। তবে সংস্কৃত মন্ত্র ভালো বলতে পারেন দেখে জয়রাম পুরোহিতকেই শ্রাদ্ধের জন্য ঠিক করলেন হরিপদ। শ্রাদ্ধের জন্য ফর্দ এবং শ্রাদ্ধ অনুদানের কাজ বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু সিন্ডিকেট অফিসে পুরোহিতকে টাকা দিতে হবে বলে কোনো রকম দরকষাকষির উপায় নেই। ফলে বরাদ্দ টাকাই দিতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য পুরোহিতের বিধান প্রসঙ্গে নতুন জগতের সন্ধান পান হরিপদবাবু। সেখানে পুরোহিত নিজের প্রয়োজনে নিয়ম-কানুনকে ছেটে বাদ দিয়ে ছোট করে নেন। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলে একটা ষাঁড়কে চারবার খাওয়াতে হবে। ভাত-ডাল না হলে ফল-মূলও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হরিপদর পক্ষে ষাঁড় যোগাড় করা অসম্ভব বিবেচনা করে পুরোহিতের কাছে এর বিধান জানতে চাইলে তিনি বলেন কাককে খাওয়ালেও

হবে। এ প্রসঙ্গে হরিপদর ভাবনা যুক্তিযুক্ত—

> *"ব্রাহ্মণের চেয়ে কাক ভালো। বামুন খাওয়ালে আবার দক্ষিণা দিতে হয়— ভোজন দক্ষিণা। কাককে দক্ষিণা দিতে হয় না।"*[৪৭]

হরিপদবাবু নিজে ব্রাহ্মণ বংশের হয়েও বংশগত পুরোহিতগিরির পেশাকে গ্রহণ করেননি। হরিপদর বাবা চাইতেন না ছেলে পুরোহিতের কাজ করুক। বড় চাকরি না পাক সামান্য কেরানিগিরি তো করতে পারবে ছেলে। এই আশায় ছেলের পড়াশুনোর দিকে মনোযোগী হওয়ার আগ্রহী ছিলেন গুরুপদ চক্রবর্তী। তবে কাজ চালানোর মতো সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করে পুজো পদ্ধতি শেখাতে চেয়েছিলেন হরিপদর বাবা হরিপদকে। কিন্তু হরিপদর দ্বারা তা সম্ভব হয়ে উঠল না। তিনি সংস্কৃত মন্ত্রকে কিছুতেই মনে রাখতে পারতেন না। এমনকি, পড়াশুনোতেও তিনি যথেষ্টই খারাপ ছিলেন। ফলে পুরোহিতগিরি তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। তবে কেরানির চাকরিটি তিনি যোগাড় করেছিলেন, যার উপর ভর করে তাঁর সংসারটি চলছে। হরিপদবাবু নিজে বামুন হয়েও বামুনদের নির্ধারিত রীতিকে মেনে নিতে পারেন না বলে তার মধ্যে প্রশ্ন জাগে—

> *"বামুনকে খাওয়ালেই কেন আত্মার তৃপ্তি হয় কে জানে। বামুনের বদলে কায়েত বদ্যি কিংবা মুচি মেথরকে খাওয়ালে হয় না? বামুনরাই এইসব নিয়ম বানিয়েছিল।"*[৪৮]

হরিপদবাবুর পিতৃ শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট চিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজচিত্র ফুটে ওঠে। পিতৃশ্রাদ্ধে পুরোহিতের ফর্দ অনুযায়ী বটের ডাল প্রয়োজন। হরিপদ বটের ডাল যোগাড় করতে বেরিয়েছেন। প্রথমে যে বটের ডাল ভাঙতে যান তার নিচে পাথর রেখে বেদি নির্মাণ করে পুজো হয়। হরিপদবাবু সেই গাছের ডাল ভাঙতে গেলে কয়েকটি লোক জড় হয়ে তাকে রীতিমত গালিগালাজ শুরু করে হরিপদকে ডাল ভাঙা থেকে বিরত করেন। এরপর অন্য বটগাছের সন্ধানে গিয়েই রাস্তায় একটা বটগাছ পেলেন। কিন্তু তার তলায় ইটের পাঁজা থাকায় তিনি ধাপ বানিয়ে পাঁজায় উঠে ডাল পাড়তে গেলে ক'টা ইঁট ভেঙে যায়। ইঁট ভেঙে যেতে দেখে রাস্তা থেকে কয়েকটি মস্তান ছেলে এসে হরিদপবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি রাস্তার উপর ইট, বালি, পাথর রাখার কথা বলে বসেন। এতেই হরিপদবাবুর ওপর তারা চড়াও হয়। গাছের ডাল ভাঙার অপরাধে তাদের হুমকি 'ইকোক্রিটিসিজম'কেই তুলে ধরে—

> *"আরে, এই ল্যাদকা আইন দেখাচ্ছে, শালা শুড্ডা বলে মারলাম না, নইলে এক্ষুনি কানের গোড়ায় একটা দিতাম। আইন দেখাচ্ছিস? চল থানায়। গাছের*

ডাল ভেঙেছিস কেন— শালা পরিবেশ আইনে ঢুকিয়ে দেব শালা।''[৪৯]

হরিপদবাবু পিতৃশ্রাদ্ধের কথা বললেও তারা শুনতে চায় না। রাস্তার জমায়েত হওয়া লোকজনগুলোও হরিপদকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। আসলে ছেলেগুলি পাড়ার মস্তান। তাদের মাথায় পার্টির নেতাদের হাত রয়েছে। এই বিপদের সময় গুরুপদবাবুর উপস্থিতিতে তারা হরিপদকে রেহাই দেয়। হরিপদর বুঝতে বাকি থাকে না যে পাড়ায় গুরুপদ কর্মকারের অবস্থান কোথায়। এরপর গুরুপদ কর্মকার হরিবপদবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হন ছেলের চিঠির অর্থ উদ্ধারের জন্য। হরিপদবাবু চিঠির অর্থ উদ্ধার করে দেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে গুরুপদ কর্মকারের ছেলে হস্টেলের পরিবেশ নষ্ট করছে অন্য ছেলেদের কামিনী-কাঞ্চনের ছবি দেখিয়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে আর রাখতে চায় না। মোবাইলের অপব্যবহারের একটি চিত্র উঠে আসে ঘটনাটি থেকে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল গুরুপদবাবুর মানসিকতা, কারণ তিনি ছেলের দোষ দেখতে পান না। তার বক্তব্যটিতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

> *"একটা উঠতি বয়সের ছেলে একটু দোষ কইরা ফাইলাইছে, এই জন্য বলবে ইস্কুল থিকা তাড়িয়ে দেব? একদিকে যে খবরের কাগজের পাতা জুইড়া অমুক তেল, তমুক তেল, হট বিউটি, নাইট কুইন ...। দেখি। যাই, কী কয় দেখি। থাউক। এটা কিন্তু প্রাইভেট। আপনার আমার ব্যাপার।''*[৫০]

গুরুপদবাবু গণমাধমের বিষয়টি দিয়ে তার ছেলের কু-কর্মকে ঢাকতে চাইলেন। আসলে তিনি যে অপমানিত হলেন সেটা প্রকাশ্যে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু পিতারা এভাবেই বোধহয় সন্তানদের অপরাধ জগতের দিকে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ান। তবে হরিপদবাবুর ছেলে চন্দনকে তিনি নিজের পার্সোনাল এসিসট্যান্টের চাকরিতে বহাল রাখলেন। গুরুপদ কর্মকার ইংলিশে দুর্বল এবং কম্পিউটারের কাজেও সরগর নন। ফলে এই দুটি কাজ চানুকে দিয়ে করানোর জন্য তিনি তাকে চাকরিটি দিতে চেয়েছেন। বেকার ছেলের হাতখরচের বন্দোবস্ত হল এভাবেই।

মধ্যবিত্ত সাধারণ জনগণ নানারকম ভাবেই অনেক সময় অপদস্ত হন এলাকার মস্তানদের দ্বারা। গুরুপদ কর্মকারের পোষা মস্তান কিট্টু ও তার সাঙ্গরা যেভাবে হরিপদকে বাবার শ্রাদ্ধের দিন অপদস্ত করেছিল তার এক প্রমাণ বলা যায়। হরিপদর সঙ্গে এরপর প্রায় দেখা হলেও হরিপদ এড়িয়ে গিয়েছেন তাদের। তিনি ঝামেলায় জড়াতে চাননি। একদিন বাজার থেকে মোচা কিনে বাড়ি ফেরার পথে মোচা তেতো কিনা দেখতে গিয়ে জিভে কেটে দেখলেন তেতো। মুখ তেতো হওয়ায় তিনি থুথু ফেললেন। আর দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে কিট্টু ছিল। হরিপদবাবুর দিকে তেড়ে এসে তারা পুনরায়

অপদস্ত করতে শুরু করে। এবার নিরুপায় হয়ে হরিপদবাবু প্রার্থনা করতে থাকেন পূর্বদিনের উদ্ধার কার্য যেন আবার সাধিত হয় গুরুপদর উপস্থিতিতে —

> *"হরিপদ এবার আকাশের দিকে তাকায়। বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদী যেভাবে তাকিয়েছিল। বুকের ভিতর থেকে বাঁচাও বাঁচাও আর্তস্বর বেরিয়ে আসে, কিন্তু নিঃশব্দ। হে গুরু, পরমগুরু, মহাগুরু, হে গুরুপদ ... বাঁচাও, আগের দিনের মতো আমায় বাঁচাও ...।"*[৫১]

কাকতালীয়ভাবে গুরুপদকর্মকার উপস্থিত হলেন স্কুটারের পিছনে চানুকে নিয়ে। চানুকে সেখানে চুপ থাকতে বলে গুরুপদ বিষয়টি মিটমাট করেছেন। আসলে গুরুপদ কর্মকার যে কিট্টুদের নেতা সেটা হরিপদ স্পষ্ট বুঝতে পারেন। সঙ্গে এও বুঝতে পারেন এলাকার বড় নেতা বিমল নন্দীর সঙ্গে গুরুপদ কর্মকারের ভাব রয়েছে। প্রমোটারির সঙ্গে সঙ্গে নেতাগিরিতে গুরুপদর হাত বেশ লম্বা। কিন্তু উটকো ঝামেলা যেন সূচাগ্রভাগ দিয়ে হরিপদবাবুর জীবনে প্রবেশ করে বর্তমানে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। ব্যাঁকা সাহাও এলাকার প্রেমোটার এবং নেতা। ব্যাঁকা সাহার ফ্ল্যাটেই হরিপদবাবু থাকেন। কিট্টুদের দ্বারা হরিপদবাবুর অপদস্ত হওয়ার ঘটনা ব্যাঁকা সাহা জানতে পেরে হরিপদবাবুর কাছে উপস্থিত হন। তিনি কিট্টু ও তার সাঙ্গদের নামে ডায়ারি করার কথা বলেন। কিন্তু হরিপদবাবু রাজি হলেন না। ব্যাঁকা সাহা ছাড়বার পাত্র নয়। হরিপদবাবু বুঝে যান গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি। গুরুপদ এবং ব্যাঁকা দু'জনেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যাঁকা সাহা সাদা কাগজে হরিপদবাবুর সই নিয়ে যান। আসলে অনন্যোপায় হয়েই হরিপদবাবু সই দিয়ে দেন। কারণ হরিপদ আর রেখার সামনে তারা সমাজের এক চিত্র তুলে ধরে যা যত্রতত্র ঘটে চলেছে—

> *"চুপ মেরে থাকলে ঝামেলা থেকে পার পাবেন? আপনিই দেখছি নফরগঞ্জকে বিখ্যাত করে দেবেন। ওরা বাড়িতে রেপও করিয়ে দিতে পারে। তখনও চুপ করে থাকবেন?"*[৫২]

পার্টির পোষা নীতিহীন নেতারা অনেকদূর পর্যন্ত যেতে পারে তারই আগাম সতর্কতা ব্যাঁকা সাহার বক্তব্যে স্পষ্ট। আসলে সম্পূর্ণ দৃশ্যে পরিবর্তিত রাজনীতির চিত্রটিই ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিক একজন সাধারণ মানুষের জীবনে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। আসলে হরিপদ জীবনে সবসময় ঝামেলা মুক্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ঝামেলা কখনো আগাম জানিয়ে আসে না। আর ঝামেলা এলে তাকে এড়ানো যায় না।

হরিপদবাবুর পরিবারে যে বিপত্তি উপস্থিত হল তার অন্য কারণ চানুর গুরুপদবাবুর অফিসে

কাজ করা। উপরন্তু বসের প্রতি আনুগত্য। চাকরিহীন বাজারে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হাতখরচার টাকাটি যেখান থেকে আসছে সে পথকে বন্ধ করতে চায় না। চানু পরিবারে আসা বিপত্তির কথা জেনেও নির্বিকার ভাবে গুরুপদবাবুর কাজ করে যায়। আর সামনে আসা এস.এস.সি-র জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। সঙ্গে অন্যান্য চাকরির জন্য দরখাস্তও দিতে শুরু করে। বসের প্রতি চানুর প্রশ্নহীন আনুগত্য রয়েছে। বসের সমস্ত পার্সোনাল চিঠি, বসের স্ত্রীর হয়ে ছেলে জয়কে মেইল পাঠানো, ধরণের সমস্ত কাজই চানুকে করতে হয়। বস 'ফ্লিপকার্ট' থেকে ল্যাপটপ অর্ডার করেছেন চানুর জন্য। ফলে একটু একটু করে বসের বুদ্ধির কদর করতে শেখে চানু। চানু লক্ষ করে, গুরুপদবাবুর পেটে বিদ্যে না থাকলেও অর্থ উপার্জনের বুদ্ধি আছে। চানুও সে বুদ্ধি আয়ত্ত করতে চায়। বসের চামচে হয়ে উঠে চানু। মুম্বাচুম্বা রেস্টুরেন্টের জন্য বার ড্যান্সার প্রয়োজন। বস চানুর ওপর ডান্সার নির্বাচনের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। পাপিয়াকে ফাইনাল করার সময় বস চানুর মত জানতে চায়। সব মিলিয়ে চানু নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথকে প্রশস্ত করবার দিকে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পায়—

> *"ওর নিজেকে দমশেষ হয়ে যাওয়া স্প্রিং-এর পুতুলের মতো মনে হত। এখন আর কথায় কথায় ধুস বলে না চানু। ও বেশ বুঝতে পারছে ওর মনের ভিতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা তেলের বিজ্ঞাপনের সাপটা মাথা ওঠাচ্ছে।"*[৫৩]

হরিপদবাবুর ওপর থেকে বিপত্তির মেঘ যেন সরতেই চায় না। ব্যাঁকা সাহা সই করা সাদা কাগজে কিট্টুদের নামে লিখে থানায় জমা দেন। কিট্টুদের থানা থেকে ডাক আসে। সাদাসিধে হরিপদকে কিট্টুর দলবল বাজারের ওপর ঘেরাও করে কিল-ঘুষি চালিয়ে দাঁত ভেঙে দেয়। পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে তাকে হুমকিও দেয়। রাজনৈতিক বাতাবরণে সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে তারই চিত্র উঠে আসে এক সময়—

> *"শুয়োরের বাচ্চা— থানায় রিপোর্ট? কিট্টুর নাম, ভোলা, পুচাই— এদের সবার নাম— বাপের নাম কে বলে দিল তোকে— শালা ব্যাঁকার চামচে। তোর বাড়ি গিয়ে তোর মেয়েকে রেপ করিয়ে দেব ...। দু-হাত নাড়াল হরিপদ। ওর শরীরে সমস্ত শক্তি উজাড় করে বলল— না-না-না। আমি থানায় যাইনি, মায়ের দিব্যি, মা কালীর দিব্যি। হরিপদ ভাবল কালীর দিব্যি যথেষ্ট নয়। ও বলল, মা-মাটি-মানুষের দিব্যি।"*[৫৪]

রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গুণ্ডাগিরির দাপটে হরিপদবাবু কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তার সামনে জীবন এমন অভিজ্ঞতা উপস্থিত করবে তা কখনোই কল্পনায় আসেনি। তিনি নিজেকে নিয়ে ভাবেন,

হয়তো তাঁর মিনমিনে স্বভাবই আজকের বিপত্তির জন্য দায়ী। হরিপদবাবুর মেয়েকে নিয়ে উভয় পক্ষই ভয় দেখায়, টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। কিট্টুরাও হরিপদবাবুর সই নিয়ে যায় সাদা কাগজে। কিন্তু হরিপদবাবুর করার কিছু নেই। গুরুপদর সঙ্গেই তাকে থাকতে হবে চানুর কারণে। হরিপদবাবুর জীবনে ঘোর অন্ধকার অবস্থাকে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এই ভাবে—

> *"হরিপদ বুঝতে পারে— ওর হল মারীচের দশা। রামে মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে। যে কোনও একজনের হাতে মরতেই হত মারীচকে। মারীচ রামের হাতে মরাটাই বেছে নিয়েছিল।"*[৫৫]

হরিপদবাবু বুঝতে পারেন তিনি গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের শিকার। চানুর ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের একদিনের বিপর্যয়কে মেনে নিতে চেষ্টা করেন। এলাকায় ফুড পার্ক হওয়ার জন্য ব্যাঁকা সাহা এবং গুরুপদ কর্মকার দু'জনেই পার্টির বড় নেতা বিমল নন্দীকে স্বাগত জানায়। তবে ফুড পার্কের উদ্বোধন নয় বরং পার্টির জনসভার সমস্ত গেস্টদের প্যাকেটের ভার চানুর ওপর ছিল গুরুপদবাবুর সৌজন্যে। গুরুপদবাবু আগামী ইলেকশনে জেলা পরিষদের নমিনেশন পেতে পারেন। ফলে বিমল নন্দীকে একটু বেশি খাতির করতে দেখা যায়। পার্টির জনসভায় বর্তমান সময়ের নেতাদের ভাষণে প্রতিশ্রুতি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে এগোনোর কথাই বিমল নন্দী তুলে ধরেন। এলাকায় উন্নয়ন হবে, উদ্দ্যোগপতিরা ন্যায্যমূল্যে জমি নেবেন, এলাকার মানুষদের চাকরি হবে, ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তোলা যাবে, সঙ্গে অনেক সুযোগের কথাও তিনি বলেন। তাঁর বক্তব্যে রাজনীতির স্বরূপটিও উদ্ঘাটিত হয়—

> *"লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন পড়েছে। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয় উঠ গো ভারতলক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী পশ্চিমবাংলা থেকে উদিত হবে কারণ বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং লক্ষ্মী। কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। নিজেদের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি ঝেড়ে ফেলুন।"*[৫৬]

বড়ো নেতারা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে চান। তা না হলে এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হবে না। চানু গুরুপদ কর্মকারের সঙ্গে থেকে ব্যাঁকা সাহার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মূল কারণ যে ক্ষমতা পাওয়ার লড়াই সেটা বুঝে গিয়েছে। গুরুপদ কর্মকার ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে অন্যদিকে ব্যাঁকা সাহা প্রমোটারি লাইনে বহুদিন ধরে কাজ করে প্রচুর টাকার মালিক। উপরন্তু বড় নেতাদের সঙ্গে ওঠা বসা। গুরুপদ কর্মকার এলাকার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের ভাবনার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন বলেই তাঁর দলবলের ক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। নফরগঞ্জের পরিবর্তন

লক্ষ করে নিজের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমেও পরিবর্তন এনেছেন। চানু নফরগঞ্জের পরিবর্তনটা বুঝতে পারে। ফ্ল্যাট কালচার, বিউটি পার্লার, ম্যাসেজ পার্লার, মধুচক্র, ফ্লাইওভার, এলাকা দখল, নির্মাণ শিল্প সবই প্রচ্ছন্ন রাজনীতির অংশ। ভবিষ্যৎ গড়ার লড়াইয়ে চানু অগ্রসর। তার সামনে রাজনীতির পটপরিবর্তন, এলাকায় গুণ্ডাগিরির দাপট সবটা দেখেও সে তার জীবিকার মুখোপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করেছে। তা নইলে জীবন যুদ্ধে পরাজিত হতে সময় লাগবে না। তাই প্রচ্ছন্ন রাজনীতির চিত্রকে চানু নীল চশমা দিয়েই দেখে—

> *"পুরুষ বাঘেরা নিজেদের শরীর থেকে ফেরোমন বার করে। ফেরোমন নিঃসরণ করে জঙ্গলের বৃক্ষলতায় লেপে রাখে, ফেরোমন গন্ধে জানায় এলাকা আমার। মানুষ-বাঘেদের ফেরোমন নেই, বোমা আছে। বোমার চিৎকৃত শব্দে জানিয়ে দেয় এলাকা আমার।"*[৫৭]

গুরুপদবাবুর হাত ধরে থাকলে জীবনেও পরিবর্তন আসবে এই বোধ চানুর আছে। মুখ বন্ধ রেখে সমস্ত কাজ চানু নির্দ্বিধায় করে যায়। গুরুপদবাবুর দেখানো স্বপ্নের রঙে চানুও খানিকটা স্নান করে নেয়। ক্ষমতায়ন থেকেই আসতে পারে সুখ। গুরুপদ কর্মকার ক্ষমতার দ্বারা এমন জায়গায় পৌঁছোতে চান যেখানে তাঁর এক আদেশে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ হাতের মুঠোয় থাকবে। এলাকায় মুম্বাচুম্বা বার কাম রেস্টুরেন্ট খুলে তিনি মনে করেন নবযুগের পরিবর্তন তাঁর হাত ধরেই হয়েছে। নতুন বাতাসকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। গুরুপদ কর্মকার চানুর দিদি সুলতাকেও রিসেপশনে বসার কাজের সুযোগ দিতে চান। বাড়িতে কাজের সুযোগের কথা চানু জানায়। হরিপদবাবু কাজ করা নিয়ে কোনো আপত্তি না করলেও রেখা এবং সুলতা দু'জনেই কাজটির বিষয়ে নারাজ। আসলে মা-মেয়ে দু'জনেই পুরুষ শাসিত সমাজের মূল রূপটি ধরতে পেরেছিল বলেই রাজি হয়নি। কিন্তু চানুর চোখে স্বপ্ন। সে দিদিকে বোঝা মনে করে। সব কিছুকে বাদ দিয়ে সে স্বার্থপর হয়ে যায়। সে ভাবতে শুরু করে অন্য জগতের কথা—

> *"চানু নিজেকে দেখবে। চোখ খুলে গেছে ওর। চোখের সামনে তো দেখতে পেল তিন-চার বছরে কত টাকা কামিয়ে নেওয়া যায়। এই তো, সামনেই পনেরোই আগস্ট প্রতিজ্ঞা পালন করে, দেশের কথা ভাবব, দেশের কাজ করব, মনীষীদের পূজব, জ্ঞানের বাণী খুঁজব। এইসব কাজের জন্য অন্য লোকজন আছে।"*[৫৮]

স্বার্থপর আত্মমগ্ন যুগের বক্তব্যই এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়। পার্টির পিছনে কলকব্জার অলিগলি

চানু বুঝে গিয়েছে। কীভাবে টাকা ইনকাম করা যায় সেসব পাঠ তার নখদর্পণে। নতুন কিছু শিখতে সে উদগ্রীব। নবজন্মের দিকে পা বাড়াতে চায় চানু এভাবেই। অনেক কিছু শেখার তার বাকি। কিন্তু সে বুঝতে পারে না আসলে সে গুরুপদ কর্মকারের চামচে ছাড়া আর কিছু নয়। তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসা এত সহজ নয়। এক চক্রব্যূহের মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে বের হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

গুরুপদ কর্মকার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কীভাবে হরিপদবাবুর পরিবারকে মাধ্যম করেছে সে ব্যাপারে চানুর সাধারণ বুদ্ধি অনুভব করতে পারেনি। গুরুপদ কর্মকার দু'টি উপায়ে নিজের পথকে প্রশস্ত করতে প্রস্তুত। প্রথম, তিনি নিজের স্ত্রীকে অ্যাসিড খাইয়ে মৃত্যু মুখে পতিত করেন। এমন সময়ে এই কাজটি করেন যখন ছেলের পরীক্ষা শেষ এবং ফ্লাইটের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি করেন। যে অ্যাসিড খেয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে সেটা ফ্রীজের মধ্যেই বা এলো কী করে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সবই পূর্ব পরিকল্পনার অংশ। ডেথ সার্টিফিকিটে অ্যাসিড খেয়ে মৃত্যু বিষয়টির অনুপস্থিতি গুরুপদ কর্মকারের কর্মকাণ্ডকে স্পষ্ট করে। এরপর স্ত্রীর শোকে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে রওনা, ফোন বন্ধ রাখা, সমস্ত বিষয়গুলি তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সাজিয়েছেন। দ্বিতীয়, পাপিয়াকে দিয়ে ব্যাঁকা সাহাকে দীঘায় পাঠানো এবং তার মার্ডার, পাপিয়াকে মিডিয়াতে বড় করে দেখানো, এক্সকর্ট সার্ভিসকে প্রাধান্য দেওয়া, টাকার লোভে গ্রামের মেয়েদের দুশ্চরিত্র হওয়ার চিত্র এবং পাপিয়ার জেলের ভিতরে গায়ে আগুন লাগিয়ে মৃত্যু যেন চিত্রনাট্যের মত উপস্থিত হয়েছে। দুটো বিষয়ের যোগ যে গুরুপদ কর্মকারের কারসাজি সেটা বুঝতে বাকি থাকে না চানুর। তবে চানু বুঝতে পারে না মুম্বাচুম্বা রেস্টুরেন্টে ব্যাঁকা সাহা এবং গুরুপদ কর্মকারের মধ্যে ফুটপাতের জমি নিয়ে আপোস চলার কথা আজ অন্যপথ নিতে বাধ্য হল কেন? আসলে একা ক্ষমতাভোগ করার নেশা রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। অর্থ নয় বুদ্ধিই জয়ী হয়েছে।

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়' বাক্যটি হরিপদ চক্রবর্তীর জীবনে সত্য হয়ে উপস্থিত হয়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অন্ধকারের হাত এসে পড়ে হরিপদবাবুর বাড়িতে। ব্যাঁকা সাহার মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা সমবেত মিছিল নিয়ে হরিপদবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়। হরিপদবাবু সে সময়ে গদিতে। চানু বাড়িতেই রিমোট হাতে খবরের চ্যানেলে চোখ। বাড়িতে গুণ্ডাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সে বাইরে বেরোতে ভয় পায়। সামনে সমূহ বিপদের চিত্র দেখেও তার ভীরু মন তাকে ঘরের মধ্যেই আটকে রাখে। কিন্তু পরক্ষণেই দিদির কথা মনে পড়ে বাইরে বেরোতে গিয়ে দেখে দরজা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। চানু দরজা ধাক্কা দিলে তারা গুলি চালাবার হুমকি দেয়। নিরুপায়

রেখাকে বাথরুমে হাত বেঁধে রাখা হয়। এরপর সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ে সুলতার ওপর। নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয় মেয়েটি। চানুর দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসা হয় না। এক সময় ধর্ষিতা মেয়েটিই দরজা খুলে দেয়। মা রেখাকেও বাথরুম থেকে বের করে। এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায় চানুর মধ্যে। মধ্যবিত্ত পলায়নবাদী রূপ তার চরিত্রে ধরা পড়ে। সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ধর্ষণের চিহ্ন লোপাট করতে। দিদির ঠোঁটের রক্তে বোরোলিন লাগিয়ে দিতে তার হাত এগোলে ঠিক অন্য চিত্র উপস্থিত হয়—

> *"... সুলতা ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ওর মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে, ওই দুই নারীর সারা শরীর কাঁপতে থাকে। ওদের মুখ থেকে অদ্ভুত কিছু শব্দ বের হয়। ওটা কান্না না চিৎকার না গোঙানি না আর্তনাদ না ঘৃণা না ভেজা বারুদের ভীত বিস্ফোরণ চানু বুঝে উঠতে পারে না।'*[৫৯]

মা ও দিদির ভেজা বারুদের মতো আস্ফালনকে সে আমল দেয় না। তার কর্তব্য সে ঠিক করে ফেলে। তাকে এই ঘটনাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। পাড়া প্রতিবেশী, সমাজের কেউ যেন না জানতে পারে এই বিপর্যয়ের ঘটনা। চানুর সঙ্গে নিরুপায় মধ্যবিত্ত মাও যোগ দিল এক সময়। দু'জনেই পণ করল এই ঘটনা যেন কেউ না জানে। থানায় ডায়ারি করেনি চানু। হরিপদবাবুও ঘটনার কতটা জানেন তা স্পষ্ট নয় পাঠকের কাছে। এমনকি গুরুপদকেও জানায়নি চানু। ব্যাঁকা সাহার মৃত্যুর পর গুরুপদ কর্মকারের পার্টির দিকে অনেকেই ঝুঁকতে শুরু করে। নফরগঞ্জ ধীরে ধীরে শান্ত এলাকার রূপ নেয়। কিন্তু একটি পরিবারের বিপর্যয়ের চিত্র ম্লান হতে চায় না। যে খবর একটি পরিবার জানাতে চায়নি কাউকে সেটাই রটে যেতে থাকে সর্বত্র। 'ধর্ষণ' নামক শব্দটি সুলতার জীবনে রক্তক্ষরণের মতো তাকে একটু একটু করে কুঁরে কুঁরে খায়। তার উপর প্রতিবেশিদের জানাজানি তাকে আরো মর্মাহত করে তোলে। পাড়ার এক ভদ্রলোকের সহানুভূতির বাণী সমাজ ও রাজনীতির বাতাবরণকে তুলে ধরে—

> *"এক ফোঁটা রক্ত থেকেই সারা শরীরের জার্ম বোঝা যায়, একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যায় সারা দেশ। আমরা জ্যান্ত থেকেও মড়া। এই জ্যান্ত থাকার মানে নেই। এখন আমরা সব ভেজা বারুদ। লোকটা চানুর পিঠে হাত দেয়। সহানুভূতির, নাকি বলছে ওঠো জাগো ...। স্বামী বিবেকানন্দর ছবির তলায় যেমন লেখা থাকে।'*[৬০]

চানু নিজের কর্তব্য ঠিক করতে পারে না। কোন পথে সে হাঁটবে? রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না

থাকলেও তার অভিজ্ঞতা যে একটি পরিবারকে নাস্তানাবুদ করে তুলতে পারে তার চিত্র চানুর সামনে। হরিপদবাবুর সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক বচসার সূত্র যে এতদূর গড়াতে পারে তা চানু বা তার পরিবারের আঁচ করার কথা নয়। হরিপদবাবুও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তাকেই কেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার করা হল। সুলতার ধর্ষণ হওয়ার ঘটনা পুরো পরিবারের ওপর আরও ভয়াবহ রূপকে আমন্ত্রণ করে। নতুন অভিজ্ঞতার চক্রব্যূহ থেকে এই পরিবার বেরোতে পারবে না এটা তারা বুঝে গিয়েছিল। আর এই সুযোগটিই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন গুরুপদবাবু। চানুকে ডেকে পাঠিয়ে গুরুপদ সুলতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তার পরিবারকে সমাজের হেনস্থা থেকে বাঁচাবার টোপ হিসেবে সুলতাকে তিনি গ্রহণ করতে চান। চানু সব জেনেও শুধু ক্ষমতাবান লোকের সান্নিধ্যে থাকার লোভে তার মনের কোণে উৎফুল্লতা জেগে ওঠে। সে এই প্রস্তাব বাড়িতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেজা বারুদেরা তাদের শেষ শক্তি দিয়ে বিস্ফারিত হতে চায়—

> *"সুলতা প্রেসার কুকারের সিটির মতো চিৎকার করে বলল— রাজি ... আমি রাজি ... আমিও পুড়ে যেতে রাজি আছি রে ভাই ...।'*[৬১]

রেখার কান্নার সঙ্গে পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার তুলনা করে ঔপন্যাসিক প্রতিবাদের স্বরকে প্রকাশ করতে চান। হরিপদবাবুও চানুর কথায় তেড়ে আসেন। চানু বাদে সবাই এক সুরে কথা বলতে চায়। তারা সবাই ভেজা বারুদের মতো তাদের প্রতিবাদ জানায়। আসলে নিরুপায় সত্তার হাতে কিছু থাকে না। তাদের প্রতিবাদের স্বর বহুদূর পৌঁছোতে পারে না। কিন্তু তারা চেষ্টা করে। চানুর মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থপর মন, ক্ষমতায়নের লোভের চিত্র ধরা পড়ে। যারা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নিজের নীতিবোধকে জলাঞ্জলি দিতে পারে। আসলে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যপর্বে রাজনীতির সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষমতায়ন এবং সুখভোগই রাজনীতির হালহকিকত। এই রাজনীতি আদর্শকে জীবন থেকে বহুদূর সরিয়ে দেয়। যার চিত্র 'ভেজা বারুদ' উপন্যাসে স্বপ্নময় চক্রবর্তী এঁকেছেন। সাধারণ মানুষের জীবন নদী কোন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে জীবন সম্পর্কে কোন পাঠ পড়াতে চায় তা এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের ঘটনা সংস্থাপনের পদ্ধতি স্বপ্নময় চক্রবর্তী অনুসরণ করেছেন। কাহিনির বুননে রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে হরিপদবাবু সন্তান চানু-সুলতা এবং হরিপদবাবুর স্ত্রী প্রত্যেকেই আবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেকেই বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সংকটের শিকার হয়েছে। সাধারণ জীবন রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই কাহিনিই সহজ প্লটে লিপিবদ্ধ হয়েছে উপন্যাসে। এবং প্রতিটি উপন্যাসের জীবন জিজ্ঞাসার চিত্র আলাদা আলাদা ভাবে তুলে ধরে উপন্যাসটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। এবারে আমরা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বিজ্ঞান বিষয়ক ভাবনার প্রকাশের একটি দিককে পরবর্তী উপন্যাসের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করব।

৬

'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬ সালে। মোট ২৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত উপন্যাসটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে কৌতূহলী শিক্ষক-ছাত্রের আখ্যান। আকাশবাণীতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৯৬ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. নারায়ণচন্দ্র রানার মৃত্যু সংবাদে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন করার কথা ভাবেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সেই সুবাদে পূর্ব মেদিনীপুরের নারায়ণচন্দ্র রানার গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানেই নারায়ণচন্দ্রের শিক্ষক এবং প্রেরণাদাতা শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির অবদানের কথা জানতে পারেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বপ্নময় চক্রবর্তী শিক্ষক এবং ছাত্রের অসাধারণ আখ্যানকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। তাদের জীবন কাহিনির সামান্য রসদের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ছাত্র নয়ন চাঁদ ঘরামি ও শিক্ষক মণিলাল আইচের কৃতিত্বের কাহিনি। মণিলাল আইচ সুন্দরবন অঞ্চলের বুধখালি কৃপাসিন্ধু স্কুলের মাস্টার যিনি MLA স্যার নামের পরিচিত। তাঁর সখ, ছাত্রদের আকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ভালোবেসে মেধাবী ছাত্রদের তিনি সাহায্যও করতেন। মণিলাল স্যারের কাছে পিচকিরি দিয়ে বানানো এক টেলিস্কোপ তাঁর বিশ্বমহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যম। এই টেলিস্কোপ হাতে আসে কলকাতার এক মহাকাশপ্রেমী অমিয় বড়ালের কাছ থেকে। সেই টেলিস্কোপটিই ছিল পাউডার কৌটো দিয়ে তৈরি। পরবর্তী সময়ে মণিলাল আইচ পিতলের পিচকিরির মধ্যে টেলিস্কোপটিকে প্রতিস্থাপন করে নতুন রূপ দেন। এই টেলিস্কোপ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। নয়নচাঁদের বাবা ঘরামির কাজ করে ছেলেকে কৃপাসিন্ধু স্কুলে পড়াতে পারবেন না। একথা জানার পর মণিলাল স্যার নিজের গরজে নয়নচাঁদকে স্কুলে ভর্তি হওয়ার উৎসাহ দেন। নয়নচাঁদের পড়াশুনোর আগ্রহের কথা আগেই জেনেছিলেন মণিলাল স্যার। তাই কৃপাসিন্ধু স্কুলে ঘরামির ছেলেকে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। ক্লাসে নয়নচাঁদের প্রশ্ন করার ধরন এবং সূর্য সম্পর্কে আগ্রহের কারণে মণিলাল স্যার নয়নকে বলেন— তোকে বিজ্ঞানী হতে হবে, সূর্যের ব্যাস তোকেই মাপতে হবে। এই প্রেরণায় নয়নচাঁদ বড়ো হতে থাকে। বাবার শরীর আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণে নয়নচাঁদের পড়াশুনোর খরচ যোগাড় এবং অন্ন সংস্থানেও সমস্যা হচ্ছিল। তাই নয়ন রমাকান্ত কামারের কাছে হাপর টানার কাজ নেয়। এইসূত্রে রমাকান্তর ছোট মেয়ে মানীকে পড়ানোর ভারও তার ওপর পড়ে। চলমানতার ধারাবাহিকতায় নয়নের বুকে

একটা ব্লক ধরা পড়ে। অসুখের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে নয়ন কলেজে ভর্তি হয় স্কুল থেকে ভালো রেজাল্ট নিয়ে। নয়ন মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম স্থান পেলেও তাকে নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিষ্ঠুরতার পর্ব শুরু হয়। সবকিছুর মধ্যে মণিলাল স্যারের প্রেরণায় নয়নচাঁদ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়। স্কলারশিপের টাকায় পড়াশুনো চলতে থাকে নয়নের। রমাকান্ত কামারের মেয়ে মানী দিদিমণি হতে চেয়েছিল। কিন্তু কামার ঘরের মেয়ের স্বপ্ন দেখা বৃথা। বিয়ে হয়ে যায় তার। খবর পৌঁছায় নয়নের কাছে। এক গভীর বেদনাবোধ তাঁকে কুঁরে কুঁরে খায়। কারণ, বিয়ের কিছুদিনের মাথায় মানী আত্মহত্যা করে শ্বশুর বাড়িতে বনিবনার অভাবে। দেশের মেয়েদের করুণ রূপের সঙ্গে পরিচয় হয় নয়নের। অন্যদিকে কলেজের বান্ধবী অনন্যার সঙ্গে নয়নের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এম.এস সি পাশ করে তারা দুজনে ১৯৭৭সালে আমেরিকায় পাড়ি দেয় গবেষণার জন্য। গবেষণা শেষ করে অনন্যা সে দেশেই থেকে যায়। কিন্তু নয়নচাঁদ পুনের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এ অ্যান্টেনার রেডিও টেলিস্কোপের কাজ পেয়ে দেশে ফিরে আসে ১৯৮৩ সালে। ধীরে ধীরে বিশ্বে বিজ্ঞানের উন্নয়নের ছোঁয়া ভারতেও এসে পৌঁছায় ১৯৯৫ সাল। ইতিমধ্যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। মণিলাল স্যারের কথায় নয়নচাঁদ প্রস্তুত হয় সূর্যের ব্যাস মাপতে। নয়নচাঁদ বহুজায়গায় তার স্কলারদের ডেটা সংগ্রহের জন্য কাজে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু নয়নের বুকের ব্যাথাটা আবার শুরু হয়। সেই ব্লকেজই তার কাল হয়। সূর্যের ব্যাস মাপতে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। কিন্তু নয়নের পদ্ধতি সফল হয়। তার আবিষ্কৃত পদ্ধতি ড. এন.সি. জি মেথড নামে সম্মানিত হল। মণিলাল স্যারের স্বপ্ন পূরণ হল ঠিকই, কিন্তু নয়ন আর জীবিত রইল না। নয়নচাঁদের মৃত্যুর পনের বছর পর সুবল মিদ্দ্যের মধ্যে নয়নের মতোই মেধার ঝলক দেখতে পান মণিলাল স্যার। দ্বিতীয় নয়নচাঁদ তৈরি করার তাগিদে সুবলকে উৎসাহ দিতে থাকেন। সুবলকে ম্যাথেমেটিক্সে অনার্স নিতে বললেও সুবল কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনোর কথা ভাবে। কারণ সে নিজে দ্বিতীয় নয়নচাঁদ হতে চায় না। সে প্র্যাকটিক্যাল হতে চেয়েছিল। সে চায় ভালো চাকরি করে বাবা-মাকে নিয়ে শহরে গিয়ে সুখে জীবন কাটাতে। কারণ এসব নয়নচাঁদ করেনি। বাবা মাকে দারিদ্র্যের মধ্যেই রেখে দিয়েছিল সে। সে শুধু আকাশ-আকাশ করে গবেষণার মধ্যেই ডুবে ছিল। বাস্তবজগৎ জীবনের প্রতি তার কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। তাই মণিলাল স্যারের আর দ্বিতীয় নয়নচাঁদ তৈরি করা হল না। এভাবেই সমাজ-ইতিহাস রাজনীতি-বিজ্ঞানের নানা বাস্তবচিত্র উপন্যাসটির অঙ্গে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' লিখেছেন নব্বইয়ের দশকে। এক

সংস্কৃত শিক্ষকের জীবনাদর্শ সেখানে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর একুশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচনা করলেন 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ'। দুই শিক্ষকের আদর্শ দু'টি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষক হলেন মানুষ তৈরির কারিগর। যে মানুষ সঠিক মানবিকতাকে বহন করবে সেরকম মানুষ তৈরি করেন শিক্ষকেরা। মণিলাল আইচ স্যার এমন এক কারিগর যিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসু মনকে জাগরূক করেন। উপন্যাসটির শেষ হচ্ছে যে লাইনটি দিয়ে সেখানেই মণিলাল স্যারের মূল উৎসর্গ লুকিয়ে রয়েছে— *"মানুষ জেনেছে অনেক, কিন্তু জানেনি তার চেয়ে অনেক বেশি।'*[৬২] ভূগোল শিক্ষক মণিলাল স্যার ছাত্রদের সেই জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে চান যেখানে তারা নতুনের সন্ধানী হবে। জানার বাইরের জগৎটা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলাই তাঁর কাজ। তিনি ছাত্রদের মধ্যে জিজ্ঞাসু চোখকে খুঁজে বেড়ান। তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এমনই এক চোখ যার মধ্যে অজানাকে জানার অধীর আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল। সে ঘরামির ছেলে নয়নচাঁদ। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে প্রান্তিক জনের কথা। 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' উপন্যাসেও প্রান্তিক অঞ্চল এবং প্রন্তিক মানুষগুলির বাঁচার ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের প্রান্তিক গ্রাম বুধখালি, মধুখালি, কৃপাখালি, নোদাখালি, চাচরবেড়া এলাকায় বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ঘর দেখা যায় না। মণিলাল আইচের ঠাকুরদাদা জমিদারের নায়েবগিরি করতে এসে চাচরবেড়া গ্রামে থেকে যান। ক্যানিং এই সব এলাকার সদর শহর। বুধখালি কৃপাসিন্ধু বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক মণিলাল আইচ। উপন্যাসের সূচনায় তিনি একজন 'রিটায়ার্ড পার্সন'। ক্যানিংয়ে গিয়ে ঘরভাড়া নিয়ে থাকলে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাননি। গ্রামে জ্বালানির সমস্যা, বিদ্যুতের সমস্যা, একা রান্না করে খাওয়ার সমস্যা হলেও তিনি এখানেই থেকে গিয়েছেন। কেন? কারণ, মৃত্যুর আগে তিনি আরও একটা নয়নচাঁদ দেখে যেতে চান। কার উপর মণিলাল স্যারের ভরসা? ভোলা মিদ্যের ছেলে সুবলের উপর। সুবল মাধ্যমিকে ঊননব্বই শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। সে ক্যানিং বঙ্কিম সর্দার কলেজে অঙ্ক নিয়ে পড়ে। তাকেই মণিলাল স্যার বিজ্ঞানের রহস্য সন্ধানে উৎসাহ দেন। তিনি সুবলকে বিশ্বরহস্য উন্মোচনে উৎসাহ দিতে গিয়ে ঠিক এইভাবে বোঝান—

> *"তারায় তারায় তো অঙ্কেরই খেলা, এক গ্যালক্সি থেকে অন্য গ্যালক্সি, কী বিরাট সব কাণ্ডকারখানা, সবাই ছুটছে, কারো সঙ্গে কারো কোনো ধাক্কাধাক্কি নেই। অথচ সামান্য একটা ক্যানিং-বারুইপুর রোড, ক'টা ভ্যান, ভটভটি আর অটো, দ্যাকনা, নিত্যনিমিত্ত অ্যাকসিডেন্ট লেগেই রয়েছে। অথচ এই আকাশে*

এত লক্ষ কোটি গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, কোনো বিশৃঙ্খলা নাই, সব ফর্মুলায় চলছে। এইসব ফর্মুলাগুলো ঝানতি পারলি, বুঝতি পারলি, তবে তো পোক্কার হবে কে আমি, কে তুই ...। কেন আমি কেন তুই।''[৬৩]

পনের বছর পূর্বে মণিলাল স্যার অবসর গ্রহণ করেছেন। ছাত্র তৈরির কারিগর ছাত্র খুঁজে চলেছেন নিরলসভাবে। শুধু তাঁর ভাবনার রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমকে তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন। আকাশের রহস্যটা কী এটা তিনি জানতে চান। সে জানার পথে অনেকটা অগ্রসর হলেও মাঝপথে বাধা পড়ে। নয়নচাঁদের মৃত্যু তাঁর স্বপ্নকে মাঝ পথে থামিয়ে দেয়। আজ বহুদিন বাদে দ্বিতীয় নয়ন চাঁদের রেখা তিনি দেখেছেন সুবলের মধ্যে। তাই শেষ বয়সে অনেকটা আশা নিয়ে কখনো আধপেট খেয়ে, কখনো অন্যের বাড়িতে যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছেন। প্রথম অধ্যায়ের পর ফ্ল্যাশব্যাকে মণিলাল সারের যৌবনকালে আমরা উপস্থিত হই। যখন তিনি কৃপাসিন্ধু স্কুলে প্রবল উদ্দমে শিক্ষকতা করছেন। ফ্ল্যাশব্যাকেই নয়নচাঁদের সঙ্গে মণিলাল স্যারের মেলবন্ধনের ইতিহাস ঔপন্যাসিক উপস্থিত করেছেন।

মণিলাল স্যার পড়ানোর বিষয়ে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল। পুথিগত জ্ঞানকে তিনি সব সময় হাতে কলমে প্রকৃতির রহস্যের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। চতুর্থ শ্রেণির ক্লাসে জোয়ার-ভাটা বোঝাতে গিয়ে 'আকর্ষণ কী' এই প্রশ্ন উঠে আসে। মণিলাল স্যার আকর্ষণ বোঝানোর জন্য চুম্বকের আশ্রয় নেন। প্রসঙ্গক্রমে চাঁদের আকর্ষণের কথা উঠে আসে। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে থেকে নয়নচাঁদ প্রশ্ন করে—

"চাঁদের যদি এতই আকর্ষণ, তবে আকাশের সব মেঘ চাঁদের দিকে চলে যায় না কেন? মেঘ তো চাঁদের আরো কাছে।''[৬৪]

মণিলাল স্যারের এই উত্তর জানা নেই। কিন্তু তিনি নয়নচাঁদের মধ্যে রহস্য অনুসন্ধানের চিহ্ন লক্ষ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন ১৯৬০ সালকে উল্লেখ করে। এ সময় মণিলাল আইচ যুবক এবং নয়নচাঁদ বালক। মণিলাল স্যারের পিঠে একটি লাইপোমা অর্থাৎ কুঁজ রয়েছে। কিন্তু কেন এই কুঁজ তাকে ঈশ্বর দিয়েছেন তা তিনি জানেন না। আসলে মণিলাল স্যার আকাশ দেখতে এবং দেখাতে ভালোবাসেন, আর তাঁরই কিনা পিঠে কুঁজ! তিনি এর মধ্যে ঈশ্বরের রহস্য খুঁজতে চেয়েও পাননি। অনুসন্ধিৎসু মণিলাল স্যার সর্বদা জিজ্ঞাসু ছাত্রের সন্ধানে থাকেন। মণিলাল স্যারের বাড়িতে নয়নচাঁদ তার বাবার সঙ্গে ঘর ছাইতে এসেছিল। সেখানেই মণিলাল স্যার নয়নের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পান। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন শিশু শ্রমিকটি নয়নচাঁদ,

পাঠশালায় পড়তে যায়। সেখানেই তার অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়। নয়নচাঁদের মধ্যে পড়াশুনোর আগ্রহ দেখে তাকে কৃপাসিন্ধু স্কুলে পড়াবার জন্য নয়নের বাবাকে বলেন কিন্তু তার বাবার পড়ানোর মতো সামর্থ ছিল না। বিজয় ঘরামি খড়ের চাল ছাওয়ার কাজ করতেন আর তাঁর স্ত্রী লোকের বাড়িতে মুড়ি ভাজার কাজ করতেন। এই পরিবারের কাছে ছেলেকে স্কুলে পড়ানো অলিক কল্পনা। কিন্তু জানার আগ্রহ নয়নচাঁদকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সে নিজেই কৃপাসিন্ধু স্কুলে মণিলাল স্যারের কাছে উপস্থিত হয়ে ভর্তি হওয়ার কথা বলে। মণিলাল স্যারের দৌলতে তাকে স্কুলে ভর্তি নেওয়া হয়। দুই অসমবয়সী জিজ্ঞাসু মনের যাত্রা শুরু হয় এভাবেই।

বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা দারিদ্র্যকে জয় করে নতুন পথের সন্ধান দেয়। নয়নচাঁদের দারিদ্র্য কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তার জানার ইচ্ছের কাছে। 'পুটোর ঢিবি' মণিলাল স্যারের কাছে 'বুধখালির নাসা'। এই ঢিবির ওপর থেকেই তিনি ছাত্রদের মহাকাশের নক্ষত্র জগতের সঙ্গে পরিচয় করান। নয়নচাঁদ মণিলাল স্যারের কাছে মহাকাশের পাঠ এই ঢিবি থেকেই নিতে শুরু করে। ক্লাসে পৃথিবীর ম্যাপ দেখিয়ে মহাদেশের নাম জানানোর মধ্য দিয়ে মণিলাল স্যার বিলেতে গিয়ে পড়াশুনোর কথা বলেন। নয়নচাঁদের মধ্যে নতুন ভাবনার সঞ্চার করার চেষ্টা করেন। মণিলাল স্যার যেন বেঁচে থাকতে চান নয়নচাঁদের মধ্যে। মণিলাল স্যার নয়নচাঁদের জিজ্ঞাসু মনকে বুঝতে পারেন।

মণিলাল স্যারের ক্লাস মানেই নতুন প্রশ্ন, নতুন জানা। ভূগোল ক্লাসের শিক্ষক হয়েও মণিলাল স্যার হয়ে উঠেছেন নয়নচাঁদের সব বিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডার। সূর্যের ব্যাস কত নয়নচাঁদ জানতে চাইলে মণিলাল স্যার সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি পালটা নয়নচাঁদকে বলেছেন— *"সূর্যের ব্যাসটা এখনো ঠিকভাবে মাপা যায়নি, তোমাকেই মাপতে হবে।"*[৬৫] ক্লাস এইটের ছাত্র নয়নচাঁদকে সূর্যের ব্যাস মাপার কথা বলে কোনো ভুল করেননি মণিলাল স্যার। এই কথা নয়নচাঁদের মধ্যে গবেষণার বীজ বপন করেছিল। তাই নয়নচাঁদের শরীরে দানা বাঁধা অসুখ কোনো পরিস্থিতিতে তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মণিলাল স্যারের কাছ থেকে নক্ষত্র জগতের রহস্য জানতে নয়নচাঁদ প্রায়ই ক্লাস শেষ হওয়ার পর চলে যেত। মহাবিশ্বের রহস্য নয়নচাঁদের সামনে বড় প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। মণিলাল স্যারের সহযোগিতায় নয়নের পড়াশুনোর জন্য বইপত্রের কোনো অভাব হয়নি। কিন্তু পেটের খাবারের বড় অভাব। মণিলাল স্যার নিজে টিফিনের সময় না খেয়ে স্কুল ছুটির পর নয়নের সঙ্গে বাড়ির পথে খাবার ভাগ করে খেয়ে তিনি নয়নচাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্তিরও ব্যবস্থা করতেন। তবে নয়নচাঁদকে কোনো দিন হাতে টাকা ধরাতে পারেননি মণিলাল স্যার। নয়নচাঁদের মধ্যে চাঁদ,

নক্ষত্র মণ্ডল, নীহারিকার রহস্য জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সে প্রায়ই রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। এই ভাবে বেরিয়ে যাওয়াই যে একদিন তার কাল হবে সেটা কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। নয়নচাঁদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাইরের দরজা খুলে রেখেই চলে গিয়েছিল। ফলে ঘরে শিয়াল ঢুকে হাঁস-মুরগীর ছানার ওপর হামলা করে। নয়ন চাঁদের বাবা তক্তপোষের উপরে নাইলনের মশারির ভিতরেই গ্যাসলাইট জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে যান। তখনই বিপর্যয় ঘটে। মশারি গায়ের উপর বসে গিয়ে সম্পূর্ণ শরীর পুড়ে যায়। নয়নের বাড়ি ফিরে আসার পর এই ঘটনা সে জানতে পারে। প্রত্যেকেই তাকে দোষারোপ করে। রাতের বেলা আকাশ দেখতে যাওয়ার কোনো কারণ পরিবারের লোকেরা না খুঁজে পেলেও মণিলাল স্যারের হৃদয় ঠিক আসল কারণটা বুঝে গিয়েছিল। তাই তিনি নয়নকে বলেন—

"... বড় হলে বিজ্ঞানী হবি তো, হতে তো হবেই। এসব হল একজন বিজ্ঞানীর ছোটবেলার হ্যাজার্ড।"[৬৬]

প্রান্তিক মানুষগুলির আর্থিক দুরবস্থা এক সময় তাদের মেধাবী সন্তানদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াত। নয়নচাঁদের বাবা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর তিনি অক্ষম হয়ে পড়েন। সংসারে হাল ধরার জন্য নয়ন উদ্যোগী হয়। কিন্তু কোন পথে সে হাঁটবে, জনমজুরী ছাড়া অন্য পথ তাকে ভাবতে হবে। ঘরামির কাজ সে ভালো করে শেখেনি, জাল ফেলতে পারে না, মধু সংগ্রহ করার পদ্ধতিও জানা নেই, চালের লাইনে কাজ করতে পারবে না, কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে। কিন্তু কোন পথটা তার জন্য উপযুক্ত তা নয়ন ভাবতে থাকে। এক সময় রমাকান্ত কামারের কাছে হাপর টানার কাজটা পেয়ে যায় সে। সঙ্গে ছোট মেয়ে মানীকে অঙ্ক দেখিয়ে দেওয়া। বিশ শতকের সত্তর দশকের সময় থেকে প্রান্তিক শ্রেণির মেয়েরাও পড়াশুনোর জগতে পা বাড়িয়েছে। তবে সমাজে যে তারা যথার্থ সম্মান পেত না তার প্রমাণ ঔপন্যাসিক দিয়েছেন শ্লোক সংগ্রহের মাধ্যমে—

"যতই পড়ো চাষার ছেলে
অজ আম ঈশ
শেষকালে তোমার গতি
লাঙল আর বৃষ।"[৬৭]

মেয়েদের অবস্থা আরও শোচনীয়। মানীর মধ্য দিয়ে সে চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। মানীর ইচ্ছে সে দিদিমণি হবে। কিন্তু তার বাবা তাকে অন্য দিদিদের মতো সংসারী করতে চান। মানীর ইচ্ছের কথা নয়নচাঁদ জানত বলেই মানীকে সে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিত। কারণ

সে জানে মেয়েরাও আজ আকাশচারী হয়েছে। তাদের গণ্ডি সীমিত নয়। কিন্তু মানীর ইচ্ছে পূরণ হয় না। তার বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলে। পাত্র মাছ ধরার ট্রলারে ইঞ্জিন চালাবার কাজ করে। বিয়েও হয় মানীর। কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে যুক্তিসহ কথা বলায় সে গৃহ-নির্যাতনের শিকার হয়। এক সময় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। মারা যাওয়ার আগে নয়নচাঁদকে সে চিঠি লিখে যায়। তাতে নারীদের দুরবস্থার চিত্র যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি নারীদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ারও চিত্র ধরা পড়ে—

> *"একজন বিদ্যাসাগরে কিছু হল না গো নয়নদাদা, আরো দু'তিনজন বিদ্যাসাগর দরকার ছিল।"*[৬৮]

মানীর কথায় সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার রূপটিও উঠে এসেছে। সমাজের সর্বস্তরের উন্নতি সাধন আমাদের মত দেশে আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মানীর জীবনবৃত্তান্ত সে কথারই ইঙ্গিত দেয়। নয়নচাঁদের মধ্যেও শুরু হয় গ্লানিবোধ। তার পড়াশুনোর কী কোনো দাম নেই। আজ সে স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে স্কলারশিপ নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আগামী দিনে গবেষণা করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রান্তিক শ্রেণির মেয়েরা আজও সেই তিমিরে পড়ে রয়েছে। সব অর্থহীন মনে হয় নয়নের, কারণ—

> *"ভারতবর্ষও চাঁদে পাঠাবে চন্দ্রযান। উপগ্রহ পাঠাল। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে। ভারতের আই আইটি-র ছাত্ররা আমেরিকা গিয়ে কঠিন কঠিন সব গবেষণা করছে। আর কামার ঘরের মেয়েটা একটা পাশ দিয়েছে, সামান্য স্বাধিকার বোধ অর্জন করেছে বলে নিজেকে শেষ করতে হল। কেন?"*[৬৯]

নয়নচাঁদ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যকে মেনে নিতে পারে না। আমেরিকার চাঁদের মাটিতে পা, ভারতের গবেষণাক্ষেত্রে প্রগতি— এ সব তার কাছে মিথ্যে মনে হয়। কিন্তু মণিলাল স্যার তার সমস্তরকম হতাশার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন। তিনিই নয়নচাঁদকে বোঝান জ্ঞানের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই মানুষ শুদ্ধ হবে। নতুন চিন্তায় ভাবতে শুরু করবে। তাই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে সমানে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ।

রমাকান্ত কামারের কাছে কাজ করতে করতে নয়নচাঁদ ক্লাস টেনে উঠে যায়। এরপর সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো শুরু করে। নয়নের মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য মণিলাল স্যার তাকে পি.জি. হাসপাতালে নিয়ে যান। কলকাতার বুকে নয়নচাঁদের প্রথম পদার্পণ। কলকাতায় গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যুগলবন্দি আরো দৃঢ় হয়। তারা বিড়লা প্লানেটোরিয়ামে

তারামণ্ডলের কারসাজি দেখে বেরোনোর সময় অমিয় বড়াল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় মণিলাল স্যারের। অমিয়বাবুরও আকাশ দেখার এবং দেখানোর শখ। তাঁর চশমার দোকান রয়েছে। দোকানের লেন্স তিনি পাউডার কৌটোর মধ্যে স্থাপন করে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন। সেই টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি মহাকাশের রহস্য অনুভব করেন, বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি মণিলাল স্যারের গ্রামে যেতে চান। মণিলাল স্যার ব্যবস্থাও করেন। অমিয় বড়াল চাচড়বেড়ায় উপস্থিত হয়ে যান টেলিস্কোপ নিয়ে। গ্রামের উৎসুক ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় একশ ছাড়িয়ে যায়। গ্রাম্য নর-নারীর জিজ্ঞাসু প্রশ্ন অমিয় বড়াল, মণিলাল স্যার এবং নয়নকে নতুন পথ খোঁজার উদ্যম যোগাতে ইন্ধন সৃষ্টি করল। অমিয় বড়ালের উদ্যোগে নয়নচাঁদের রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। নয়নচাঁদের বুকে লেক্ট বাণ্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লক ধরা পড়ে। যার ফলে সে হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে যেত। এর কোনো চিকিৎসা নেই। শুধু উত্তেজনা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। অমিয় বড়ালও অসুস্থ ছিলেন। তাঁর কিডনির সমস্যা রয়েছে। ডায়ালিসিস ছাড়া পথ নেই। অমিয়বাবুর পরিবারের বোঝা বাড়াতে চান না বলে তিনিও সন্তর্পণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। যাবার আগে তার টেলিস্কোপটি মণিলাল স্যারকে দিয়ে যান। মহাবিশ্বের মহালীলায় মানুষেরা এভাবেই উদ্ভব হয় আবার মিলিয়ে যায়।

মানুষ সত্যের সন্ধানী। সত্যের সন্ধান করতেই ১৯৬৯ সালে আমেরিকার চন্দ্রজয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মহাকাশের নতুন রহস্য উন্মোচন। মণিলাল স্যার এই সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে বুধাখালির এক গ্রামের স্কুল মাস্টার হয়েও আমেরিকার হয়ে ছাত্রদের মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন। আমেরিকার কাছে সে খবর পৌঁছবে না কোনো দিন। কিন্তু কিসের আশায় মণিলাল স্যারের এই কাজ? মানব সভ্যতার ইতিহাসে রোমঞ্চকে উদ্ঘাটন করলেন যারা তাদের উদ্দেশ্যে আনন্দে তিনি মেতে উঠেছিলেন। কারণ তিনি মানেন— মানুষের জানার বাইরের জগৎকে জানার উদ্দেশ্যেই মানুষের নতুন ইতিহাস গড়তে পারে। নয়নচাঁদকে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি গড়ে তুলতে চান। অমিয় বড়ালের টেলিস্কোপটি হাতে পাওয়ার পর তিনি মহাকাশের আরো কাছাকাছি ছাত্রদের আনার সুযোগ পেলেন। জ্যোতির্বিদ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অমিয় বড়ালের কাছ থেকে জেনে মণিলাল স্যার তাঁকে চিঠি লিখে কৃপাসিন্ধু স্কুলে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৭০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন, নকশাল পন্থীদের বাড়-বাড়ন্তর ছাপ বুধখালিতে এসে পৌঁছোয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্তাল অবস্থার মধ্যেই বুধখালির মানুষেরা অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমেরিকার চন্দ্রজয়ের কাহিনি এবং তথ্যচিত্র উপভোগ করতে পিছুপা হয় না। চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখার বিষয়টি নয়নচাঁদের মধ্যে দাগ কেটে যায়। কারণ নীল আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে আরো দু'জন থাকলেও তাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তিনি

প্রথম পদার্পণ করেছিলেন বলে। আসলে মানুষ সবসময় প্রথমকেই মনে রাখে। তবে আমেরিকা বুর্জোয়া তন্ত্রের প্রতীক। তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশকে আয়ত্তে রাখতে চায়। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন। এই ভাবনা নয়নদের স্কুলের নতুন স্যার সাধন দত্তের। তিনি নকশালপন্থী হয়ে আজ বহুদিন হল নিরুদ্দেশ। বুর্জোয়া তন্ত্রের প্রতীক আমেরিকার চন্দ্র অভিযানের বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে উৎসাহের প্রবণতা নিয়ে নয়নচাঁদ প্রশ্ন তোলে অমলেন্দুবাবুর কাছে। তিনি যে উত্তর দেন তাতে নয়নচাঁদ আরও সমৃদ্ধ হয়—

> *"আমাদের আমেরিকা-রাশিয়া দেখলে চলবে কেন? মানুষ চাঁদে গেছে। অজানাকে জেনেছে। নজরুলের কবিতাটা পড়োনি, থাকব না তো বদ্ধঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে.. মাটির তলায় সমুদ্রের গভীরে কী আছে জানতে হবে, মহাকাশের রহস্যও বুঝতে হবে। আমেরিকা কি নলেজকে চেপে রাখতে পারবে? নলেজ কখনো চাপা থাকে না। বাক্সবন্দী থাকে না নলেজ।"*[৭০]

জীবনের প্রকৃত সত্য হল জানার কোনো শেষ নেই। নয়নচাঁদের সমগ্র পৃথিবীটাকে জানার ইচ্ছে তৈরি হয়। মণিলাল স্যারের টেলিস্কোপটি নয়নের সামনে সেই জানার পরিধিকে বৃদ্ধি করল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির ডামডোলের মধ্যে নয়নচাঁদের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়। সে সামগ্রিক ভাবে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করার পর মণিলাল স্যারের পরামর্শে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়। ইতিমধ্যে নয়নচাঁদকে নিয়ে গণমাধ্যম এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় সমাজ ব্যবস্থার রূপকে তুলে ধরে। আসলে প্রচারই জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। ফলে হরলিক্সের মতো কোম্পানি নয়নচাঁদকে দিয়ে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে চায়। কিন্তু নয়নচাঁদ বা তার পরিবারের কাছে সমস্ত বিষয়টিই সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিম্ন শ্রেণির মানুষগুলিকে শোষণের একটি দিক এখানে ফুটে ওঠে। মণিলাল স্যারের ইচ্ছেমত নয়নচাঁদ স্কলারশিপ সহ অঙ্কে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়। মণিলাল স্যার আসলে নয়নচাঁদের মধ্য দিয়ে বাঁচতে চান, নতুন রহস্য জানতে চান, কারণ—

> *"... ম্যাথমেটিক্স ইজ মাদার অব সায়েন্স। স্যার, বলেছেন, অঙ্কে আমার মাথাটা ততটা ভালো বুঝি না, কিন্তু খুব বুঝতে শখ হয়। আমি তোকে গ্রহ তারা চিনিয়ে দিয়েছি, তুই এবার বোঝা কেন গ্রহ তারা, কেন তুই আমি? কেন এ জীবন? কেন রবিঠাকুর বলেন, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়? এই যে বন্ধনে গড়া মহাবিশ্ব-এর মধ্যে মুক্তি আবার কী? মুক্তি বলে কি কিছু আছে?*

সব প্রশ্নের উত্তর ফিলোজফি দিতে পারে না। ফিলোজফি হল একটা বক্তব্য। ম্যাথমেটিক্স হল প্রুফ্।''[৭১]

অসীমের রহস্য সন্ধান করতে চেয়েছিলেন মণিলাল স্যার। কিন্তু সেটা নয়নচাঁদের মাধ্যমে। নয়নচাঁদের সামনে কলকাতার আদব-কায়দা নতুন বিশ্ব গড়ে দেয়। সে লক্ষ করে, তাদের মত প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে যারা কথা বলে তাদের দলে ভিড়তে মন সায় দেয় না। কারণ তাকে আকাশ ছুঁতে হবে, স্কলারশিপের টাকা জমিয়ে খড়ের ঘরে টিন দিতে হবে। জীবনটাকে নয়নচাঁদ অন্যভাবে দেখেছে। একমুঠো খাবারের জন্য তার পরিবারকে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে সেটা সে জানে। ঘরামির কাজ করা বাবা পুড়ে যাওয়ার পর তাকে আর কেউ কাজে নেয়নি। অগত্যা মনসার পালা গানে ভূত সাজার পাঠ করে পেট চালাতে হত। এই নির্মম সত্যকে নয়নচাঁদ ভুলে যেতে পারেনি। স্কলারশিপের টাকা বাঁচিয়ে বাড়িতে পাঠানোই তার লক্ষ। তাই মার্কসীয় পন্থার হ্যান্ডবিল তার লেখার খাতায় পরিণত হয়। দারিদ্র্য আর কঠিন অসুখের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে নয়নচাঁদ কলেজে সকলের নজরে আসে। নয়নের মধ্যেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার, নিজের সূত্র আবিষ্কার করার আশা জন্ম নেয়।

আমেরিকায় গবেষণার কাজ নিয়ে পাড়ি দেবে নয়নচাঁদ। নয়নের মা-বাবা, মণিলাল স্যার এবং কৃপাসিন্ধু স্কুলের দু'জন মাস্টার মশাই এসেছেন নয়নকে বিদায় জানাতে। নয়নের বাবার অজানা জগৎ-জীবন সম্পর্কে বক্তব্য আসলে সন্তানকে কোল ছাড়া করার যন্ত্রণা থেকেই উঠে আসে—

"ইস্কুল মাস্টারিটা করলেই তো পারতিস বাপ, কেন যাবি এতদূর?

নয়নের বাবা প্রায় হতভম্ব। উড়োজাহাজে চেপে বিলেত যাবে ছেলে? আমেরিকা দেশ বিলেত দেশের চেয়েও নাকি দূরের দেশ। নারদমুনি ঢেকিতে চেপে স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরতেন। ছেলেটাও নারদমুনি হয়ে গেল পেরায়। হে শিব মহাদেব, কী তোমার লীলা বুঝি না গো কিছু। ছেলেটাকে ফিরিয়ে এনে দিয়ো। ছেলে নাকি বড় বড় কলেজের মাস্টার হবে। তখন নিশ্চয়ই গাঁয়ে থাকবে না। শহরের সব উঁচু-লম্বা বাড়িতে থাকতে হবে। ওখানে কি ছাগল পোষা যায়? হাঁস-মুরগি?''[৭২]

যে স্বপ্ন নয়নচাঁদ দেখেছিল সে স্বপ্ন পূরণের পথে পাড়ি দেয় সে। অনন্যাও তার সঙ্গী হয়। অনন্যা রকেটের গতিপথ নিয়ে আর নয়নচাঁদ দুই নীহারিকার মধ্যবর্তী পদার্থ নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করে। অনন্যা নয়নের প্রতি দুর্বল থাকলেও দু'জনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের জায়গাতেই থাকে। কারণ

নয়নচাঁদের অসুখ তার যৌবনকে উপভোগ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনন্যা আমেরিকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে। অনন্যা সে দেশে থেকে চাকরি করার কথা ভাবলেও নয়নচাঁদ গবেষণার শেষে দেশে পাড়ি দেয় টাটা ইনস্টিটিউটে চাকরির সুযোগ পেয়ে। নয়নচাঁদ পুণেতে ফিরে আসে। নতুন নতুন গবেষকদের প্রস্তুত করতে থাকে। দেশের হয়ে কাজ করতে তার নতুন উদ্যমে পথ চলা শুরু হয়। অনন্যার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করে নয়নচাঁদ। জানতে পারে আমেরিকার নতুন নতুন দিগ্বিজয়ের কাহিনি। কিন্তু অনন্যার ব্যক্তিগত জীবন সুখের হয়ে ওঠে না। মানীর সঙ্গে অনন্যাকে এক করে ভাবতে শুরু করে নয়ন। কারণ দু'জনেই স্বামীর দ্বারা প্রহৃত। শুধু তাদের প্রেক্ষিতটা আলাদা।

অন্যদিকে মণিলাল স্যার নয়নচাঁদের ভবিষ্যৎ গড়তে সফল হওয়ার পরে আরও নতুন উদ্যমে মহাকাশকে নিয়ে মেতে থাকতে শুরু করেন। বিজন ভট্টাচার্য নামে গণবিজ্ঞান মঞ্চের একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাদের কাজকর্ম মানুষকে বিজ্ঞানের জগৎ সম্পর্কে পরিচিত করানো এবং সমস্তরকম কুসংস্কারকে দূর করা। মহাকাশের রহস্যব্যাখ্যায় বিজন মণিলাল স্যারের সঙ্গে যোগ দেয়। আসলে ভারতবর্ষে যুক্তিবাদিতার দিকে এগোনোর চিত্র গণবিজ্ঞান মঞ্চের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। আসলে সময় বহনের চিত্র ধরা পড়ে বিজনদের কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। কারণ তারা চায়—

> *"আমরা স্যার আগামী প্রজন্মকে আকাশ দেখাব, এই যে ম্যাটেরিয়াল স্কাই। এদের মধ্যে কোথাও ওলাবিবি মনসা-শনি ঠাকুর নেই। আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে। প্রকৃতি আমাদের মনুষ্য জন্ম দিয়েছে, সেই জন্ম সার্থক হয় মানুষের কাজ করে। ভণ্ড গুরু-সাধুদের সেবা করে নয়, চাদর চড়িয়ে কিংবা দুধ ঢেলে না।"*[৭৩]

মণিলাল স্যার বিজনদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু ঈশ্বর বিরোধী কর্মকাণ্ড তিনি প্রচার করতে নারাজ। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী কোনো সত্ত্বা রয়েছে। তাই নাস্তিকতাকে প্রচার করার মধ্যে তিনি থাকতে চাননি। অসীম জগতের প্রতি তাঁর আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে তিনি অন্তরে স্থান দিয়ে আরও একটা নয়নচাঁদ খুঁজতে চেয়েছেন। কিন্তু বুধখালির স্কুল দ্বিতীয় নয়নচাঁদ খুঁজে পায়নি বহুদিন। মণিলাল স্যারের অবসরপ্রাপ্তির পর ভোলা মিদ্যের ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় নয়নচাঁদ হওয়ার লক্ষণ দেখেছেন তিনি। কিন্তু সুবল দ্বিতীয় নয়নচাঁদ হতে চায় না। কারণ, নয়নচাঁদের ধৈর্য ছিল। সে পেরেছে। কিন্তু সুবলের সে ধৈর্য নেই। আর বর্তমান যুগের নতুন নতুন

চাকরির সুযোগ রয়েছে। সুবল নিজের বাবা-মাকে সুখে রাখতে চায়, স্বাচ্ছন্দ দিতে চায়; যা করতে পারেনি নয়নচাঁদ।

পুণেতে টাটা ইনস্টিটিউটে চাকরি করার সময় ১৯৯৫ সালে ভারতে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয়। আর সে বছরই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়। মণিলাল স্যারকে দেওয়া কথা নয়নচাঁদ রাখতে চায়। যে যে শহরে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে সেখানে নয়নচাঁদ তার স্কলারদের ডেটা সংগ্রহের দ্বারা সূর্যের ব্যাস মাপতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হৃদয়ের যন্ত্রণা তার প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে তার তৈরি গণনা পদ্ধতিতে সূর্যের যে ব্যাস নির্ণয় করা হয় তা আমেরিকার একটা মেথডের মাপা ব্যাসের সঙ্গে প্রায় মিলে যাওয়ায় নয়নচাঁদ তার গণনায় সফল হয়। তার সৃষ্ট গবেষণা এন সি জি মেথড নামে প্রতিষ্ঠা পায়। মণিলাল স্যারের স্বপ্ন পূরণ হয় ঠিকই কিন্তু নয়নচাঁদের অনুপস্থিতিতে। সুবল তাই নয়নচাঁদ হতে চায় না। আসলে নবীন প্রজন্মের ধৈর্যহীনতাও প্রকাশ পায় সুবলের মধ্যে। সে বলে—

> *"... এখন কম্পিউটারের যুগ। চাকরি করব। কগনিজেন্ট ইনফোসিস, গুগুল...। অনেক মাইনে।"*[৭৪]

কীর্তিমান হওয়ার দিকে কোনো ঝোঁক নেই সুবলের। সে মণিলাল স্যারের কথামতো বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সন্ধানে আগ্রহী নয়। সুখ স্বাচ্ছন্দকে উপভোগ করা, অর্থবান হওয়া বিষয়গুলি নবপ্রজন্মের লক্ষ। তাদের অজানার রহস্য উন্মোচনে আগ্রহ কম থাকায় ভারতের মতো দেশে নয়নচাঁদ কচিৎ জন্ম নেয়। সুবলের মধ্যে নয়নচাঁদের বৈশিষ্ট্য থাকলেও সে নয়নচাঁদ হতে চায় না। কারণ, সুবলের বক্তব্যে স্পষ্ট—

> *"কী কর্তব্য করেছে এন সি জি? সংসারের প্রতি ডিউটি করেছে? ওর বাবা যাত্রায় ভূত সেজেছে, ওর মা পরের বাড়ি মুড়ি ভেজেছে— উনি যখন চাকরি করছেন তখনো। বাড়িটাও পাকা করেননি। কেবল আকাশ-আকাশ। কী দিয়েছে আকাশ? আমি স্যার প্র্যাকটিকাল। আমি আকাশ দেখি না, পৃথিবী দেখি।"*[৭৫]

সুবল জানা পৃথিবীটার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চেয়েছে। সে চেয়েছে অর্থ-সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে যা ভোগবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। তার সীমাবদ্ধতা মাটির পৃথিবীর জানা গণ্ডির মধ্যে। অজানাকে জানার বা অসীমের সন্ধানী সে হতে চায়নি। তাই মণিলাল স্যার তাঁর পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপটি বিজনের হাতে তুলে দেন। মণিলাল স্যারের বয়স হয়েছে। তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে নতুনকে। সে নতুন নয়নচাঁদের মতো না হলেও জীবন তো গতিময়। সেই গতিময়তার

দিকে এগিয়ে যাওয়াই নতুন ভাবনার পরিচায়ক। অজানার সন্ধানী হয়ে উঠুক মানুষ এই তাঁর ইচ্ছে। মানুষের জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া, নতুন অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া যাতে স্তিমিত না হয়ে যায় তাই তিনি তাঁর টেলিস্কোপটি অন্য হাতে অর্পণ করে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের চলমানতা এভাবেই আবর্তিত হয়। অতি সাধারণ পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপটি আসলে তার জীবদ্দশায় মানুষকে খুঁজে চলে। যে মানুষ তার মধ্য দিয়ে মহাকাশকে লক্ষ করে তার অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলবে। আসলে মানুষের অস্তিত্ব বিচিত্র। তার চলমানতাও বিচিত্র। মানুষের গণ্ডির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তারা ভিন্ন স্বরেও কথা বলে। উপন্যাসটিতে মণিলাল স্যার, নয়নচাঁদ, সুবল এই তিন ব্যক্তি তিন সময়ের স্বরকে বহন করেছে। যে স্বপ্ন মণিলাল স্যারের চোখে ছিল তা নয়নের চোখে সার্থক হয়েও তিমিরেই বিলিয়মান হয়ে যায়। আর সুবল সেই উত্তরাধিকার পেলেও সে তা বহন করতে নারাজ। আমরা এযুগের মানুষেরা কোথায় যেন নিজেদেরকে একটা সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে নিতে চাই। সেই স্বরই বহন করে সুবল। কিন্তু টেলিস্কোপটি তার যাত্রায় ক্লান্ত হয় না। সে মানুষ খোঁজে, তাকে দেখার মানুষ। তার রূপকে সার্থক করার মানুষ। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী এভাবেই মানুষ খোঁজেন। সমাজের বুকের অন্য ধারার মানুষ। যে মানুষ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে চায় না সেই মানুষ খোঁজার কাজে ঔপন্যাসিক টেলিস্কোপ ধরেন। নতুন স্বর অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে যান। পরবর্তী উপন্যাসে কোন মানুষের সন্ধানী হবেন ঔপন্যাসিক, সে পথে আমরা যাত্রা করব।

৭

'দুনিয়াদারি' উপন্যাসটি ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু একেবারে অন্য পটভূমির। সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক খেটে খাওয়া মানুষের মানবিকতার পরিচয়বাহী নিদর্শনের আখ্যান এই উপন্যাস। আকিল মুনশি নামের বসিরহাট এলাকার এক প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র মানুষের মানবিক হয়ে ওঠার কাহিনি দার্শনিক মানসিকতায় তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। আকিল সব মানুষের মত নয়। সে চায় এই পৃথিবীর দুনিয়াদারিতেই বেহেস্তের সুখ অনুভব করতে। সাধারণ চাষ-আবাদ, তার ভ্যান চালানো, আর স্ত্রী সালমা ও দুই মেয়ে সাইমা ও রাইমাকে নিয়ে রোজদিনের জীবন-যাপনের সুখ পেতে চায় আকিল। স্ত্রী সালমার সঙ্গে তার দশ বছরের সাংসারিক জীবন। দুই কন্যা সন্তান হলেও সে পুত্র সন্তানের আশা করেনি। বরং কন্যাসন্তান কম কিসে?— এই ভাবনা তার মাথায় এসেছে। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের সমান

তালে এগিয়ে যাওয়াকে বাহবা দেয়, সে বিষয়টি আকিলের জানা। ফলে স্ত্রী এবং মেয়েদের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব নেই। আল্লা তাকে যতটুকু দিয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট। ধর্ম সম্পর্কে তার অধিক জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লার কাছে এজন্য সে ক্ষমাও চেয়ে নেয়। আর চায় মানুষের মতো মানুষ হয়ে সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে। একদিন হাটে গরু কিনতে গিয়ে এক পাগলের করুণ অবস্থা দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে আকিল। পাগলটার গায়ে এক তেলেভাজাওয়ালা তেল ঢেলে দেয়। কারণ পাগলটি হাত বাড়িয়ে তেলে ভাজা নিতে যাচ্ছিল। বাড়িতে এনে লোকটির সেবা শুশ্রুষা শুরু করে আকিল। পাগলটির ধর্ম ও জাতপরিচয় না জেনেই আকিল শুধু মানবতার খাতিরে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে আকিল জানতে পারে পাগলটি হিন্দু। পাগলকে তো আর 'পাগল' বলে ডাকা যায় না, তাই আকিল তাকে 'গোঁসাই' বলে সম্বোধন করে। সালমা স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ। স্বামীর সেবা ব্রতে সে সামান্য আপত্তি করলেও পরে নিজেও যোগ দেয়। কিছুদিন যত্ন করার ফলে পাগল গোঁসাই সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর গ্রামের রিপোর্টার মনসুর নিজের খবর তৈরির মুনাফার জন্য আকিলের সেবাধর্মকে কাজে লাগিয়ে কাগজে খবর ছাপায়। আকিলকে নিয়ে গোঁসাইকে বাড়ি ফেরানোর উদ্দেশ্যে থানায় হাজির হয়। থানায় রিপোর্ট করার পরেই আকিল হাটে লটারি কেনে। সেই লটারিতে তার এক লক্ষ টাকাও লাভ হয়। আকিলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় আল্লা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এ পুরস্কার দিয়েছে। এর পর মনসুরের সহযোগিতায় 'আপনজন' চ্যানেলের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এরপর আকিল সমাজসেবীর তকমা পেতে থাকে। ঘটনাক্রমে গোঁসাইয়ের মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। গোঁসাইয়ের মেয়ে এসে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার সময় আকিলকে নিখোঁজের পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ-হাজার টাকা আর আকিলের বউকে একটি সোনার চুড়ি উপহার দেয়। আকিলের মনে ন্যায়-অন্যায় বোধের জন্ম নেয়। সে গোঁসাইকে শুধু বিনা স্বার্থে সেবা করার জন্য ঘরে এনেছিল কিন্তু পরিণামে সে অনেক কিছু পেয়ে যায়। ঘটনাক্রমে আর একদিন হাটে গিয়ে ইবলিশ নামে নিজেকে পরিচয় দেয় এমন এক পাগলকে সে বাড়ি নিয়ে আসে। অনেকটা লোভ এড়াতে না পেরে। কিন্তু ইবলিশ নিজেকে শয়তানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতে চায়। গোঁসাইয়ের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। পাড়ায় আকিলের পরিচয় এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়। সেই লোভে আকিল আবার লটারি কাটে। কিন্তু এবার আর লটারি তার ভাগ্যে জোটে না। এক সময় ইবলিশকে আকিলের বোঝা মনে হয়। সে মনে মনে চায় ইবলিশকে তার বাড়ির লোকেদের কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাই থানায় গিয়ে ওসিকে সে জানিয়ে আসে ইবলিশের একটা গতি করে দিতে। যখনই আকিল নিজের ঘাড় থেকে পাগলদের নামিয়ে দিতে চায়— সে সময় বিডিও ম্যাডাম

অনাদি অনন্ত নামের এক পাগলকে এনে কিছু দিনের জন্য রেখে যান, সঙ্গে খরচ বাবদ পাঁচশ টাকাও দেন। অনাদি অনন্ত এক পাগল কবি। প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সে আরও পাগল হয়ে যায়। আকিল ঘোর সমস্যায় পড়ে। সে তার বাড়িটাকে পাগলদের আশ্রয়স্থল বানাতে চায়নি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে তার সামনে এক ব্যক্তির কাছ থেকে হাতছানি আসে। তিনি টাকা যা লাগে দেবেন। কিন্তু আকিল যদি এরকম অসহায় পাগলদের সেবা করার মতো মহৎ দায়িত্ব কাঁধে নেয় তবেই। যে আকিল সামান্য-দুনিয়াদারি করতে চেয়েছিল, সেই আকিলের ঘাড়েই আল্লা গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। পাগলদের সেবা করে সমাজসেবী আখ্যা পেলেও একসময় সে আল্লাকে বলেছে আর না, এইবার সে সাধারণ জীবন-যাপন করতে চায়। কিন্তু পরমকৃপাময় তার সামনে আরও বড় দায়িত্ব নেওয়ার ভার অর্পণ করল। না চেয়েও আকিল সেই দায়িত্ব নেওয়া থেকে পিছিয়ে আসতে পারেনি। যে বিশ্বায়ন মানুষকে সংকীর্ণ করে তোলে, সে বিশ্বায়নের ছাপ আকিলের ওপর পড়েনি। তাই সে জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে নিজের ভাবকে তুলে ধরতে সক্ষম।

উপন্যাস কাহিনির বিবরণের বাইরে আকিল মুনশির ব্যক্তি চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মানসিক স্তরের ধারাবাহিকতা। ঔপন্যাসিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চিহ্ন বহু জায়গায় এঁকেছেন। আকিল মুনশি সাধারণ একজন খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে অসাধারণত্বের পরিচয়বাহী। উপন্যাসের শুরু থেকেই আকিলের মধ্যে আমরা মনুষ্যত্বের পরিচয় পাই। সম্প্রদায়গত দিক থেকে আকিল ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়েও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে গোঁড়ামি মুক্ত। তার মতে মানুষের কাছে পৃথিবীতে বসবাসের অধিকারই প্রধান। পৃথিবীর মাটিতে ভালো কাজে বেহেস্তে যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই। সাধারণ সুখই তার কাছে কাম্য। ঔপন্যাসিক আকিলের মনের কথাকে কয়েকটি লাইনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন—

> *"আকিলের মনে হয়, রোজ কি আর বিরিয়ানি-কোর্মা ভালো লাগবে? ওখানে কি ধনে গাছ হয়? ধনেপাতা খাবে লাউ দিয়ে, তারপর কাঁচা ধনে বেটে নতুন আলুর তরকারি। পুকুরে একটু বঁড়শি, দু'টো পুঁটি। মেয়েটা আধো-আধো কথা বলবে, আব্বা-আব্বা করে কোলে উঠবে বলে হাত বাড়াবে, গরুটা আদর খাবে বলে গলা বাড়িয়ে দেবে, ... জন্নতে এ-সুখ নাই। দুনিয়াদারিতে সুখ হ'ত জন্নতের চেয়েও বেশি, আল্লা যদি মানুষগুলোকে একটু ভাল করে দিত!"*[৭৬]

আসলে আকিল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারে না। সময় পেলেও সে এক ওয়াক্ত ছাড়া পড়ে না। উপরন্তু নামাজ পড়ার সময় প্রায়ই ভুল করে। রোজার সময় অনেক সময়ই রোজা ভেঙে গেছে

ঠিকে কাজের বাড়ির গরম ভাতের গন্ধে। ফলে সে নিজের সম্পর্কে জানে। আল্লার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস যে আল্লা তার করুণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার ওপর ঈশ্বরের অপার করুণা রয়েছে কারণ, সে কখনো মানুষকে ঠকায়নি। সংসারের অভাব-মেটাতে আকিল বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। জমিতে চাষ ছাড়াও তার একটি ভ্যান রয়েছে। সেই ভ্যান সে নিজে যখন না চালাতে পারে তখন ভাড়া খাটায়। স্ত্রী সালমাও সংসারী। মানুষের বাড়ির ডাল, গম যাতায় ভাঙিয়ে দুটো পয়সা রোজগার করে। আকিলের মেয়ে সাইমা-রাইমারও বাচ্চা বয়সের জেদ নেই। ফলে সংসারটিকে আল্লা তাকে গুছিয়ে দিয়েছেন সে বিষয়ে আকিল সচেতন।

বাস্তবতা সচেতন আকিল তার ছোট্ট অভাবের সংসারে পাগল গোঁসাইকে নিয়ে উপস্থিত হয়। সালমা আকিলের এই কাজকে প্রথমে মেনে না নিলেও পরে নিজেই স্বামীর সঙ্গে সেবাধর্মে মনোযোগ দেয়। মুসলিম সমাজের বেশ কিছু ভাবনা থেকে বাইরে বেরিয়ে তারা নিজেদের একটা জগৎ তৈরি করেছে। আকিল আর সালমার কাছে দুনিয়াদারিই ভালো। বেহেস্তের নামাজ আকিলের পড়া হয় না। রোজার সময় রোজা ভেঙে যায়। ফলে দোজখের দিকে পা- বাড়িয়ে রেখেছে একথা আকিল জানে। কিন্তু গোঁসাইয়ের সেবা করে 'নেক' কাজ সে করতে চায়। গোঁসাইয়ের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে তার নিরামিষ খাবার পর্যন্ত আকিলের নজরে রয়েছে। কতটা স্বচ্ছন্দে রাখা যায় গোঁসাইকে সে বিষয়ে আকিল ভাবে। গোঁসাইয়ের পোড়া জায়গাগুলি ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও কিছুটা উন্নত হয়। আকিল যে গোঁসাইকে চিরটাকাল নিজের কাছে রেখে দিতে চায় তা নয়। গোঁসাইয়ের স্মৃতি ফিরে এলে ঠিকানা জেনে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পূরণ করতে চায়। আকিলের মনোবাঞ্ছা পূরণের পথকে অগ্রসর করল মনসুর। 'চন্দ্রকেতু বার্তা' নামের খবরের কাগজে আকিলের মহানুভবতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনই আকিলের ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যম হয়।

আকিল-সালমার সংসারের চিত্রে ঔপন্যাসিক একদিকে মুসলিম সমাজের চিত্রকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র গ্রামবাংলার অলিগলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির ছায়া মুসলিম সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। একটি চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন আকিলের জমিতে খেসারির ডাল চাষ প্রসঙ্গে। বিষয়টি ঠিক এরকম—

> *"বাঙালির কাছে যেটা ধান, আরবের বেদুইনদের কাছে তেমনই ছিল খেজুর। সাধারণ বেদুইনদের ভাগ্যে ভাত ছিল না। লুঠ করে আনা কদাচিৎ গম, কিংবা*

পশুমাংস। দুধও পেত না তেমন। তাদের স্বপ্ন ছিল পেট-ভরে খেজুর আর জল খেতে পাওয়া। এই দু'টি আদরের জিনিসের নাম আল-আসওয়াদান। ... এত কথা এল একঘটি খেসারির ডাল প্রসঙ্গে। চোকলা-সমেত একঘটি ডাল সালমা আলাদা তুলে রাখে। বলে, সাদোয়ানের ডাল।''[৭৭]

পাগল গোঁসাইকে আশ্রয় দিয়ে পাড়ার মধ্যে আকিলের আলাদা পরিচয় তৈরি হয়েছে। গোঁসাই হিন্দু বলে অনেকেই তার এই কাজকে প্রশ্রয় দেয়নি। গোঁসাই আকিলের উঠোনে একটি তুলসী গাছ লাগিয়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকে শুধু প্রয়োজন মেটাবার জন্য। কিন্তু গোঁসাইয়ের তুলসী গাছ লাগানোর কারণ তার ধর্ম বিশ্বাস। প্রতিবেশিরা এই দৃশ্য গ্রহণ করতে পারে না। তারা গোঁসাইকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার পরামর্শ দেয় আকিলকে। কিন্তু আকিলের লটারিতে একলক্ষ টাকা পাওয়ার পর চিত্র কিছুটা পরিবর্তন হয়। আকিল তার দুনিয়াদারিতে আরো মনোযোগী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। গোঁসাইকে সে 'পয়া' লোক বলে ভাবে। গোঁসাইকে বাড়িতে আনার পর থেকেই একের পর এক ভালো ঘটনাগুলো আকিলের সংসারে ঘটেছে। তাই আকিল তত্ত্ব কথা ভাবে—

"জীবসেবা-ইশিব সেবা, কত জায়গায় লেখা রয়েছে, আকিল দেখেছে। গোঁসাই নিশ্চয়ই আল্লার পাঠানো লোক। আকিলকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছে। পরীক্ষায় পাশ করেছে, তাই মেডেল দিয়েছে।''[৭৮]

আল্লা বা ভগবানের ওপর অগাধ বিশ্বাস থেকে আকিল সেবাধর্মে ব্রতী হয়েছিল। সেই সেবা ধর্মই তাকে অর্থের জোগান দেওয়ার সঙ্গে সমাজে সম্মানী ব্যক্তিও করে তুলেছে। তবে গোঁসাইকে নিজের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আকিল আত্মতুষ্টি লাভ করতে চায়। থানায় খবর দেওয়ার বিষয়টি কাজে আসে। গোঁসাইয়ের মেয়ে তুলসীরানির করা মিসিং ডায়ারির মাধ্যমেই গোঁসাই নিজের পরিবারকে ফিরে পায়। তুলসীরানির বিবৃতি থেকে জানা যায়— গোঁসাইয়ের ছেলেরা সম্পত্তির ভাগের জন্য গোঁসাইয়ের ওপর অত্যাচার করত। গোঁসাই অত্যাচার শারীরিক ভাবে সহ্য করলেও মানসিক দিক থেকে সহ্য করতে পারেনি। মানসিক আঘাতের জন্যই তুলসীরানি বাবাকে নিজের কাছে রেখেছিল। এক সময় কাউকে না জানিয়েই গোঁসাই ঘর ছাড়া হয়। গোঁসাইকে তুলসীরানির হাতে তুলে দেওয়ার পর্বে আকিলের ব্যক্তিত্বের আরও একটি পরিচয় উঠে আসে। আসলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলো অনেক সময় প্রলোভনের বসে পড়ে যায়। আকিলের ক্ষেত্রেও তাই হয়। গোঁসাইয়ের মেয়ের টাকার ওপর থেকে সে লোভ ত্যাগ করতে পারেনি। আবার

গোঁসাইয়ের মেয়ের দেওয়া সোনার চুড়িটি সালমাকে দিলেও আপত্তি করেনি। বরং মনে মনে কল্পনা করেছে তার লাভের হিসেব। আকিল লাভের কথা ভেবে তার সেবাকর্ম করেছে এমনটা নয়। কিন্তু ভালো কাজের ফল যে সে পেয়েছে সে বিষয়ে আকিল ওয়াকিবহাল—

> *"খালি কি লটারির টাকা? নগদ পাঁচ হাজার, সেই সঙ্গে একটা সোনার চুড়ি। এসবের লোভ তো করেনি, এমনি এমনিই এসেছে। লোভ করতে নেই। হাটের কোণায় একটা মন্দির আছে, ওখানে মাঝে-মাঝে কথকতা হয়, আকিল দাঁড়িয়ে শুনেছে দু'চারবার। একজন বলেছিল, কর্ম করে যাও। কর্মের ফলাফল আশা করতে নেই।"*[৭৯]

'গীতা'র নির্দেশিত কর্মফলবাদের জ্ঞান আকিল ধারণ করেছিল। কিন্তু মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে করতে কখন যে তার মধ্যে স্বার্থের চিহ্ন প্রকাশ পায় তা সে নিজেও অনুভব করতে পারে না। আর এভাবেই আকিল দ্বিতীয় পাগল ইবলিশকে বাড়িতে নিয়ে আসে। ইবলিশের সঙ্গে গোঁসাইয়ের বিস্তর পার্থক্য। তবুও ইবলিশকে আকিল আশ্রয় দেয়। গোঁসাইকে বাড়িতে রাখার পর আকিলের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্তরেও উন্নতি ঘটে। আসলে অর্থের ওজনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্মানও ওঠানামা করে। আকিলও সেটা বুঝতে পেরেছিল। যার ফলে দ্বিতীয়বার পাগলকে বাড়িতে নিয়ে আসার পথে দ্বিতীয়বার লটারির টিকিটটাও কেটে ফেলে। লটারির টিকিটটা শ্রীকৃষ্ণের ছবিতে ছোঁয়া লাগিয়ে নিতে ভুল হল না আকিলের। আসলে আকিল ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সে ঈশ্বর সম্প্রদায়গত ঈশ্বর নয়। কিন্তু এবারে লটারির টিকিট কাটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইবলিশের আচরণ আকিলের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সে ইবলিশকে বিতাড়িত করার কথা ভাবছিল। ইতিমধ্যে মনসুরের দৌলতে আকিলের ভাগ্যচক্র পরিবর্তনের খবর আসে। 'আপনজন টিভি' চ্যানেলের পক্ষ থেকে আকিলকে সম্মাননা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক মানবিকতার কদর বিপন্নতার স্তরে পৌঁছেছে। সেই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী আকিলের সেবাপরায়ণ মানসিকতা সত্যি আশ্চর্যজনক। আকিলের পুথিগত জ্ঞান নেই তবে তার মধ্যে মানবিকতার জ্ঞান রয়েছে প্রচুর। সে দুনিয়াদারির হাল হকিকত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ফলে সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয় আকিল সেই কাজই করে। ইবলিশের ওপর রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইবলিশকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যই আজ আকিল জনগণের সামনে সম্মানীয় ব্যক্তি। একজন প্রকৃত সমাজসেবী। আকিলের মধ্যে একজন প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। যে অশিক্ষিত হয়েও মানবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে ধর্ম ও জাতির

উর্ধ্বে। 'আপনজন' সম্মান গ্রহণ করার সময় আকিল মঞ্চে উঠে বক্তব্য দেওয়ার সময় সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ায় তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আকিলও এ সময় মিডিয়া পরিচালিত মানসিকতার বশবর্তী হয়। তার মননদর্শনে বিষয়টি প্রকাশিত হয়—

> *"মনসুর বলে দিয়েছিল, কোনও পুরস্কারের লোভে আমি এটা করিনি। সেটাই বলে দিল। কিন্তু এটা মনের কথা নয়। সত্যিকথা নয়। মিথ্যে। ওখানেই হাততালি পড়ল। তারপর বলতে যাচ্ছিল, সবই আল্লাহতালার লীলা। আল্লাহ বলতে গিয়েও বলল না, বলল ঈশ্বর। সবই ঈশ্বরের লীলা। তারপরই বলে ফেলল, ঈশ্বর বাস করেন এইখানে। বুকের ওপর দু'হাত রাখল আকিল। আবার হাততালি।"*[৮০]

বিশ্বায়নের যুগের মন, মানসিকতা মিডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আকিলও সে প্রভাব থেকে বাদ পড়েনি। আকিলের ভিতরে অন্য কথা চললেও সে সর্বসমক্ষে যা বললে জনগণের মন জয় করা যায় সে কথাই বলেছে। কারণ, হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদের সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে জায়গা করে নিতে গেলে আল্লাহ নয়, ঈশ্বরের অবস্থিতির কথা বলতে হবে সে কথা আকিল জানে। আকিলের উপস্থিত বুদ্ধিই তার সম্মানের আরও একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে পাড়ায় তার সম্মান বেড়ে যায়। আকিল পরিণত হয় আকিল মিঞায়। কিন্তু ইবলিশকে বেশিদিন বাড়িতে রাখতে আকিলের মন সায় দেয় না। কারণ সে একটি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন উপভোগ করতে চেয়েছিল। পাগল পোষা আকিলের উদ্দেশ্য নয়। পাগল পোষার দরুণ ঈশ্বর তাকে অনেক দিয়েছেন। গোঁসাইয়ের বিদায় হওয়ার পর ইবলিশের আগমন। আকিলের পরিচয় গণমাধ্যমের দ্বারা বিস্তারিত হয়েছে। আকিলের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে এবং সে সমাজসেবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সমাজসেবী হিসেবে একবার পরিচিতি তৈরি হলে সে ব্যক্তির কাছে প্রতিনিয়ত সাহায্যের তাগিদ বৃদ্ধি পায়। আকিলের সঙ্গে সে ঘটনাই ঘটল। বিডিও ম্যাডাম এক পাগল কবিকে এনে হাজির করলেন আকিলের বাড়িতে। আকিল এবার পাগল পুষতে নারাজ, ইবলিশের বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগী। এমন সময় বিডিও ম্যাডামের এনে দেওয়া পাগলের উপস্থিতি যেন নিয়তির জটিল জালে আবদ্ধ হওয়াকে নির্দেশ করে। তৃতীয় পাগল নিজেকে অনাদি অনন্ত বলে পরিচয় দিতে চায়। আসলে তার নাম অনন্ত মণ্ডল। কবিতা চর্চা করার স্বভাবের জন্য তার বোহেমিয়ান জীবন প্রেমিকা কাবেরীর সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা পড়তে দেয়নি। উপরন্তু 'কাস্ট' নিয়ে সমস্যার জন্য

বিবাহ বন্ধনে তারা আবদ্ধ হতে পারেনি। অনন্ত মণ্ডলের প্রেমিকা কাবেরী দিদিমণিকে নিয়ে এলেও তিনি অনন্তকে গ্রহণ করতে চান না। এ প্রসঙ্গে আকিলের ব্যক্তিসত্তা জাগরিত হয়। সে বলে—

> *"কর্ম মানে কেবল আহার, মাঠ-ফেরা, আর শোয়া নয়। অন্যের উপকারের জন্যি 'কর্ম' করলি আল্লা-ই বলো আর ভগবান-ই বলো, তিনি খুশি হন, সেটা আমি আমার নিজের জীবনে দেখিচি।'"*[৮১]

আসলে দুনিয়াদারি খুব সহজ বিষয় নয়। সবার দ্বারা সঠিকভাবে দুনিয়াদারি করাও সম্ভব নয়। আকিল জীবনের জটিল সমস্যায় পড়েছে যখন সে পাগল পোষার সুযোগ পেয়েছে তখন। সে পাগলদের জন্য সেবায় নিয়োজিত থাকবে বলে তার সেবা শুরু করেনি। কিন্তু তার সেবা করার ধরনই তাকে একাধিক পাগলের আশ্রয়দাতা করে গড়ে তুলেছে আকিলের পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশে। ইবলিশ এবং অনাদি অনন্তকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই সে ঝামেলা থেকে মুক্তি পায়। সেই মুহূর্তেই এক প্রৌঢ় দম্পতি উপস্থিত হন আকিলের বাড়িতে। ভদ্রলোকটির বাবাও পাগল ছিলেন। মৃত অবস্থায় তিনি বাবাকে খুঁজে পান মর্গে। সেই থেকে মনের মধ্যে ইচ্ছে ছিল মানসিক ভারসাম্যহীনদের জন্য কিছু করবেন। আপনজন টিভিতে আকিলের কাজ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি আকিলের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। তার অনুরোধ আকিল যদি দায়িত্ব নেয় তবে তিনি একটি আশ্রম বানিয়ে দেবেন। এবং যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করবেন তাদের শুশ্রুসার জন্য। আকিল যখন মুক্তি পেতে চেয়েছিল সমস্ত দায়ভার থেকে, সে সময়ই তার সামনে গুরুদায়িত্ব এসে উপস্থিত হল। আকিল বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত। আল্লা তার পরীক্ষা কতভাবে নিতে চান তা আকিল বোঝার চেষ্টা করে। কারণ জীবনের কাছে তার উচ্চাশা ছিল না। সে অতীব সাধারণ মানুষ। সে শুধু চেয়েছিল—

> *"আমি তো ছোটমোট মানুষের মতোই দুনিয়াদারি করতে চেয়েছিলাম, দুটো ভাত, ফুটো না হওয়া টিনের চাল, মেয়ে দুটোর হাসি মুখ। সেটাই আমার বেহেস্ত।'"*[৮২]

একটা সাধারণ জীবনই আকিলের কাম্য। কিন্তু আল্লাহ তাকে অনেক দিতে চান। আকিলের সহজ মনের পরীক্ষাও হয়তো তিনি নিতে চান। তাই আকিলের সামনে আজ কঠিন পরীক্ষা। সেবাব্রতী হিসেবে সে তার আগামী জীবনকে বেছে নেবে না সাধারণ ভ্যানওয়ালা আকিল হয়েই থাকবে। আকিল ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়, যেন আল্লার সঙ্গে চোখ বুজে পরামর্শ করে। মাটির পৃথিবীর পানে তাকিয়ে আকিল আল্লার ইচ্ছেকে বুঝতে পারে। সে রাজি হয়ে যায় নতুন সংগ্রামে পা বাড়াবার

জন্য। এখানেই আকিলের মত নিঃস্বার্থ মানুষের জয়। জীবনকে একমুখীনভাবে দেখতে পাওয়ার জায়গা থেকে সে বহুমুখী জীবনচিত্রের আঙিনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ দুনিয়াদারি তাকে অসাধারণত্বের পরিচয় দেয়। জীবন ক্ষুদ্র ভাবনা, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। আকিল সে সত্যের সম্মুখীন হয়। ফলে জীবন যুদ্ধের নতুন তালিম নিতে আকিল পিছুপা হয় না। এখানেই আকিল মুনশির সাধারণ জীবন অসাধারণত্বের উর্ধ্বসীমায় উত্তরণ ঘটে। আসলে সম্প্রদায়গত সীমাবদ্ধতার গণ্ডি আকিল পেরোতে পেরেছিল বলেই মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মকর্তাকে সে অনুভব করেছিল। পরম ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় বলে আকিলের বিশ্বাস। তাই পূর্ণ মর্যাদায় তার প্রতিবেশীদের সামনে সে আলাদা ভাবে চিহ্নিত হয়। একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আকিল মুন্সির জীবন-যাপনের চিত্রকে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্নমাত্রায় পর্যবসিত করেছেন, যা উপন্যাস সাহিত্যে তুলনারহিত। এবার আমরা এক ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসের দিকে যাত্রা করব। যেখানে মহামায়া চরিত্রের জীবন জিজ্ঞাসা ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত হয়।

৮

‘কথাবলা পুতুল’ উপন্যাসটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় ‘অভিযান পাবলিশার্স’ থেকে। ‘মহামায়া’ নামের একটি উপন্যাস সৃষ্টি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালে। সেই উপন্যাসের কিছু ছায়া ‘কথাবলা পুতুল’ উপন্যাসে পড়েছে। আলোচ্য ‘কথাবলা পুতুল’ উপন্যাসটি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস জগতে অন্যমাত্রা সংযোজন করে মহামায়া চরিত্র নির্মাণে। গল্পবলা বা কাহিনি নির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সবসময় কিছু না কিছু পরিবর্তন এনেই চলেছেন। তাঁর রচিত গল্প কাহিনির বিষয়বস্তু আমাদের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করায়। এই অভিজ্ঞতায় বহুবার তিনি নারীদের নিয়ে বহু কাহিনি উপস্থাপন করেছেন বহু প্লটে, বহু থিমে। নারী চরিত্রগুলিকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী যেভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন তার একটি রূপ ‘কথাবলা পুতুল’ উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মহামায়ার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই উপন্যাসের চিত্র আমাদের সামনে এক নতুন পথ খুলে দেয় যা একুশ শতকের নারীর রূপকে পরিস্ফুট করে। উপন্যাস কাহিনিতে কথা বলে মহামায়া নান্নী এক পুতুল, যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় কথা না বলা পুতুলেরা। উপন্যাস কাহিনিতে মহামায়া কর্মরত মহিলা। কিন্তু কোন শ্রেণির কর্মকর্তা মহিলা সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। মহামায়া বস্তিবাসিনী। সন্তান প্রতিপালনের দায়ে তাকে কর্মসংস্থানে পা বাড়াতে হয়েছে। কোনো উচ্চশ্রেণির বৃত্তিধারী সে নয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রে তার কর্মক্ষেত্র। অর্থাৎ

নানা ধরনের সমস্যা তার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে—

> *"১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সংগঠিত ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিকের সংখ্যা ৪.২ শতাংশ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীর বিপুল কর্মনিযুক্তি ঘটলেও তাদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম। এছাড়া, অভাবের কারণেই নারী শ্রমিকরা আংশিক সময়ের কাজেও নিয়োজিত করে নিজেদের। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিকরা পারিশ্রমিক, কাজের নিশ্চয়তা, ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, নিরাপত্তা— কোনো দিক থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না।'"*[৮৩]

মহামায় এক লড়াইয়ে ব্রতী। তার নিজস্ব বাসস্থান নেই। রেল লাইনের ধারে দাদার বাড়িতে মহামায়া থাকে। ফলে ট্রেনের আওয়াজই তার ঘুম ভাঙার মাধ্যম। হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যদিয়ে মহামায়া সন্তান প্রতিপালনের ধর্মে ব্রতী। কারণ মহামায়ার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে বহুদিন হল। বছর পনেরর মেয়ে সোনালি এখন ক্লাস নাইন আর ছেলে অভি এখন ক্লাস ফাইভ। ছেলের তিন বছর বয়সে স্বামী তাকে ত্যাগ করে গিয়েছে। স্বামী বিহীন সংসারের সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেহবিক্রি করেছে বহুবার। সে বিষয়ে তার শুচিবায়ুগ্রস্ত ভাব নেই। কারণ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই চালের কারবারের লাইনে সে যোগ দিয়েছিল। চালের লাইনের মেয়েদের চরিত্র ঠিক থাকে না এটা জানা সত্ত্বেও মহামায়ার দাদারা কোনদিন বাধা দেয়নি। ফলে চালের লাইনের পাকা কারবারী হতে গিয়ে দালালদের কাছে সে বহুবার দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। শুধু যে চালের লাইনেই মহামায়ার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে তা নয়, দশ বছর বয়সে ধরণীকাকু তাকে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেছিল। মহামায়ার জামাইবাবুও তাকে শরীর ভোগের হাত থেকে রেহাই দেয়নি। কালিমালিপ্ত এই লাইনের মধ্যে থেকেই এক সময় সংসার পাতার হাতছানি আসে। বিয়েও হয় মহামায়ার। মহামায়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহামায়ার শ্বশুর বিয়ের প্রস্তাব দেন, মহামায়া বহু স্বপ্ন নিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করে। মহামায়া ভেবেছিল শ্বশুর যখন সব জেনেশুনে ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তখন তার পূর্ববর্তী জীবন নিয়ে স্বামীর বোধ হয় কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু সব ধারণা স্বামী দিলীপের প্রশ্নবাণে ফুলসজ্জার ঘরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অবশ্য স্বামীটি তার জেল ফেরৎ আসামী। বহুগামিতা তার ধর্ম। ট্যাক্সি চালিয়ে সংসারের জন্য সামান্য উপার্জন করে। এহেন স্বামী নামক বস্তুটি প্রতি রাতে মহামায়ার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সিদ্ধহস্ত। নিত্য অশান্তি নিয়েই মহামায়া চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মহামায়ার স্বামী দুই সন্তানকে রেখে অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে ঘর ছাড়ে। এরপর মহামায়ার আশ্রয়স্থল হয় দাদার বাড়ি।

স্বামী বিহীন নতুন পথ তার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু চালের লাইন নয়। এবার নিজের বাড়ি দত্তপুকুর থেকে উল্টোডাঙ্গা পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করে পৌঁছে যায় নতুন কর্মস্থলে। মনসারামের টেস্টটিউব কারখানায় কাজ নেয় মহামায়া। রীতিমত টেস্ট দিতে হয় মহামায়াকে। দেহ হয়ে ওঠে মহামায়ার দ্বিতীয় উপার্জন মাধ্যম। মনসারামের এম এম এন্টারপ্রাইজে মহামায়ার সঙ্গে কৃষ্ণা, পুতুল, নমিতা, মমতা, কাবেরীর মতো বহু মেয়ে কাজ করে। কিন্তু মহামায়ার দেহগত আকর্ষণের জন্য মনসারামের 'সু-নজর'-এ এসে যায় সে। এহেন সু-নজর যৌন ক্ষুধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতাও এনে দেয় মহামায়াকে। মনসারামের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের দরুণ ছেলেমেয়ের লালন পালন সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। কিন্তু মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মনসারামের মেয়ে। এর পরের ব্যবস্থা হিসেবে মহামায়াকে মনসারামের ছেলেবেলার বন্ধু দিবাকরের কাছে পাঠানো হয়। দিবাকরের কবিরাজি ওষুধের ব্যবসা। 'ডায়মণ্ড আয়ুর্বেদ' কোম্পানির ওষুধ তৈরি করে হকার দিয়ে সেল দেওয়ায় দিবাকর। মহামায়া এখানে ওষুধ তৈরির কাজে যোগ দেয়। তবে মনসারাম মাঝে মাঝে মহামায়ার কাছে এলেও মহামায়ার ধীরে ধীরে মনসারামের ডাকে সাড়া দেওয়ায় অনিচ্ছা তৈরি হয়। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে— দিবাকরের চরিত্রের দৃঢ়তা। মহামায়ার কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে।

দিবাকরের কাছে মহামায়া শুধু ওষুধের কাজ শেখে তাই নয়। দিবাকরের বউ পারুলের অসুস্থতার জন্য বাড়ির রান্নার কাজের দায়িত্বও সে নেয়। অনেকটা গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে শুরু করে মহামায়া। দিবাকরের বউ পারুল তথাকথিত 'হাবা-গোবা'। ডাক্তার দেখিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। ফলে গৃহস্থালীর কাজে সে অনেকটাই অপারগ। ক্রমে তাকে ঘিরে দিবাকরের জীবনেও তৈরি হয় শূন্যতা। কারণ শয্যাসঙ্গিনীর দায়িত্ব পারুল কোনদিনও পালন করতে পারেনি। পারুলের এই অবস্থার জন্য দায়ী পারুলের এক মামা। পারুল এক মামার দ্বারা ছোটবেলায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে সে কোনদিনই আর তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। পারুলের এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও দিবাকর কখনই অন্য নারীমুখী হয়নি। তবে দু'বার পতিতাপল্লীতে গিয়েছিল। সেকথা দিবাকর স্বীকার করে। মহামায়াও দিবাকরের এই মানবিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে মহামায়া অবহেলা করতে থাকে মনসারামকে। দিবাকর জীবনের এতদিনের অপূর্ণতাকে যেন মহামায়ার মধ্যদিয়ে পূরণের স্বপ্ন দেখতে থাকে। মহামায়া দিবাকরের জীবনে সেই পূর্ণতা নিয়ে হাজির হয়। সংসারের গৃহকর্ত্রীর ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের মনে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবেও মহামায়া স্থান পায়। মহামায়া উপলব্ধি করতে পারে দিবাকরের মনের অবস্থা। তাই মনসারাম মহামায়ার

কাছে বারবার ভোগলালসা নিয়ে উপস্থিত হলেও সে নানা অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে পারুলের ক্যান্সার ধরা পড়লে দিবাকর অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হয়। মহামায়া তাকে নানা ভাবে সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে চুরি যাওয়ার ভয়ে ওষুধ তৈরির ঘরে মহামায়ার পরামর্শে দিবাকর লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এক সময় সেই টাকা চুরি যাওয়ায় মহামায়াকেই সন্দেহ করে দিবাকর। এক চূড়ান্ত অবিশ্বাস দানা বাঁধে দিবাকরের মনে। এই সংকটময় মুহূর্তে মনসারাম আবার দিবাকরের বাড়িতে হাজির হয় মহামায়ার শরীর ভোগের ইচ্ছায়। মহামায়া মনসারামকে বাধা দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, সেই শব্দ দিবাকর শুনতে পেয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে স্ট্রোক করে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে, চিকিৎসা করার ভার মনসারামই নেয়, বিনিময় মহামায়ার শরীর ভোগ। দিবাকরকে প্রাণে বাঁচানো যায় না। দিবাকরের স্ত্রী পারুলের 'অপারেশন সাকশেসফুল' হয়। দিবাকরের মৃত্যুর পর পারুলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় মহামায়া। আসানসোল থেকে দিবাকরের মৃত ভাইয়ের স্ত্রী ও ছেলেকে ডাকা হয়। দিবাকরের বাড়িটির যেহেতু দলিলপত্র ছিলনা তাই মনসারামের মধ্যস্থতায় কিছু টাকার বিনিময়ে বাড়িটি প্রমোটারের হাতে চলে যায়। ফলে মহামায়া নিজেই পারুলের দায়িত্ব নেয়। দিবাকরের কাছে শেখা কিছু ওষুধের ফর্মূলা মহামায়া আর পারুলের জীবন ধারনের উপায় হয়। 'ডায়মণ্ড আয়ুর্বেদ'-এর লেবেল লাগিয়ে মহামায়া হয়ে ওঠে দিবাকরের উত্তরসূরী। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে দিবাকরের টাকা চুরি যাওয়ার কথা। মহামায়ার মেয়ে সোনালি দিবাকরের হকার কানাইয়ের সঙ্গে পালিয়ে যায় সেই টাকা চুরি করে। কিন্তু মহামায়া যে টাকা চুরি করেনি সে কথা আর জানানো হয়না দিবাকরকে। মহামায়ার উপর অনাস্থা নিয়েই দিবাকর মারা যায়। মনসারামকে মহামায়া হাত ছাড়া করে না। কারণ তাকে শুধু তার ছেলেকে বড় করতে হবে তাই নয়, পারুলের দায়িত্বও নিতে হবে। তাই বাংলার মেয়েরা যেভাবে বেঁচে থাকে সেই পথই মহামায়ার পাথেয় হয়।

উপন্যাসটির মূল চরিত্র মহামায়া। অন্যান্য চরিত্র হিসেবে মনসারাম, দিবাকর, পারুল, মহামায়ার মেয়ে সোনালি, ছেলে অভি এবং দিবাকরের হকার কানাই উপন্যাসের গতিধারাকে সহায়তা করেছে। তবে দিবাকর, মনসারাম দুজনেই মহামায়া চরিত্রের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। উপন্যাসটির কথা বস্তুকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে এর উপস্থাপন ভঙ্গি। মোট ২১টি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায় নামকরণ যুক্ত। অধ্যায়গুলি পর পর এরকম— মহামায়ার সারাদিন, এম আর মণ্ডল, বাংলার গাছ কথা বলে, পার্কে, বায়ু পিত্ত, কফ, মেয়েবেলা, আরতি, রক্ত, ক্যানসার, কাঁদছে পারুল, টুকরো ঘটনাগুলি, নারদ পঞ্চচূড়া, কানাই ও

সোনালি, সেই পুরোনো খাট, দৈত্যমুখ দরজা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, উপলব্ধি, হিসেব, ডায়মণ্ড প্লাস্টিক, মহামায়া এখন, বাংলার গাছ কথা বলে।

সমস্ত অধ্যায়গুলির মধ্যেই মহামায়ার যাতায়াত। মহামায়া নিজেকে নিয়ে ভাবে— সমাজে তার পরিচয় কি? কারণ ছেলে মেয়েকে ভালো রাখার জন্য সে সাধারণ কর্মজগতের সঙ্গে সঙ্গে বেছে নেয় দেহব্যবসাও। মহামায়ার শারীরিক গঠনই তার এ পথে যাওয়ার সূত্র। এক সময় চালের লাইন, আর তার পর মনসারামের লোলুপ দৃষ্টি, কোনটাকেই সে পিছু ছাড়াতে পারেনি। কিন্তু এটাই মূল কথা নয় আসলে মহামায়াও চায়নি তার ছেলে মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করার ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দিতে। উপরন্তু সে পুত্র সন্তানের মা। মেয়ের চাইতে ছেলেকে সে অনেকটাই পক্ষপাতিত্বের নজরে দেখে। সবকিছুর আড়ালে 'হাফগেরস্থ' মহামায়া পুত্র সন্তানের জননী। তাই হয়তো মহামায়ার আধখানা মন চায় মৃত্যু কালে ছেলের হাতের আগুন। তাই মেয়েকে লুকিয়ে সে পুত্র পরিচর্যা করতে গিয়ে চিরাচরিত মায়ের রূপ ধারণ করে—

> *"চা করার সময় একটু বেশি করেই পাউডার দুধ গোলে মহামায়া, চায়ে দেওয়ার পরও আধকাপ মতো পড়ে থাকে। দাঁত মেজে এলে ছেলেটার থুতনিটা ধরে কপ করে খাইয়ে দেয়— মেয়েটা যেন না দেখে। মহামায়া বোঝে, মেয়েটা গোপনে ভাইকে খাওয়ানোর ব্যাপারটা জানে।"*[৮৪]

অর্থনৈতিক দূরবস্থা মহামায়ার মতো বহু মেয়েকেই বিপথগামী করে তুলেছে। আসলে মহামায়ার পূর্ব ইতিহাস জেনে বিয়ে করার পর তার স্বামীও তো চেয়েছিল একজন সতীনারী। কিন্তু সে কি তার দায়িত্ব পালন করল? না, অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে পুত্র, কন্যাকে ফেলে মহামায়াকে ত্যাগ করল। ফলে সন্তান লালন পালনের তাগিদে মহামায়াকে কর্মমুখী হতে হয়। কিন্তু নারীর চিরশত্রু তার রূপ। মহামায়ার ক্ষেত্রেও তাই হল। মনসারামের টেস্ট টিউব কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তাকে দেহ ব্যবসায় পা দিতে হল। তাই হয়তো যখন মনসারামের কারখানা থেকে কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাবে সে মুহূর্তে তার মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি হয়। এ দোলাচলতা কেন? কারণ, সন্তান লালনের দায়দ্ধতা।

দিবাকরের ওষুধ তৈরির কারখানায় কাজ পাওয়ার পর থেকে মহামায়ার মধ্যে শুরু হয় পরিবর্তন। সে সূচনা অবশ্য দিবাকরের আত্মিক চাহিদার দিক দিয়ে। দিবাকরের বউ পারুলের মানসিক ভারসাম্যহীনতা দিবাকরের জীবনে একটা অতৃপ্তির সৃষ্টি করেছিল। মহামায়া এসে রান্নাঘরের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দিবাকরের মহমায়াকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। কিন্তু সে স্বপ্ন দৈহিক সুখই

শুধু নয় সংসারের দাম্পত্য সুখ। মহামায়ার মধ্যেও শুরু হয় সংসারকে ভোগ করার চাহিদা—

> *"মহামায়া এখন অনেকটাই অধিকার ভোগ করে। মালিকের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকানোর অধিকার, কিছু নিষেধ করার অধিকার, কিছু উপদেশ দেওয়ার অধিকারও।"*[৮৫]

কিন্তু দিবাকরের আত্মদ্বন্দ্ব সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পারুল পাগল জেনেও দিবাকর তাকে ত্যাগ করেনি। বরং পাগল বৌয়ের সমস্ত ফরমাশ পূরণ করেছে। পারুলের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানার পর তার প্রতি আরও যত্নবান হয়েছে সে। ফলে মহামায়ার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও সেই টানকে এড়ানোর চেষ্টা সে প্রাথমিক ভাবে করেছে।

বাবা মারা যাওয়ার পর দাদাদের ইচ্ছাতেই চালের লাইনে কাজ করতে থাকে মহামায়াকে। সেখানে ব্যবসার উন্নতির জন্য বহুবার নিজের দেহকে ব্যবহার করেছে সে। এর পর বিয়ে করে সন্তান উৎপাদন করে সংসার ধর্ম পালন করতে চায়, কিন্তু স্বামীর দ্বিচারিতা সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পেটের তাগিদে মনসারামের কারখানায় কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তার শয্যাসঙ্গিনী হতে হয় তাকে। এক সময় মনসারামের পরিবার একাজে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর পর দিবাকরের ওষুধ তৈরির কারখানায় মহামায়াকে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়পর্বে মহামায়া জীবনের বহু পর্ব পার করে এসেছে। এখন তার লক্ষ্য ছেলেকে মানুষ করা। তবে নারীসত্তার পরম চাহিদা স্বামীর সুখ। সে সুখ দিবাকরের কাছ থেকে মহামায়া পাবে না জেনেও দিবাকরের ব্যক্তিত্ব মহামায়াকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণের তাগিদেই মনসারামের ভোগোচ্ছাকে বাধা দিতে সে সক্ষম হয়।

মহামায়া আর দিবাকরের মনের ইচ্ছেগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। তাদের দেহগত খেলার আঁচ পারুল পাওয়ার পর থেকে মহামায়ার উপর তার ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দিবাকরের মনের ইচ্ছাগুলোও ডানা মেলতে থাকে। মহামায়াকে নিয়ে সংসার বাঁধার স্বপ্ন সে বুনতে থাকে। কারণ পারুলের ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে দিবাকরের মনের কোণে পারুলের মৃত্যুর চাহিদা স্থান পায়। ঘটনাচক্রে দিবাকরের মৃত্যু কাহিনির গতিপথ পাল্টে দেয়। উল্টো দিকে পারুলের অপারেশনের পর সে বেঁচে ওঠে। এবার তার দায়িত্ব কে নেবে? দিবাকরের ওষুধ কোম্পানি ডায়মণ্ড হারবালের সঙ্গে দিবাকরের পাগল বউ পারুলের দায়িত্বও নেয় মহামায়া। কারণ দিবাকরের ভাইয়ের বউ ও ভাইপো পারুলের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেও পারুল তাদের সঙ্গে যেতে নারাজ। ফলে পারুলের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে মহামায়া। অসুস্থ পারুল ভেবেছিল তার স্বামী যদি ফিরে আসে তবে 'ম্যাডাম' অর্থাৎ মহামায়ার কাছেই আসবে। তাই মহামায়া পারুলকে বোঝালেও পারুল অন্য

ইঙ্গিত দেয়—

> *"পারুল আঙুলটা আকাশের দিকে রেখে বলেছিল, ও ম্যাডাম আসবে। মহামায়া বুঝতে পেরেছিল কী ভাবছে পারুল। পারুল ভাবছে— দিবাকর ফিরে আসবে, আর ফিরে এলে এই ম্যাডামের কাছেই ফিরবে। সুতরাং, ম্যাডামের কাছে থাকলেই ওর সঙ্গে দেখা হবে।'*[৮৬]

নিজের অন্নসংস্থান করতে হিমসিম খাওয়া মহামায়াকে অগত্যা পারুলের দায়িত্ব নিতে হয়। একজন সাধারণ নারী হয়ে ওঠে বাংলার ইতিহাস বহনকারী চিরন্তন নারীসত্ত্বা।

মহামায়া এখন উত্তরাধিকার বহন করছে দিবাকরের ডায়মণ্ড আয়ুর্বেদ কোম্পানির। দিবাকরের কাছ থেকে শিখে নেওয়া ওষুধের ফর্মূলা এখন মহামায়ার জীবনধারনের উপায়। একদিকে ছেলে অভি, অন্যদিকে ক্যান্সার রোগী পারুল। এ দুয়ের লালন-পালনের জন্য মহামায়া হয়ে ওঠে ট্রেনের লেডিজ কম্পার্টমেন্টের 'মহিলা হকার'। তার মধ্যে কাজ করে ইতিহাসকে ধরে রাখার প্রবল ইচ্ছে, সেই ইচ্ছেই তাকে দিয়ে বক্তব্য তৈরি করে—

> *"বন্ধুরা আমার। আমি ডাক্তার কবিরাজ নই। একজন সাধারণ নারী। বাংলার জংলা গাছের মতই সাধারণ। আমি লেডিজ কম্পার্টমেন্টে এসেছি আপনাদের বন্ধু হিসেবে। সঙ্গে এনেছি নারীবন্ধু চূর্ণ।'*[৮৭]

মহামায়া নিজেকে বাংলার জংলা গাছ মনে করে। এই গাছকে কেন্দ্র করে পারুল নামের আর একটি জংলা গাছ বেঁচে থাকতে চায়। মহামায়া সেই অবলম্বন। কিন্তু পারুলের চার হাজার নয় মাত্র চারশ টাকা দামের ইঞ্জেকশনের টাকাও যে জোগাড় হয় না। তাহলে উপায়? অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও পারুলের বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছে আর দিবাকরের প্রতি সুপ্ত ভালোবাসা মহামায়াকে এযুগের বেহুলা করে তোলে। ইন্দ্রের সভায় বেহুলা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছিল, আজ মহামায়াও সে পথের যাত্রী—

> *"বাংলার বৃক্ষলতা কথা বলে, দুঃখ কথা বলে। বেহুলাও বলেছিল। বেহুলার মতো মহামায়াও ইন্দ্রের সভায় যায়, যেতে হয় মাঝে মাঝে। মনসারাম ওকে টাকা দেয়। চুপচাপ চিৎ হয়ে শোয়, বাংলার গাছ কোনো কথা বলে না। বেহুলাও নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়। মহামায়াও একটু কোমর নাচায়, নইলে টাকা পাবে কোথায়, অন্য এক জংলি লতা যে বেয়ে উঠতে চায়, বাঁচবে।'*[৮৮]

সতী নারী হয়ে ওঠা মহামায়ার সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রচলিত কথাবলা পুতুলের গণ্ডি থেকে

সে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। কারণ তাকে ঘিরে বাঁচতে চাওয়া আছে, প্রেমানুভূতি আছে। এযুগের বেহুলারাও সমস্ত যন্ত্রণাকে চেপে রেখে লড়াই করে টিকে থাকতে জানে তার উদাহরণ স্বরূপ মহামায়া চরিত্র সৃষ্টি। ঔপন্যাসিক দক্ষ হাতেই সে নির্মাণ কাজ সমাধান করেছেন। আত্মিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে মহামায়া নিজের সিদ্ধান্তকে নিয়ে ভেবেছে। কথা না বলা পুতুলের মতো অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকেনি। জীবন যে নিত্য বহমান সে ধারাকে মেনে নিয়ে মহামায়া লড়াইকে হাতিয়ার করতে চেয়েছে। তাই অন্য ওষুধ নয়, 'নারীবন্ধু' আর 'রসময়' চূর্ণই মহামায়ার সে হাতিয়ার। প্রয়োগ স্থান লেডিজ কম্পার্টমেন্ট। বর্তমান শতাব্দীর পাল্টে যাওয়া অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের নগ্ন চাহিদা, আমাদের চারপাশের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই পরিবর্তনে নিজেকে টিকিয়ে রাখার পন্থা বের করে নিয়েছে মহামায়া। হকারি করতে শুরু করেছে সে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই নারীবন্ধু হওয়ার চেষ্টা করে সে হাত বাড়িয়েছে অজানা ভবিষ্যতের দিকে—

> *"আমি নিজে মেয়ে হয়ে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যই বিক্রি করছি নারীবন্ধু চূর্ণ। যে-কোনোরকম অসুবিধায় কাজ দেয়। যাঁদের এখনও কোনো সমস্যা শুরু হয়নি, তারা রোজ একমাত্রা করে খাবেন। গ্যারান্টি দিয়া বলছি, একদম ঠিক দিনে পিরিয়ড শুরু হবে, ঠিক দিন শেষ হবে।"*[৮৯]

আসলে জীবন যে বৈচিত্র্যকে বহন করে তারই একটি রূপ মহামায়া। মহামায়ার জিজ্ঞাসা— জীবনযুদ্ধে জংলা গাছের মতো কি বেঁচে থাকা যায়? সে নিজেই উত্তর পেয়েছে— হ্যাঁ এভাবেও বেঁচে থাকা যায়। কারণ এই জংলা গাছের দিকে আরও একটি জংলা গাছ আঁকশি বাড়িয়েছে। এক নারীকে কেন্দ্র করে আর এক নারী বাঁচতে চেয়েছে। এই চাহিদা মহামায়ার সমস্ত শক্তির উৎস। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মহামায়া চরিত্রের যে উত্তরণ দেখিয়েছেন সেখানেই উপন্যাসটি সার্থকতার দাবি রাখে।

মহামায়া উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র। তার চরিত্রের বিস্তার উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী চরিত্রের আত্মানুসন্ধানে সদা জাগ্রত। নারী চরিত্রের বিকাশ তাঁর উপন্যাসে খুবই সামান্য। নারীজীবনের সমস্যাকে তিনি তুলে ধরেন ঠিকই কিন্তু তার যন্ত্রণার চিত্রকে সেভাবে তুলে ধরেননি। মহামায়া চরিত্র চিত্রণে তিনি খানিকটা মুক্ত হস্ত। মহামায়া বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে এমন এক স্বর যে স্বর ইতিপূর্বে উঠে আসেনি। চিরাচরিত নারী চরিত্রের ভূমিকার বাইরে মহামায়া পদার্পণ করেছে। প্রধান তাগিদ জীবন ধারণ। রিফিউজি পরিবারের কন্যা সন্তান সে। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারকে প্রতিপালনের তাগিদে তাকে বৃত্তিমুখী হতে হয়। কিন্তু বৃত্তি

ধারণের পূর্বেই মহামায়ার রূপ-যৌবন তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। ফলত চালের লাইনে কাজ করা খারাপ জেনেও তার ভাইয়েরা তাকে সে কাজে বাধা দেয় না। ফলে তার চরিত্রের স্খলন ঘটে। দেহকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে সে পিছুপা হয়নি। মহামায়া এমন এক চরিত্র যে ধর্ষিতা হয়েছে কিশোরী বয়সে। শ্লীলতাহানী ঘটেছে, যৌনশোষণের মাধ্যম হয়েছে। পরে কর্মজগতে প্রবেশের পর স্বেচ্ছায় দেহদান করেছে কিছুটা উপরি উপার্জনের জন্য। দিলীপের সঙ্গে বিয়ে করে মহামায়া সংসারী হতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মত মেয়েদের 'সতী নারী' হওয়া ভাগ্যে জোটে না। নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার হয় সে। স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে। পুত্র কন্যার প্রতিপালনের জন্য তাকে বাইরে বেরোতে হয় আবার। কারণ সে যে মা। সন্তানের দায়িত্ব সে তো আর এড়িয়ে যেতে পারে না। সন্তান প্রতিপালনে মহামায়ার ভূমিকা অনেকটা যেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের নির্দেশিত পথে হেঁটেছে—

> *"সন্তানের জন্মদানে পিতামাতা উভয়েরই দায়িত্ব সমান হলেও মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিকটতর সম্বন্ধ। মা-ই তাদের বেশি ভালোবাসে। পশু-পাখিদের মধ্যেও দেখি, মাতার উপরে শিশুর ভার। প্রকৃতির যেন উদ্দেশ্যই এই যে, জন্মদাত্রীই সন্তানের পালিকা হবে, তারই যেন গরজ বেশি। তাই পুরুষের উপর নির্ভর না করে এ বিষয়ে নিজেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। এ বিষয়েও যদি পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে মাতৃত্ব স্বীকার না করাই ভালো, কারণ মাতৃত্ব স্বীকার করতে গিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার খাতিরে মাতৃত্ব বলি দেওয়া শ্রেয়। কিন্তু মাতৃত্ব স্বীকার করেও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখাই উচিত।'*[৯০]

মহামায়া এক সাহসী চরিত্র। সন্তান প্রতিপালনের তাগিদে জীবিকা ক্ষেত্রে শরীরকে সে অধিক অর্থ উপার্জনের মাধ্যম করেছে। তবে বহু ক্ষেত্রে সে স্বাধীন থাকার চেষ্টা করেছে। মনসারামের কাছে সে দেহবিক্রি করেছে ঠিকই কিন্তু তার প্রতি মানসিক কোনো টান তৈরি হয়নি। কিন্তু দিবাকরের প্রেমিক ও স্নেহসুলভ মন মহামায়ার মনকে আকর্ষণ করেছিল। মনের গোপনে সংসার করার ইচ্ছে জাগিয়েছিল। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিণাম সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মহামায়ার আত্মঅন্বেষণে সে নিজেকে আবিষ্কার করে আশ্রয়স্থল হিসেবে। একদিকে দিবাকরের স্ত্রী অন্য দিকে পুত্র সন্তান অভি। দু'জনের অবলম্বন সে। একদিকে হকারি আর অন্যদিকে দেহ এদুই তার ভিন্ন স্বরের মাধ্যম। জীবনকে সে এই দুই পথেই জয়লাভ করবে। ফলে মহামায়া এমন এক নারী চরিত্র যে হাজার

শোষণ, হাজার অত্যাচার সত্ত্বেও নিজের নারীসুলভ আচরণকে সঙ্গে নিয়ে জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বাঁচতে চায়। এযুগের বেহুলার স্বর হয়ে নতুন ভাষ্য রচনা করে। একুশ শতকের আগামী দিনের নিম্নশ্রেণির কর্মরত মহিলা প্রতিনিধি হয়ে নারী বিশ্বে আলাদা স্বরের পরিচয় বহনকারী মহামায়া নিজের ভাষ্যের মধ্য দিয়ে কথাবলা পুতুল হয়ে বেঁচে থাকে। 'কথাবলা পুতুল'-এর পাঠ এপর্যন্ত রেখে এবার আমরা পরবর্তী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলোর আত্মজিজ্ঞাসার অনুসন্ধানে যাত্রা করব।

৯

'**শেকড় ছেঁড়া**' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে স্বস্তিক প্রকাশন থেকে। মোট ২০টি অধ্যায়ে উপন্যাসটি বিন্যস্ত। ভূমিকা অংশে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন নিজের দেখা উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার কথা। দেশভাগের অভিঘাত উদ্বাস্তু পরিবারের আত্মাকে কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে তার কাহিনি এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। উদ্বাস্তু পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তান শিবব্রত ভট্টাচার্য। পরিবারে সে 'শিবু' নামে অভ্যস্ত। ছোট ভাই দেবু এবং বোন অরুণা ও মায়া। শিবুর বাবা কমলবাবু নারায়ণ দত্তের বাড়িতে সেরেস্তার কাজ করেন। দাদু হেমব্রত ভট্টাচার্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় কলকাতায় চলে আসেন, চাকরির অপশন নিয়ে। কলকাতায় আসার পর উদ্বাস্তু জীবনের সঙ্গে কীভাবে অভিযোজন করলেন তার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে শিবব্রতর স্মৃতি কথায়। শিবব্রত বর্তমানে উচ্চপদস্থ আমলা। সল্টলেকে শিবব্রতর বাড়ি। মহাজাতি নগর কলোনিতে তার বাল্য-কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়েছে। সে কলোনি 'উদ্বাস্তু কলোনি' নামে পরিচিত। একুশ শতকের দুটি দশক নগর-সংস্কৃতি ফ্ল্যাট-শপিংমল অভিমুখী। শিবব্রতর উদ্বাস্তু ভিটা আজ সেই সংস্কৃতির গ্রাসের মুখে। শিবব্রতর কাছে প্রমোটাররা এসেছেন জায়গাটি তারা ফ্ল্যাট করতে চায় বলে। শিবব্রতও আপত্তি করে না। কারণ তার ছেলে পুণেতে থাকে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে চণ্ডীগড়ে থাকে। ছেলেও আর কলকাতায় ফিরতে চায় না। তাছাড়া শিবব্রতর সল্টলেক ছাড়া শ্বশুরবাড়ির সূত্রে প্রাপ্ত বর্ধমানে একটি বাড়ি রয়েছে। ফলে মহাজাতিনগর কলোনির বাড়িটি সে প্রমোটারকে দিয়ে দেবে। তবে সে টাকার বদলে নিচ তলার একটি ফ্ল্যাট নেবে। কারণ সে দেশের বাড়ির সঙ্গে একটা যোগসূত্র বহন করতে চায়। বাকি ভাই বোনেরা তাদের পাওনা বুঝে নিয়েছে। শিবব্রতই শুধু শিকড়ের সঙ্গে যোগসূত্র নির্মাণ করতে চায়। শিবব্রত আজ উচ্চপদস্থ আমলা। কিন্তু তার শিকড় যেখানে প্রোথিত সে ইতিহাস শিবব্রতর

স্মৃতি কোণে জাজ্জ্বল্যমান। উপন্যাসের মধ্যে দ্বিতীয় থেকে উনিশতম অধ্যায় পর্যন্ত শিবব্রতর উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। উঠে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কীভাবে উদ্বাস্তু জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার কাহিনি।

শিবব্রতর ঠাকুরদা হেমকান্ত ভট্টাচার্যের কথা 'শেকড় ছেঁড়া' উপন্যাসের কাহিনির মূল স্বরূপ। উপন্যাসে শিবব্রত স্মৃতিচারণায় ফিরে গিয়েছে ১৯৭২ সালের পটভূমিতে। এই সময়ের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পর্ব ও তার পরবর্তী সময়ের রেখাচিত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিসংস্কার আইন বলবৎ করণের সূত্রে অফিসার পোস্ট তৈরি হয়েছে। শিবব্রতর পরিবার যখন একটি উদ্বাস্তু পরিবারের তকমা মাথায় নিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে নিজেদের অভ্যস্ত করে ফেলেছে সে সময় শিবব্রতর চাকরি হয়। শিবব্রতর ঠাকুরদা হেমকান্ত পেনশনভোগী। তারা যখন এপার বাংলায় আসেন তখন কলকাতার বুকে কিছু কলোনি তৈরি হয়। মহাজাতিনগর সেরকমই একটি কলোনি। এই জায়গাটিতে চৌধুরীদের আমবাগান থাকায় জায়গাটি 'আমবাগান' নামেও পরিচিত। শিবুদের পূর্ব-প্রজন্মের দ্বারা জায়গাটি দখল হয়। নতুন নামকরণের মাঝেও থেকে যায় পুরনোর রেস। শিবুর কথায় সে বিষয়টি উঠে আসে—

> *"যেবার শিবু ফার্স্ট হল, ক্লাস সেভেন, হেডস্যার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, থাকা হয় কোথায়? শিবু বলেছিল, মহাজাতিনগরে। হেডস্যার বলেছিলেন সেটা কোথায়? ছেলেটা বলেছিল আমবাগানে, আমাদের আমবাগানে।"*[৯১]

শিবুরা উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু সত্তা নিয়ে পূর্ববর্তী দুই প্রজন্মকে সে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগতে দেখেছে। শিবুর জন্ম উদ্বাস্তু কলোনিতে। কলোনির জীবন-যাত্রা শিবুকে উদ্বাস্তু সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চার করেছে। ওপার বাংলা থেকে এসে তারা কলকাতায় জবর দখল কলোনিতে বসবাস করছে। ফলে প্রায়ই তাকে চৌধুরীদের ছেলের মুখে শুনতে হয়েছে— *"বাঙালু ভাঁড় ভাঙ্গিলু, রই খাইলু, পয়সা দিলুনা—"*[৯২] একটা জীবন যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটছিল তাদের। হেমকান্ত নিজে প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী উদ্বাস্তু জীবনের। দেশভাগ থেকে শুরু করে কলকাতায় জবরদখল কলোনি গড়ে তোলা পর্যন্ত তিনি জীবনের বহু পর্ব অতিক্রম করে এসেছেন। এপার বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করার পরেও হেমকান্তর মধ্যে কীভাবে দেশের মাটির স্মৃতি জাগরূক রয়েছে তা অনুমান করতে পেরেছিল শিবু। হেমকান্তবাবু তার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার দ্বিখণ্ডিত রূপকে। তিনি একটি কাব্য রচনা করতে চেয়েছেন। কাব্যটির নামকরণ করেছিলেন 'উদ্বাসন কাব্য'। যেখানে তিনি লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন স্বাধীনতার নামে নেহেরু আর জিন্নার দ্বিচারী রূপ। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন

তিনি। মুসলমানদের চোখরাঙানিকে পুত্রবধূ কনকলতাও প্রত্যক্ষ করেছে। সে কাহিনিও তিনি লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। আসলে উদ্বাস্তু হিসেবে কলোনি জীবন তাঁকে কোনোভাবেই বর্তমান বাস্তুভিটার প্রতি টান তৈরি করতে পারেনি। বারবার খোঁজ করেছেন প্রাচীন ইতিহাসের। তিনি লিখে যেতে চান সেই ইতিহাস—

"প্রবল বিক্রমে আসে গোলাম সারওয়ার
গ্রাম হল অবরুদ্ধ কান্দে হিন্দুগণ
লুণ্ঠন। অগ্নিযোগ এবং নারীহরণ
মরিল কাহারা? যাহারা ছিল প্রতিবেশী
সামান্য স্বার্থবুদ্ধি হয় সর্বনাশী।"[৯৩]

হেমকান্তবাবু হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বা দেশভাগের যন্ত্রণাকে লিপিবদ্ধ করতে চান একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম যে ইতিহাস জানবে না বা জানার কথাও নয়, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি অজানা কথা বলে যেতে চান। এই ইতিহাসের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন উদ্বাস্তু কলোনিগুলি জবর দখলের ইতিহাস, ঘটি বাঙালের দ্বন্দ্ব, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনৈতিক দোলাচলতা, কিছু সহৃদয় ব্যক্তির উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভাবনাও তাঁর কাব্যের পটভূমিতে উঠে এসেছে। উদ্বাস্তু কলোনির নিজস্ব সংগঠন আছে। তারা তাদের দাবি নিয়ে মিটিং মিছিল করে। হেমকান্তবাবু কলকাতার পরিবর্তিত রাজনীতির চিত্র দেখেছেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি। কারণ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় মুসলিম জনগণ গান্ধিজির নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন— একমাত্র গান্ধিজী পুনরায় অনশন করে কংগ্রেস নেতাদের দেশভাগের প্রশ্রয়কে আটকাতে পারতেন। সমকালীন পরিস্থিতির চিত্র হেমকান্তবাবুর সামনে স্পষ্ট। দেশভাগের পরেও তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। ফলে দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলার মুসলমান জনজাতির মধ্যে যে ভাবনা কাজ করেছিল সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। হেমকান্তবাবু খেজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য হাড়ি লাগানোর ঠিকে কর্মী আমিনুদ্দিনের কথায় দেশের রূপ বদলের চিত্র উঠে এসেছে—

"আমিনুদ্দিন বলেছিল— হুনতাছি মোছলমানের রাজ আইতাছে, নোয়া-বাদশা হইব কায়েদে আজম। নবাব হইব নাজিমুদ্দিন। ইস্কুলে ক্যাবলা মোছলমান মাস্টার কাছারিতে মোছলমান হাকিম, মোছলমান দারোগা, মোছলমান জমিদার ...। খেজুর গাছের হকও কি ...।"[৯৪]

এ প্রশ্ন যে ওপার বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উঠে ছিল সেটা স্বাভাবিক। কারণ, সমকালীন পরিস্থিতি। মন্ত্রিত্ব নিয়ে দরকষাকষি। এর পিছনের কারণটা শিবুর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়েছে। শিবু হেমকান্তর একতরফা বিচারকে মেনে নিতে পারেনি। দেশ ভাগ হওয়ার কারণ শুধু রাজনৈতিক জটিলতা নয়। এর পিছনে সাধারণ মানুষের চাহিদাও কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছিল। শিবু সে ইতিহাস জানে বলেই দাদুর কাব্য নিয়ে তার ভাবনা ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক—

> *"শিবু বাহাদুর খাতাটা থেকে চোখ ওঠায় এবার। একবার ভাবে, দাদুকে বলতে তোমরা তো কম অত্যাচার করোনি গরিব মুসলমানদের ওপর। ওদের ঘরে ঢুকতে দিতে না, ওদের পেড়ে আনা ডাব খেতে, কিন্তু জল খেতে না, ওসব কথা তো একবারও বলো না কখনও, তোমরা ওই কাব্যে ওসব লিখবে! কিন্তু শিবু বলে না কিছু। বললে দাদু খেপে উঠবে।'"*[৯৫]

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেশভাগের পিছনে অনেক কারণ লুকিয়ে রয়েছে। হেমকান্ত একটা ধারণা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। উদ্বাস্তু জীবনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সমাজ-সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তনকে লক্ষ করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। চৌধুরীদের আমবাগানকে ধ্বংস করে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছেন। চৌধুরীদের রোষের মুখে পড়ে বড় নাতি মোহনব্রতর মৃত্যু দেখেছেন। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শহীদ বেদী তৈরি হতে দেখেছেন। শহীদ বেদীকে স্থান পরিবর্তন করতে দেখেছেন। দেখেছেন নব যুবকদের পরিবর্তিত মানসিকতা। সর্বোপরি নতুন যুগের সন্তানেরা উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তারা যে পূর্ব ইতিহাসকে স্মরণ করতে চায় না, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান। আসলে যুগের ধর্মকে তিনি মেনে নিতে চাননি। শিবুর চাকরি হওয়া, পরিবারের স্বচ্ছলতাকে নিজের চোখে দেখা সবই হেমকান্ত উপভোগ করেছেন। কলোনিগুলিতে ইলেক্ট্রিকের সংযোগ এবং শিবুদের বাড়িতে অন্ধকারের নিরসন হেমকান্তবাবুর সামনে নতুন পৃথিবীর হাতছানি এসে যায়। তিনি তাঁর কাব্য নতুন উদ্যমে লিখতে থাকেন। সে কাহিনির ধারা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এগোয়। শেকড় ছেঁড়া মানুষটি শেকড়ের সন্ধান করেন। রিফিউজিদের প্রথম কলোনি বিজয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কাহিনি। রিফিউজিদের নিয়ে বিহার, ওড়িষ্যার দ্বন্দ্ব, সরকারি হিসেব গড়মিল, পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের মধ্যে কিছু মহানুভব ব্যক্তিদের দায়িত্ব, পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের নিয়ে সরকারী নজর, দ্বিজাতিতত্ত্বের বলি বাংলার সাধারণ মানুষ, নারীদের ওপর অত্যাচার সবই তিনি স্মৃতির পাতা থেকে সংগ্রহ করে লিখতে চেয়েছেন কাব্যে। সবটা রূপ দিতে না পারলেও কিছুটা পেরেছেন। তবে জবরদখল করে বাস্তু

নির্মাণে তাঁর দ্বিধাবোধ ছিল। এপার বাংলা ওপার বাংলায় শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও তাদের প্রাণ ভয়ে গ্রামছাড়া হয়েছিল। অশোকনগরের কাছে বরইগাছিতে তিরিশ ঘর মুসলমান পরিবার গ্রাম ছাড়া হয়েছিল। ক্যাম্পবাসীরা সে গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল। হেমকান্তবাবুর কদর ছিল সে গ্রামের পত্তনমুখে। কারণ নতুন পত্তনিতে শিক্ষক এবং ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। কিন্তু হেমকান্ত সেখানের শূন্য ঘরবাড়ি, কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত স্মৃতি তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেছিল। তাঁর ভিটেমাটির আকাঙ্ক্ষা ছিল। কারণ ক্যাম্পের মানুষগুলির জন্য সরকারিভাবে বন্দোবস্ত হওয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে থাকলে তা কতটা কার্যকরী হবে সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। ফলে বিরাটির কাছে চৌধুরীদের আমবাগানই তাঁদের লক্ষ বস্তু হয়েছিল, যা আজ মহাজাতিনগর কলোনিতে পর্যবসিত। যে লড়াই হেমকান্তরা করেছিলেন তার সামান্যতম অনুভূতি কী পরবর্তী প্রজন্ম মনে রাখবে? এ প্রশ্ন জাগে হেমব্রতর মধ্যে। বড় নাতি মোহনব্রতর মৃত্যু উদ্বাস্তু কলোনিতে একটা আবেগ সৃষ্টি করেছিল। তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে শহীদবেদী নির্মাণ হয়। সেই শহীদ বেদী আবার স্থানান্তরিত হয়। হেমকান্তবাবু পুনর্নির্মিত শহীদ বেদীর উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি জানতেন উদ্বাস্তু পরিবারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম যে লড়াইটা প্রত্যক্ষ করেনি তাদের পক্ষে মোহনব্রতকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাই তিনি বলেছেন—

> *"আমরা সব ছিন্নমূল। এই নতুন মাটিতে আমরা শিকড় গাঁথছি— এই শক্ত মাটিতে। আমরা অনেক পাতা খসিয়েছি। তোমরা কি ঝরাপাতা দেখতে পাও?— এরকম একটা ঝরাপাতার নাম মোহনব্রত। আমবাগানের সামনে শিশু-মোহনব্রত মরেছিল। সেখানেই ছিল ইটের একটি শহীদ বেদি। রাস্তার উন্নতির জন্যে ওই শহিদ বেদিও শহিদ হল। আজ ওইটা এই মাঠে স্থানান্তরিত। যদি কোনও দিন এই মাঠের আরও উন্নতি হয়, তখন এই বেচারা শহিদ বেদি কোথায় যাইবে জানি না।"*[৯৬]

হেমকান্তবাবু অনুমান করেছিলেন উদ্বাস্তু জীবনের ভবিষ্যৎ রূপ। যে লড়াই তাঁরা করেছেন শেকড় ছেঁড়া মানুষ হিসেবে, সে স্মৃতি কী কোথাও বেঁচে থাকবে? এক গভীর জীবন জিজ্ঞাসা তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। ভবিষ্যৎ তিনি জানেন না। 'উদ্বাসন কাব্য' তিনি লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। ফলে নিজের হাতে সে কাব্যকে নষ্ট করে দেন। কেন তিনি কাব্যটি নষ্ট করেছিলেন তা শিবু জানে না। সে তার জীবনকে আলাদা মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা

করেছে। কারণ তার দাদু এবং বাবার জীবনের অর্থকষ্ট। হেমকান্ত যে জীবনবোধ নিয়ে সময় কাটিয়েছেন কমল সে জীবনবোধ কী ধরে রাখতে পেরেছিলেন? বাবা হেমকান্তর সঙ্গে স্ত্রী কনকলতাকে নিয়ে কমলবাবুও উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। উদ্বাস্তু পরিবারের প্রথম প্রজন্ম তিনি। ওপার বাংলায় বাবা জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় চৌধুরীদের সেরেস্তার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কমলবাবুরা নোয়াখালি থেকে কলকাতায় চলে আসেন। নোয়াখালি থেকে স্বাধীনতার আগেই জ্যোতিষী রমেশচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ চলে এসে কলকাতার বুকে পসার বসিয়েছিলেন। কমল তাঁর কাছেই কাজ করতেন। হ্যান্ডবিল লাগানোর মধ্য দিয়েই কমল কলকাতা শহরটাকে চিনেছিলেন। রমেশচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণের চেম্বার থেকেই নারায়ণ দত্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং তাঁর সেরেস্তায় কাজ শুরু। শুধু সম্পত্তি দেখাশুনো নয় জমিদার ঘরণীদের জন্য সিনেমা হলের টিকিট কাটা থেকে প্রায়ই অন্য ফরমায়েশেও কাজ করতেন। পরিবার প্রতিপালনে যথেষ্ট লড়াই করেছেন তিনি। ছেলে শিবব্রতর গেজেটেড পোস্টে চাকরি তার সম্মান বৃদ্ধি করেছে বটে। উপন্যাসে কমলের চরিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এক, বাড়িতে ইলেক্ট্রিক সংযোগ নেওয়ার জন্য ইলেক্ট্রিক বোর্ডে টাকা জমা দিতে হয়। কমলের কাছে যথেষ্ট টাকা না থাকায় তিনি পূর্ব বাংলার স্মৃতি স্বরূপ রেখে দেওয়া কাঁসার বাসনগুলি শিয়ালদার চোরাই মার্কেটে বিক্রি করে দেন। প্রথমে এ ঘটনা বাড়ির কেউই জানত না। শিবু চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে চোরাই মার্কেট থেকে কম টাকার বুটজুতো কিনতে গিয়ে কাঁসার দোকানে বাসনগুলি দেখে চিনতে পারে। জুতো না কিনে চোরাই বাসনগুলো গর্বের সঙ্গে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বাসনগুলো দেখে কমলের প্রতিক্রিয়া এবং ফেরার পথে পাড়ার বন্ধু শীতলের বক্তব্য দুটির মধ্যে সাযুজ্যই প্রমাণ করে প্রকৃত সত্যের। দুই, নারায়ণ দত্তের দেওয়া প্রস্তাবকে মেনে নিতে চেষ্টা করার মধ্যে কমলের চরিত্রের অন্য একটি বিশেষ দিক ফুটে ওঠে। নারায়ণ দত্তের ছেলে তাদের বংশের পুরোহিত বেণীমাধব চক্রবর্তীর মেয়ে সুজাতার গর্ভসঞ্চার করে। মেয়েটির গর্ভপাতের ব্যবস্থা হলেও ঘটি ঘরে আর তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া বিষয়টি তাদের আত্মীয়েরা প্রত্যেকেই জানে। কমলের ছেলে শিবব্রতর গেজেটেড পোস্টে চাকরি হওয়ার পর নারায়ণ দত্ত সেই মেয়েকে বিয়ে দিতে চান শিবব্রতর সঙ্গে। বিয়ে করলে বেণীমাধববাবুর সম্পত্তি এবং বাস্তুভিটেটি একমাত্র মেয়েই পাবেন। ফলে কলকাতায় মাথা গোঁজার মত একটা বাসস্থান তৈরি হতে পারে কমলবাবুদের। তাই তিনি শিবব্রতকে বেণীমাধব চক্রবর্তীর মেয়েকে বিয়ে করতে বলেন।

একটি উদ্বাস্তু পরিবারের বাস্তুসম্পর্কীয় চাহিদাটাই তাঁদের তাড়া করে। উন্নতির জন্য শহীদ

বেদীটার কী অবস্থা হয়েছে তা হেমকান্ত বুঝেছিলেন। কমলও উপলব্ধি করেছিলেন ছিন্নমূল মানুষগুলির দখলীকৃত বাস্তু থেকেও একদিন উচ্ছেদ হতে পারে। কলকাতার বুকে একটি রায়ত বাস্তুর প্রতি লোভ তিনি এড়াতে পারেননি। শিবুকে বিয়ে করার জন্য তিনিও বলেছেন। একটি মেয়ের পূর্ব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও শুধু বাস্তুবান হওয়ার জন্য তিনি শিবুকে বিয়েতে মত দিতে বলেন। শুধু বাস্তুবান নন, সঙ্গে উচ্চপদে চাকরির প্রলোভনও কি কম? নারায়ণ দত্ত কমলকে চিঠিতে জানিয়েছেন—

> *"কন্যাটি গ্রহণ করিলে আপনাকে এস্টেট ম্যানেজারের পরিবর্তে অন্য কোনও কাজে বহাল করিবার চেষ্টা করিব। আপনি বাজার সরকারের পদে খুবই যোগ্য।'*[৯৭]

এই প্রলোভন এড়ানো কমলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই নীতি বিবর্জিত হয়েই শিবুকে তিনি সুজাতার সঙ্গে বিয়ে করতে বলেন। শুধু কমলবাবুই নন হেমকান্ত এবং কনকলতাও স্বপ্নজাল বুনেছেন। শিবুর বিয়ে হলে বাস্তুহীন মানুষগুলি বাস্তুবান হবেন। সভ্যতার গতিপথে মানুষকে বাস্তুহারা হতে হয় বহুভাবে। হেমকান্তবাবুরা উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণায় দীর্ণ। তাঁরা চান বাস্তুকে স্থায়ী করতে। তাই উপায় সন্ধানী তাঁরা প্রত্যেকে। জীবনের কাছে তাঁদের একটাই চাওয়া— তাঁরা যেন এই বাংলার বুকে শিকড় প্রোথিত করতে পারেন। শিবু তাদের আশার প্রদীপ। শিবুর মাধ্যমেই সে পথ তাঁরা অতিক্রম করতে চান।

উপন্যাসের মধ্যে শিবব্রত উদ্বাস্তু পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের ভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে। ভূমিরাজস্ব দপ্তরে চাকরি হওয়ার পর তার চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন এক নতুন অস্তিত্ব সন্ধানী মানুষকে। আর্থিক অনটনের জন্য চাকরি হওয়ার পরে একজোড়া জুতো কেনার সামর্থ তার নেই। সে সামান্য পয়সা জোগাড় করে চোরাই মার্কেট থেকে কমদামী জুতো কিনতে যায়। জুতো না কিনে হারানো পৈতৃক অস্তিত্ব সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরে। আসলে তারা শেকড়ের সন্ধানী। যে শেকড় ছিঁড়ে গিয়েছে, সে শেকড়কে শিবুও চায় পুনরায় প্রোথিত করতে। তাই গেজেটেড অফিসার হিসেবে প্রথম দিন চাকরিতে উপস্থিত হতে একটু চাকচিক্যর বদলে সে শিকড়ের সন্ধানে নিজের উদ্দেশ্য থেকে সরে আসে। শিবব্রত নিজের পরিবারকে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েই দিন-যাপন করতে দেখেছে। চাকরিতে যোগ দিয়ে সে পরিবারে পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রথম প্রথম নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ শিখে সে নিজেকে তৈরি করতে থাকে। প্রথম দিকে উপরি উপার্জন পকেটে ভরতে সামান্য বাধলেও ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। উপরি উপার্জন দিয়েই

বাড়ির মানুষগুলোকে ধীরে ধীরে স্বাচ্ছন্দের জীবনের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তার তেমন নজর ছিল না। বাবা যখন নারায়ণ দত্তের দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে হাজির হন শিবুর সামনে তখন নিজের মতকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। সুজাতা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও শিবু তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না। কারণ তার মনে কাকলির উপস্থিতি। কাকলির শরীর এবং মনের সঙ্গে একাত্ম হয়েও উপন্যাসের শেষে দেখা যায় শিবুর স্ত্রী অন্য কেউ। সুজাতা বা কাকলি কেউই শিবুর জীবন সঙ্গিনী নয়। ভাস্বতী তার স্ত্রী। ঔপন্যাসিক তাকে সতীনারীর পরিচিতি দিয়েছেন। অর্থাৎ শিবুর জীবনসঙ্গী রূপে ভাস্বতী যথাযথ। পরিবারের জন্য শিবুর ভূমিকা যথোপযুক্ত। অনুমান করা যায় শিবুর ঠাকুরদা হেমকান্ত ও বাবা কমলবাবু মহাজাতিনগর কলোনিতে মারা যান। মা কনকলতার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি সল্টলেকের বাড়িতে শিবুর সঙ্গে থাকেন। শিবু সল্টলেকের বাড়ির লনে কলোনির বাড়ি থেকে আমগাছ নিয়ে এসে লাগিয়েছে। সে চেয়েছিল শহরের বাড়ি একটু দেশের বাড়ির ছায়া পাক। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমগাছের শেকড়ের কাহিনি একটু দীর্ঘায়িত। কনকলতার বাবা অর্থাৎ শিবুর দাদু যাকে শিবুরা পাকিস্তানি দাদু বলত সেই দাদু পূর্ব বাংলা হওয়ার পর দেশের বাড়ি থেকে কয়েকটি আমের বীজ নিয়ে এসেছিলেন। শিবুদের বাড়ির উঠোনে সে বীজ রোপন করেন তিনি। আসলে দেশের ছায়াকে কলোনির বাড়িতে প্রতিস্থাপন করতে চাওয়া এর মূল কারণ। আম আঁটি রোপন করার সময় শিবুর সামনে এক নতুন সত্য উদ্ঘাটন হয়। মাটির নিচে মৃত আশা নিয়ে বসে রয়েছে আমবাগানের পূর্ব স্মৃতি। যা প্রমাণ করে কলোনি দখলের ইতিহাস। শিবুর অনুভূতিকে ঔপন্যাসিক ঠিক এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> *"সেই আমবাগানের শিকড়। চৌধুরীদের আমবাগান। যে আমবাগানে তছনছ করে ওরা বসতি করেছে, সেই আমবাগানগুলির মৃত শিকড় বাকড় এখনও রয়ে গেছে মাটির তলায়। এখানে শিবু রোপন করতে চায় একটি নতুন আমের আঁটি। ওদের আদিপুরুষের আমগাছ। পূর্বপুরুষের।"*[৯৮]

কলকাতা মহানগরী উদ্বাস্তু মানুষগুলির কলোনি দখলের ইতিহাস এভাবেই বুকে ধারণ করে রয়েছে। যে ইতিহাসের অনেকটাই হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থের পাতায় আবদ্ধ রয়েছে।

শেকড় সন্ধানী শিবু আত্মসন্ধানী হেমকান্তের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। স্বাধীনতার সময়কাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমণ্ডল উদ্বাস্তু পরিবারের মানুষগুলোর বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। জীবনের চলমানতায় তাঁরা সবাই একই জিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁদের ছেঁড়া শেকড় কী পুনরায় প্রোথিত হতে পারবে? উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে আমরা তার পরিণতিসূচক

উত্তর পেয়ে যাই। আসলে মানুষের জীবন-যাত্রায় বহু ভাবে অভিযোজন করতে হয়। ছিন্নমূল হতে হয় বহুভাবে। সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটায়। উন্নয়নের বশবর্তী হতে চায় মানুষ। ফলে ছিন্নমূল হওয়ার প্রবণতায় পরিণত হয়। শিবব্রতর পরিবার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে পশ্চিমবাংলায় এসেছিল। সবাই চেয়েছিল তাদের ছেঁড়া শেকড়কে পুনরায় প্রোথিত করতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। শিবু কলোনি জীবন ত্যাগ করে সল্টলেকে বাড়ি করেছে। অর্থাৎ তারও শেকড় ছিঁড়ে গেল। সে শুধু চেষ্টা করেছে দেশের বাড়ির আমগাছের দ্বারা পূর্বপুরুষের ছায়া পেতে। শিবুর ছেলে যে কখনো শেকড়ের সন্ধান করেনি, সে শেকড়ের টান অনুভব করবে না। ফলে তার পক্ষে পুণে থেকে কলকাতায় ফিরে এসে বসবাস করা সম্ভব হবে না। শিবু দেখেছে সেও শেকড়কে ধরে রাখতে পারেনি। তাই মহাজাতিনগর কলোনির বাড়িটি প্রমোটারকে দেওয়ার সময় টাকা না নিয়ে সে নীচতলায় একটি ফ্ল্যাট নিতে চেয়েছে। আসলে সে চেয়েছে দেশের মাটির গন্ধ পেতে। তার পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে এসে কলোনিতে বসতি স্থাপন করেছিল। অর্থাৎ এখানেই তাঁরা শেকড় প্রোথিত করেছিল। শিবু সে শেকড় ছিন্ন করে সল্টলেকে বাড়ি করল। অর্থাৎ সেও শেকড়কে আঁকড়ে রাখতে পারেনি। তার ছেলে তো আরো এক ধাপ এগিয়ে। সে কলকাতায় ফিরতেই চায় না। অর্থাৎ সে স্ব-ইচ্ছায় ছিন্নমূল হয়ে থাকতে চেয়েছে। আসলে আমরা উন্নয়নের তাগিদে ছিন্নমূল হয়ে যাই। এই ধর্মই বর্তমান সভ্যতার দান। শিবুর দাদা মোহনব্রতর শহীদ বেদী তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। সে ইতিমধ্যে দু'বার উদ্বাস্তু হয়েছে। এবার তাকে কলোনির বাড়ি থেকে উদ্বাস্তু হতে হবে। তার স্থান আর কোথাও হওয়ার নয়। কিন্তু শিবু তো শেকড় খুঁজতে এসেছে। ফলে শহীদ বেদীর দুটো ইট সে নিয়ে যেতে চায় নতুন ফ্ল্যাটে। সেখানে সে নির্মাণ করবে শেকড় হীনতার যন্ত্রণা নিয়ে থাকা শহীদবেদীকে। জীবন শিবুকে সত্যের সম্মুখীন করায়। একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে শিবু কলোনির বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল। জীবন কেন মানুষকে ছিন্নমূল করে দেয়। উত্তর শিবু পেয়েছে। উন্নয়নের বশবর্তী জীবন মানুষকে আসলে তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উৎখাত করে। আর মানুষ হয়ে যায় উদ্বাস্তু বা শেকড় ছেঁড়া। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আসলে সময়-পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষের পরিবর্তন সাধিত হয় সে দিকটিকে সামঞ্জস্য বিধান করলেন জীবনের চলমানতার মধ্য দিয়ে। যুগ পরিবর্তিত হয় কিন্তু জীবনের সত্য সময়ের সঙ্গে অন্যভাবে আবর্তিত হয়। সে বিষয়টিকেই তিনি 'শেকড় ছেঁড়া' উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। জীবনের সন্ধান হেমকান্তকে ছিন্নমূল করেছিল। শিবু এবং তার ছেলে জীবিকার সন্ধানে ছিন্নমূল হতে চেয়েছে। এভাবেই সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের ভাবনার পরিবর্তন ঘটায় এবং মানুষকে অভ্যস্ত করে নতুন

জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে। ফলে আমরা সবাই শেকড় ছেঁড়া হয়ে পড়ি। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রতিনিয়ত মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাকে অনুসন্ধান করেন। 'শেকড় ছেঁড়া' তেমনি এক অভিজ্ঞতার ফসল, যা তিনি ব্যক্তিগত জীবন দিয়েও অনুভব করেছেন নিজে 'বাঙাল' পরিবারের সন্তান বলে। একুশ শতকের দ্বিতীয় পাদে দাঁড়িয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলির কথা এই উপন্যাসের ক্যানভাসে তিনি এযুগের মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করেই উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসে এক অন্য ভাবনাকে তিনি তুলে ধরলেন। আমরা সে ভাবনার সঙ্গে এবারে পরিচিত হব।

১০

'চার ডাক্তার' উপন্যাসটি পত্রভারতী প্রকাশনী থেকে ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির চারটি ভাগে চারটি আখ্যান। প্রথম আখ্যানের শিরোনাম— হাতুড়ে, দ্বিতীয়— হোমিওপ্যাথি, তৃতীয়— অ্যালোপ্যাথি, চতুর্থ— ডাক্তার, বিশেষণহীন। শিরোনাম যুক্ত আখ্যান ভাগগুলি আবার উত্তরাধিকার সূত্রের নামকরণে চিহ্নিত। যথাক্রমে সেগুলি হল— পিতৃসত্তা, পিতৃপরিচয়, পিতৃঋণ, ধর্মপিতা। উপন্যাসটিতে তিনটি আলাদা আলাদা ডাক্তারের পরিচয় প্রদানের পর চতুর্থভাগে সমস্ত ডাক্তারের মিলিত পরিচয় আমাদের ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত তা নির্দেশ করে। আলাদাভাবে উপন্যাসটির আখ্যান ভাগগুলি রচিত হলেও আসলে ডাক্তারি সত্তার উত্তরাধিকারের চিত্র উপন্যাসটিতে অঙ্কিত হয়েছে।

প্রথম আখ্যান 'হাতুড়ে'। এই আখ্যানে ডাক্তার ভজন মৃধার জীবন-উপলব্ধি বর্ণিত হয়েছে। ভজন মৃধার পিতা বিলাস মৃধাও হাতুড়ে ডাক্তার। বিলাস মৃধার ডাক্তারির সূত্রপাত মর্গে চাকরিরত অবস্থায়। মর্গের স্টোরকীপারের কাজ করতেন বিলাস মৃধা। বেওয়ারিশ মৃত দেহের বহু 'পার্টস' চোরাই পথে বিক্রির সঙ্গে বিলাস যুক্ত ছিলেন। সন্তোষ ডোমের কাছেই মৃতদেহের 'ডিটেকশনের প্র্যাকটিক্যাল' কাজ শুরু হয় তাঁর। মেডিক্যাল ছাত্রদের সঙ্গে বিলাসের চোরাই কারবারের জন্য যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। দিনের বেলায় মর্গের কাজ শেষ করে এক ডাক্তারের চেম্বারে বিলাসের যাতায়াত শুরু হওয়া থেকেই বিলাসের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। নাম ডাকার কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করে টুকটাক সেলাই পর্যন্ত বিলাসের অভিজ্ঞতা পৌঁছে যায়। আসলে শিখতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই প্রধান। আর সেই গুণটিই ছিল বিলাসের মধ্যে। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিও ঘটে চলেছিল। যার দরুণ বিলাস গর্ভপাতের সবচেয়ে আধুনিক কিউরেটিং মেশিনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ধীরে ধীরে বিলাসের অভ্যন্তরে ডাক্তারি সত্তা জেগে ওঠে। গ্রাম শুঁটিয়ায়

মধ্যে মধ্যে টুকিটাকি চিকিৎসা করে অনেকেরই প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে ডাক্তারি কর্মযজ্ঞে তাঁর আসন তিন নিজেই পাকাপাকি ভাবে স্থায়ী করে নেন। গ্রামের মধ্যেই একটি টিনের ঘরে বিলাস নিজের চেম্বার খুলে বসেন। সঙ্গে টিনের পাতে ডা. বিলাস মৃধা এবং স্টেথোস্কোপের ছবিটাও আঁকতে ভুল হয় না তাঁর। ক্রমে বিলাস মৃধা হয়ে ওঠেন ধন্বন্তরি।

বিলাস মৃধার ছেলে ভজন মৃধার ডাক্তারিতে হাতেখড়ি বাবার কাছেই। আসলে কৈশোর বয়সে পড়াশুনোর গতিবিধি ভালো ছিল না ভজনের। মেনকা নামের এক অধিক বয়স্কা নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যাওয়ায় পড়াশুনোয় ভাঁটা পড়ে। বিলাস ভজনকে বাড়িতে রেখেও রক্ষা পাননি। কারণ পরিচারিকা জোছনা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এহেন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার পথ বিলাসই উদ্ধার করে—

> *"গর্ভপাতের পুরো প্রক্রিয়া চলার সময় সেই গুপ্তঘরে অয়েল ক্লথের পাশে ভজনকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আসলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিতা শাস্তি দেওয়ার ছলে পুত্রকে ট্রেনিং দিয়েছিল।"*[৯৯]

বাবার ছত্র ছায়াতেই ভজন ডাক্তারির প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিল। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ধোয়া থেকে শুরু করে নাড়ি দেখা পর্যন্ত সমস্ত কাজই বাবার সঙ্গে থেকে শেখা। বিলাস ডাক্তার তার নিজস্ব সৃষ্ট উপায়ে রোগীর ডায়াবিটিস পরীক্ষা, মল পরীক্ষা, জন্ডিস নির্ধারণ করে ওষুধ দিতেন। হাতুড়ে ডাক্তারী করেই বিলাস পারিবারিক সচ্ছলতার মুখ দেখেছিলেন। বিলাসের পথ ধরেই ভজন হাঁটতে শুরু করেছিলেন। তবে পিতার মত পাঁচ টাকা ফি-তে আটকে না থেকে ভজন কুড়ি টাকা ফি নির্ধারণ করেছিল। বিলাস ডাক্তারের দেহাবসানের সময় ভজন ডাক্তার বছর চৌত্রিশের। বাবার দেওয়া শিক্ষার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট থেকে নেওয়া অ্যালোপ্যাথি শিক্ষা, সহজ ধাত্রীবিদ্যা, আবুল হাসনতের যৌন বিজ্ঞান বইগুলি ভজন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করেছিল। শুধু এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আটকে না থেকে ধন্বন্তরি মেডিকেল কলেজ থেকে দেড় বছরের অলটারনেটিভ মেডিসিনের কোর্স করার সুযোগও ভজন পেয়ে যায়। নব্বইয়ের দশকে হাতুড়ে ডাক্তাররা এই ধরনের কোর্স করে মফঃস্বল শহর ও গ্রামে তাদের কার্যক্ষেত্রকে টিকিয়ে রাখার পথ প্রশস্ত করেছিল। এরকম এমডির ক্লাস থেকে ভজন এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, কবিরাজি চিকিৎসার পাঠও পেয়ে গেল। গ্রাম বাংলার হাতুড়ে ডাক্তার রোগীদের অনেক কাছের লোক হয়ে ওঠেন যখন তিনি ওষুধের সঙ্গে ঘরোয়া টোটকাকে জুড়ে দেন। আসলে ইংরেজদের আগমনে দেশীয় চিকিৎসার গুণাগুণ উপেক্ষিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু উপেক্ষিত চিকিৎসা

পদ্ধতি ফিরে আসতে শুরু করেছিল ভজন মৃধার মতো হাতুড়ে ডাক্তারদের হাত ধরেই। ভারতবর্ষের চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেকটাই হাতুড়ে ডাক্তারদের ওপর নির্ভরশীল। হাতুড়ে ডাক্তারেরা জানেন চিকিৎসা জগতে তাদের সম্মান নেই। সমাজের চোখে তারা কাজ চালাবার মতই ডাক্তার। পাশ-করা ডাক্তারদের মতো তাদের সম্মান নেই। ভজন মৃধার মতো কোনো কোনো ডাক্তার পিতৃসূত্রে নামডাকের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। কিন্তু নিজের ভিতরে চলতে থাকে পরিচয়হীনতার লড়াই।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী হাতুড়ে ডাক্তারের পিতৃসত্তার পরিচয় দিতে চেয়েছেন এই ভাগে। উপন্যাসের যাপনকালে তারাপীঠে মায়ের পুজো দিতে এসেছে ভজন তার পরিবারকে নিয়ে। ভজনের ছেলে সুবোধ, ছোট মেয়ে অপর্ণা, স্ত্রী রেবতী। প্রত্যেকের একটাই প্রার্থনা সুবোধ যেন জয়েন্ট পরীক্ষায় পাশ করে যায়। সুবোধ যদিও পরীক্ষা খারাপ দিয়েছে। ভজন সুবোধের পরীক্ষা খারাপ হওয়াকে মেনে নেয় পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত ডিএনএ-এর জন্য। ছেলেকে ডাক্তার করার ইচ্ছে বহুদিন ধরে পোষণ করে চলেছে ভজন। তবে হাতুড়ে ডাক্তার নয়, পাশ-করা ডাক্তার। সে সাধ পূরণ করতে সুবোধ অপারগ। বাবা মায়ের সুবোধ বালকের মতই তার আচরণ এবং বুদ্ধিমত্তাও। ভজন ডাক্তারের পসার শুঁটিয়াতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বছর দশেক আগে বারাসতে একটি বাড়ি কিনে তারা বসবাস শুরু করেছিল। ছেলেকে ইংরেজি মিডিয়ামে না পড়ালেও মেয়েকে সে ভর্তি করেছে। মেয়েও ইংরেজি মিডিয়ামকে রপ্ত করেছে বেশ। তবে মেয়ে ডাক্তার হতে চায় না। সে শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হতে চায়। মা তারার কাছে তাদের প্রত্যেকবার একটাই প্রার্থনা— সুবোধ যেন ডাক্তরি পরীক্ষায় সুযোগ পায়। দূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে, মূলত সুবোধের কথা ভেবে ভজন আগেই কলকাতার দমদমের কাছে একটা ফ্ল্যাট বুক করে রেখেছে। ডাক্তার হয়ে সুবোধ ওই ফ্ল্যাটেই থাকবে বলে ভজনের আগাম কল্পনা। কিন্তু মা তারা, বামাখ্যাপা, শিব, ষাঁড়, যাদের কাছে সুবোধ মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেছিল কেউই কথা রাখেনি। জয়েন্ট পরীক্ষার লিস্টে নাম আসেনি সুবোধের। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল বেরোলে সেখানেও সুবোধের রেজাল্ট সেকেন্ড ডিভিশন। কিন্তু সায়েন্স নিয়ে পড়ার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য ভাব থাকে, তাই সুবোধ পাসকোর্স বিএসসি-তে ভর্তি হয়।

ভজন ডাক্তার নব্বইয়ের দশকে প্রাইভেটে এমডি পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। একুশ শতকের প্রথম দশকে এলো ম্যানেজমেন্ট কোটা। মেডিকেলে বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সরকারি কোটায় সুযোগ না পেলে বহু কলেজ ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি নেয় অধিক মূল্যে। আসলে আমাদের ক্রমশ শহুরে হয়ে যাওয়া মন বা 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখা মন গোপনে অনেক ভুল আশাকে লালন করে। ভজনও লালন করে চলেছিল, স্ত্রী রেবতীও। ছেলেকে তারা পাশ-করা ডাক্তার করে তুলবেই। খবরের

কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ম্যানেজমেন্ট কোটার জন্য যোগাযোগ করতে গিয়ে টাকার অঙ্ক শুনে ভজন ডাক্তার দিশেহারা হয়ে পড়ে। সময়কালের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে, ভজনের পসারও সংকীর্ণ হয়েছে। সব মিলিয়ে ডাক্তারি পড়ানোর খরচ সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পিতৃসত্তা অন্য কথা বলে যে—

> *"... দাদু ডাক্তার, বাবা ডাক্তার, দুজনে কেউ আসলে ডাক্তার ছিল না। দুই পুরুষের প্রত্যাশার মেঘ তৃতীয় পুরুষে বৃষ্টি হয়ে নেমেছে।"*[১০০]

ঠিক এভাবেই আমাদের সমাজ সন্তানদের মধ্যে নিজের স্বপ্নকে পূরণ করতে চায়। আসলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সংকটই নয় পিতামাতার সন্তানকে লালনের সংকটকেই ঔপন্যাসিক নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ভজন ডাক্তার হাতুড়ে ডাক্তার। সে সার্টিফিকেট দিলেও তার মূল্য নেই। কিন্তু কোনো পাশ-করা ডাক্তারের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট অনেক মূল্যবান। ফলে ছেলেকে পাশ-করা ডাক্তার তৈরি করাই তার লক্ষ্য। তাই এলোপ্যাথি ডাক্তারি পড়তে না পারেন অন্তত হোমিওপ্যাথি পাশ করা ডাক্তারিও যদি পারে তাও চলবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার জয়েন্ট পরীক্ষায় বসার অপেক্ষা করা সুবোধের জন্য বৃথা। কারণ সে যে কোনো বারই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না সে ব্যাপারে ভজন নিশ্চিত। তাই ডাক্তারি পড়াবার এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে সময় চেয়ে নেয় ভজন।

চিকিৎসা ব্যবস্থার হালহকিকত সম্পর্কে ভজনের সামনে অন্যজগতের পরিচয় স্পষ্ট হয়। সুবোধের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একজন মেধাবী ছাত্রের জোগাড় এবং ব্যবস্থা 'ফিউচারর্স বিল্ডার্স' সংস্থাই করে দেবে। এর আগে টাকা জোগাড় করার জন্য ভজন মৃধা কিডনি বিক্রি করার কথা ভাবে। নিত্যানন্দ পাড়ুই নামের এক কিডনির দালালের সঙ্গে যোগাযোগও করে। হাতুড়ে ডাক্তারের কিডনি পাচার করার পদ্ধতিও বলে দেন পাড়ুই বাবু। কিন্তু ভজনের ভীরু ও দোলাচল মন সে কাজে মনসংযোগ ঘটাতে পারেনি। তাই নিজের কিডনি বিক্রি করে ছেলেকে পড়ানোর ভাবনাও মাথায় আসে ভজনের। কিন্তু সে পথে পা বাড়াতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। অবশেষে শুটিয়ার ভিটে বাড়ি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করার কথা ভাবে ভজন মৃধা। কারণ নিজের পথে কোনো মতেই ছেলেকে আনতে চায় না ভজন ডাক্তার। তাই ফিউচার বিল্ডার্সের এজেন্টদের সে বলে—

> *"আমার ছেলেকে আমি কোয়াক বানাব না, কিছুতেই না। বরং মুদি দোকান করবে, সেলসম্যান হবে, বরং প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি করবে, কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার হবে না।"*[১০১]

ছেলে সুবোধকে যে কোনো উপায়ে ডাক্তার তৈরি করতে হবে। তার জন্য এজেন্টদের জোগাড়

করা মেধাকে কিনে ছেলের হয়ে তাকে দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানোতে রাজি হয়ে যায় ভজন ডাক্তার। যে কোনো ভাবে এলোপ্যাথি ডাক্তার হতে পারলেই যুদ্ধ জয়। পিতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বাঞ্চনীয়। কারণ, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বই পড়েও হওয়া যায় বা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেও। কিন্তু বাজারে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের গুরুত্ব কম। কিন্তু হোমিওপ্যাথির ডাক্তারও গর্বের সঙ্গে গলায় স্টেথোস্কাপ ঝোলাতে পারে যা ভজনের মত কোয়াক ডাক্তারদের বাধে। ফলে কঠিন দোলাচলতার মধ্যে পড়ে যায় ভজন। কোন পথ সে বেছে নেবে? ছেলের মধ্য দিয়ে সে আসলে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছেকে পোষণ করতে চেয়েছিল। আজ পৈতৃক ভিটে বিক্রি করে টাকা জমিয়ে ছেলেকে জাল সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিতে নিজের অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। রাতে ছ'মাস ধরেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয় তাকে। আজ যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি ভজনের ঘুমকে কেড়ে নিয়েছে। সামান্য ঘুম এলেও অজস্র স্বপ্ন তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আসলে জাল ডিগ্রি বা জাল পরীক্ষা দিয়ে ছেলেকে অনিশ্চয়তার মধ্যে বা মিথ্যের বেড়াজালের মধ্যে ঠেলে দেওয়া পিতৃসত্তাকে ভজন ডাক্তার মেনে নিতে পারে না। সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। রেবতী আর অপর্ণা আলাদা ঘরে ঘুমোয় বলে রেবতী ভজনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে সকাল বেলা। সুবোধ আর অপর্ণাও বাবার কাছে এসে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। উপন্যাসের শেষে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার চিত্র উপস্থিত হয়। আসলে এখান থেকেই হাতুড়ে ডাক্তারের আক্ষেপ এবং ভজন ডাক্তারের আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার চিত্র স্পষ্ট হয়। ভজন ডাক্তারকে চিকিৎসা করানোর দৃশ্যে সে চিত্রটি ধরা পড়েছে—

> *"ডাক্তার বড়ুয়া জিজ্ঞাসা করলেন ক'টা বড়ি খেয়েছিলেন ভজনবাবু? ভজন বলল— গুণিনি। কিন্তু আজ আমায় একবার ডাক্তার মৃধা বলা যেত না। ডাক্তার?"*[১০২]

উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কমলের আত্ম অনুসন্ধান। এই ভাগে ব্যক্তিসত্তা পিতৃপরিচয় নামে চিহ্নিত। নিঃসন্তান কমল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে বহু রোগীর রোগ নিরাময় করলেও নিজের চিকিৎসার ওপর কমলের আস্থা ছিল না। আসলে হোমিওপ্যাথি লাইনে আসারও একটা ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস কমলকে নিজের পেশার ওপর একনিষ্ঠতা আনতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ঔপন্যাসিক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কমলের পারিবারিক সূত্রের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়টির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কমলের ঠাকুরদা কলকাতার বরানগর অঞ্চলের মিত্তিরদের বাগানবাড়ির নায়েব ছিলেন। বাগানবাড়িতে কমলের বেড়ে ওঠা। বাগানবাড়ি ধীরে ধীরে দখল হল, শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হল। বিশ শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকের

বাড়ির বন্টনের চিত্র একুশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ে দাঁড়িয়ে পোড়ো বাড়ির রূপ নিয়েছে। কমলেরা পাঁচভাই এবং দুই বোনের বেড়ে ওঠা এ বাড়ি থেকেই। কমল চতুর্থ নম্বরের পুত্র সন্তান। বড় দাদা লন্ড্রি ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় বরানগর মিউনিসপ্যালিটিতে চাকরি করেন। তার নিজস্ব ফ্ল্যাট রয়েছে। তৃতীয় দাদা সাইনবোর্ড লেখা দিয়ে কর্ম জগতে পা রাখার পর অন্য কাজেও মনোযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু দাঁড়াতে পারেননি। তিনি দেনার দায়ে সুইসাইড করেন। সুইসাইডের পর ৩ জন মহিলা নিজেদের তাঁর স্ত্রী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন সন্তান কোলে হাজির হয়েছিল বটে। কিন্তু দ্বিতীয় দাদার মধ্যস্থতায় সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। কমলের পরের ভাইটি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। রাঁচিতে থাকে, ভাইদের সঙ্গে তার যোগাযোগ কম।

এবারে কমলের বৃত্তান্ততে আসা যাক। কমল কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করেছে। ভালো নম্বর না থাকায় এমএসসি পড়া হয়নি। মধ্যবিত্ত সন্তানের চিরাচরিত ধারা টিউশনি করা। কমল সে পথ বেছে নেয় সঙ্গে টাইপ শিখেছিল। লিভার নাইট্রেট তৈরির ল্যাবরেটরিতে প্রথম কাজে হাতে খড়ি। ল্যাবের মালিক নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়ে সুইসাইড করেন। এরপর লেদ কারখানায় টাইপিস্টের চাকরি এবং মালিকের ছেলেকে টিউশন পড়ানো শুরু হয়। এরপরেই স্থায়ী কাজের ইচ্ছে থেকে হোমিওপ্যাথি পড়তে ডিএমএস -এ ভর্তি হয়ে যায় কমল। হোমিওপ্যাথি পড়াবার একটা চল শুরু হয়েছিল মধ্যবিত্ত পরিবারে। কারণ অন্য কোন গতি না থাকলে হোমিওপ্যাথি পড়ে স্থায়ী কর্মযোগ শুরু করা যায়।

পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত কমল হোমিওপ্যাথি ক্লাস শুরু করেছিল। হোমিওপ্যাথিতে বারবার প্রাণশক্তির কথা আসে। কিন্তু সেই প্রাণশক্তির অভাবই যেন তাড়া করে বেড়ায় কমলকে। অ্যালোপ্যাথির নিন্দা দিয়ে ক্লাস শুরু হয়েছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা রোগকে গোড়া থেকে সারাতে সাহায্য করে এও জেনেছিল সে। কিন্তু কিছুতেই আত্মস্থ করতে পারছিল না কমলের কেমিস্ট্রি পড়া সত্তা। সে বারবার হোমিওপ্যাথি ওষুধের শক্তি বাড়ানোর বিষয়ে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, কারণ—

> *"কমল জানে, কোনও হোমিওপ্যাথি ওষুধের তিরিশ শক্তির পর এক আউন্স ওষুধে একটা অনুও পাওয়া যাবে না। অথচ বলা হচ্ছে যত বেশি ডাইলিউসট হবে, ওষুধের শক্তি তত বাড়বে।"*[১০৩]

মনে বহু প্রশ্ন এবং সমাধান না থাকা দিয়েই কমল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের যাত্রা শুরু করে। একটা জিজ্ঞাসা ছিল তার। জিজ্ঞাসার নিরসন শুরু হয় প্র্যাকটিস দিয়ে। কমল চিকিৎসকের যাত্রা শুরু করে এই উপলব্ধিতে পৌঁছায়— মানুষের শরীরই হল হোমিওপ্যাথির পরীক্ষাগার। অনুমান করে ওষুধ

দিয়ে বহু অসুখ সে সারিয়েছে। হোমিওপ্যাথির সদৃশ বিধান মেনে সে চিকিৎসা করে চলেছে। বহু রোগী সুস্থও হয়েছে তার চিকিৎসায়। তাই সে ঠিক এই উপলব্ধিতে পৌঁছায়—

"কমল হোমিওপ্যাথিই সত্য— এরকম তীব্র মতবাদে বিশ্বাসী নয়। নির্বিকল্প কর্ম করে যায়। কর্ম করো ফল চেও না গোছের। কিন্তু ফল না হলে রুগি সন্তুষ্ট হবে কেন? কিন্তু কিছু কিছু ফল, ফলে নিশ্চয়ই। নইলে চেম্বারে রুগি হবে কেন?"[১০৪]

যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে নানা প্রশ্ন। তারা মনে করেন বিশ্বাস হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। কমল রোগীর গলায় মাছের কাঁটা ফুটে যাওয়া বিষয়ে সাইলেসিয়া প্রয়োগ করে সারিয়েছে বটে। কিন্তু নিজে সাইলেসিয়ার মধ্যে দুটো মাছের কাঁটা ডুবিয়ে রেখে প্রমাণ পেয়েছে সে কাঁটা গলেনি। এর কারণ কী? কীভাবে রোগীরা সেরে উঠেছে এবং কমলকে বিশ্বাস করছে সে তত্ত্ব কমলের জানা নেই। কমলের স্ত্রী রুমারও কমলের ওপর বিশ্বাস ছিল। রুমা ওর মায়ের সঙ্গে কমলের কাছে এসেছিল। রুমার অম্বল, দাঁতের ব্যথা সবই সেরে গিয়েছিল কমলের ওষুধে। রুমা পিতৃহীনা, মায়ের কাছেই বড় হয়। মা মারা যাবার পর কমলই তার আশ্রয়স্থল হয়। কমল-রুমা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। কমলের বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হওয়ায় রুমার বাড়িতেই থাকতে শুরু করে। দু'জনের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। কিন্তু বছর চৌত্রিশের রুমা আর বছর পঁয়ত্রিশের কমলের জীবনে আসে দুর্যোগ। রুমার ওভারিতে সিস্ট ধরা পড়ায় তাদের সন্তান আগমনের পথে চিরতরে সমাপ্তি চিহ্ন উপস্থিত হয়। নিঃসন্তান কমল তার ডাক্তারি চিকিৎসায় বহু শিশুর অসুখ সারিয়েছে। শিশুদের সুখ নিজের হাতের স্পর্শে অনুভব করেছে। কিন্তু রুমার সে সুযোগ হয়নি।

জীবন তো মানুষকে কত রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়। কমলের জীবন এক বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হয়। বছর সাতান্নর কমলের হাই সুগার। যার জন্য সকালবেলা একটু হাঁটাহাঁটির অভ্যেস তৈরি করেছে। গঙ্গার ধারে হাঁটতে গিয়ে একদিন এক চার-পাঁচ বছরের শিশুকে সাদা পায়খানা করতে দেখে কমল। শিশুটিকে লক্ষ করে তার কাছে গিয়ে কমল জানতে পারে, সে বমিও করে বারবার। হেপাটাইটিস ভাইরাসের সন্দেহ হয় কমলের। ছেলেটি যে ঝুপড়ির দিকে যায় সেই বস্তি এলাকায় কমল তাকে অনুসরণ করে পৌঁছে যায়। কিন্তু শিশুটির নাম আমিনুল শোনার পর তাকে নিয়ে উৎসাহে ভাটা পড়ে। তবে সাম্প্রদায়িক ভাবনার জন্য কমল তার চিকিৎসক সত্তাকে বিসর্জন দিতে পারেনি। আমিনুলের জন্য ওষুধ নিয়ে সে একদিন বস্তিতে উপস্থিত হয়। আমিনুলের মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় কমলের। তার নাম ঝর্ণা। হিন্দু ঘরের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল

মুসলিম ছেলের সঙ্গে। আমিনুলের বাবা ঝর্ণাকে তালাক দিয়ে চলে গিয়েছে। ঝর্ণা মাছ বাজারে মাছ কুটে রোজ ষাট সত্তর টাকা উপার্জন করে সংসার চালায়। নিজে উপযাচক হয়ে কমল আমিনুলের জন্য ওষুধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বস্তিতে। এতদিনে কমল ডাক্তারের নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল। ঝর্ণা কমলের নাম জানলেও কমল ডাক্তার যে আজ তার সামনে দেবদূতের মত উপস্থিত হয়েছে সেটা তার কাছে অকল্পনীয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কমলের পসার বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু কমল নিজের ওপর আস্থা তৈরি করতে পারেনি। ফলে নিজের বা রুমার প্রয়োজনে বারবারই তাকে অ্যালোপ্যাথির দ্বারস্থ হতে হয়েছে। রুমা হার্টঅ্যাটাকের শিকার হয়। ব্লক ধরা পড়ে। কমল জানে, বিশ্বাস অনেক অসুখ সারাতে পারে। তাই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এবং প্রাণায়মকেও যুক্ত করে দেয়। রুমার অসুস্থতার জন্য কমলের অসুবিধা সৃষ্টি হয় চেম্বার সামলে সংসারের কাজ করার ক্ষেত্রে। আমিনুলের মায়ের কথা মনে হলেও কমলের মনে এক বাধা উপস্থিত হয়। কারণ ঝর্ণার কাছেই কমল জানতে পারে যে ঝর্ণার প্রকৃত বাবা মিত্তির বাগানের নায়েব বাড়িতে থাকত এবং সুইসাইড করে তিনি মারা যায়। পূর্বের বাবার মৃত্যুর পর ঝর্ণার মা দ্বিতীয় বিয়ে করে। ঝর্ণা তার প্রকৃত বাবার নাম জানে না। কমল ঝর্ণার পিতৃ বৃত্তান্ত শুনে আটাশ বছর আগে সেজদার মৃত্যুর পর এক মহিলা কোলে কন্যা সন্তান নিয়ে নিজেকে স্ত্রী হিসাবে দাবি করে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে মিল পায়। মনে মনে কমল ঝর্ণাকে তার বংশধর ভাবতে থাকে। ফলে এক পলায়নবাদী মনোভাব তার মধ্যে কাজ করে। এক জিজ্ঞাসা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। ঝর্ণা কী তার সেজদার সন্তান ? তাহলে আমিনুল তার নাতি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মতো তার জীবনে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আসে অঙ্ক মেলানোর তাগিদ, প্রমাণ করার ইচ্ছে।

কমলের জিজ্ঞাসার নিরসন হয়। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ‘নেচার’-এর একটি লেখা পড়ে। হ্যানিম্যান সাহেবের পর ড. বুভুনোস্কি-র আবিষ্কারে পদার্থের স্মৃতি নিয়েই কাজ হয়েছে। কিন্তু সমালোচকদের সামনে প্রমাণ করতে বুভুনোস্কি ব্যর্থ। কমলের প্রতীক্ষার শেষ নেই। সে অপেক্ষা করে হোমিওপ্যাথি নিয়ে একদিন ঠিক প্রকৃত সত্য বাইরে বেরিয়ে আসবে। জীবনের চলমানতায় তো স্মৃতিটুকুই পড়ে থাকে। রুমার ছবিও কমলের জীবনের স্মৃতি হয়ে রইল। কমল একদিন বাইক আক্রান্ত হয়ে চোট পেল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই তার আশ্রয় হল। ঝর্ণা আমিনুলকে নিয়ে কমলের বাড়িতে উপস্থিত হয়। বাড়ির কাজকর্ম থেকে কমলের সেবা পর্যন্ত শুরু করে সে। কমল সুস্থ হয়। আবার চেম্বারে যাওয়া শুরু হয় তার। মাথার চোটে ব্যথার কারণে হোমিওপ্যাথির উপর তার অনেকটাই ভরসা। একদিন আমিনুলকে রেখে ঝর্ণা পালিয়ে যায়। আর ফিরে আসে না।

আমিনুল কমলের কাছেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কমল দ্বিধা প্রকাশ করে না। এক সাধ পূরণের স্মৃতি সামনে ভেসে ওঠে। আমিনুলকে ফেলতে পারে না কমল। সেজদার স্মৃতিটুকু আমিনুলের মধ্যে সে খোঁজার চেষ্টা করে। আমিনুলের পিতৃপরিচয় জানার কোনো আগ্রহ কমলের মধ্যে জাগল না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় স্মৃতিই তার যেমন একমাত্র ভরসা, আমিনুলের ক্ষেত্রেও সেই স্মৃতিই আস্থা। জীবন নিয়ে কমলের জানার ইচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার স্মৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে চেয়েছিল— যে চিকিৎসা করে সে সবার বিশ্বাস অর্জন করেছে সেই চিকিৎসার বাস্তব ভিত্তি যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সব জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে। তাই সে অপেক্ষা করে, আগামী দিনে সে পথের আবিষ্কারক কেউ আসবেই। তাই জীবনের চলমানতাকে সে স্বীকার করে বাঁচতে চায়।

উপন্যাসের তৃতীয় ভাগ 'অ্যালোপ্যাথ'-এর সত্তাগত পরিচয়কে ঔপন্যাসিক 'পিতৃঋণ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ডা. মৃত্যুঞ্জয় মাসচটকের বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু অ্যালোপ্যাথের ডাক্তার। গড়িয়ায় তার চেম্বার। বাড়ি করেছেন খোলায়। ডাক্তারির পসার বেশ সুপ্রসিদ্ধ। 'মৃত্যু ডাক্তার' বলেই এলাকায় তিনি পরিচিত। দিনে প্রায় পনের হাজার টাকা তিনি চেম্বার থেকে উপার্জন করেন। অন্য ডাক্তারদের মত তিনিও অতিরিক্ত উপার্জন করেন বিভিন্ন সূত্র থেকে। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পৈতৃক ভিটে ঝাপানডাঙ্গায়। পিতা ব্রজবিহারী মাসচটকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবার জন্য বড় ব্যবসায়ী হতে পারেননি। মৃত্যুঞ্জয়ের ঠাকুরদা ছিলেন জমিদারের নায়েব। স্বাধীনতার পরে জমিদারী উচ্ছেদ, ভূমিসংস্কার আইন সব মিলিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বাবার মৃত্যুর পর জমি এবং বাড়ি দেখাশুনো করে মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়তুতো ভাইয়েরা। মৃত্যুঞ্জয় আজ পিতৃঋণের দায়ে গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। বাবার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎযাপন করবেন তিনি। সেদিন বাবার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করবেন তিনি। ডাক্তার বসাবেন। ডাক্তারদের কিছু পারিশ্রমিকও দিতে চান। তবে দীর্ঘদিন বাদে গ্রামে পৌঁছে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামেও যে ধীরে ধীরে নগরায়ণের প্রভাব পড়েছে সে ছবি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন তিনি। মৃত্যুঞ্জয়বাবু প্রথমেই উপস্থিত হন বাল্যবন্ধু তারক গড়াইয়ের কাছে। তিনি এলাকার কোয়াক অর্থাৎ হাতুড়ে ডাক্তার। পসার তিনি ভালোই জমিয়েছেন। এক কথায় তাকে চেনেন এলাকার সব মানুষ। মৃত্যুঞ্জয় আর তারক কৈশোর কালের সব শিক্ষায় একে অপরের সহযোগী হিসেবেই বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের ডাক্তারি পড়তে গ্রামের বাইরে চলে যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে সম্পর্কে ভাটা পড়ে। মৃত্যুঞ্জয় আসলে তারককে নিজের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসাতে চান বলেও তাঁর কাছে এসেছেন। তারকবাবু রাজিও হয়ে যান। এবার

গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার দিদিমণিকে যদি মৃত্যুঞ্জয় রাজি করাতে পারেন তাহলে নিশ্চিন্ত।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সাক্ষাৎ হল এমন এক ডাক্তারের সঙ্গে যিনি নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের রোগীদের সেবাদান করে চলেছেন। আজকের মানবিক অবক্ষয়ের যুগে ডাক্তারি শপথ পালন করতে দেখা যায় খুব কমজনকে। কারণ ডাক্তারি পড়া মানেই প্রচুর টাকা উপার্জন করার পথ খুলে যাওয়া। কিন্তু ডাক্তার দিদিমণি সে পথে না হেঁটে নিজের চাকরির প্রতি একনিষ্ঠ। মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রামের রূপটিও যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জলপড়া, পানিপড়া, ঝাড়-ফুক, মাদুলির পরিবর্তে আজ সবাই ডাক্তার দিদিমণির কাছে হাজির। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা একটা গ্রামকে এতটা পরিবর্তন করতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণার বাইরে। দিদিমণির চিকিৎসা করার ধরণ দেখে মৃত্যুঞ্জয় নিজের কার্যসিদ্ধির কথা ভুলে গেলেন। এক সাপে কাটা মহিলার হাসপাতালে আসার পর তার কী হয় সেটা দেখার জন্য রোগীর আত্মীয়ের মত সেও অপেক্ষা করতে থাকে। আসলে গ্রামের মানুষগুলোর মতো সেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর আস্থা ফিরে পেল যেন। আসলে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির যত উন্নতি হয়েছে ততই এই পদ্ধতিতে কলুষতার ছাপ এসে লেগেছে। সাপে কাটা বউটি সুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার দিদিমণি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করেন। মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার দিদিমণি ইন্দ্রানী রায়ের ভাড়াবাড়িতে উপস্থিত হন। এক রিকশাওয়ালা রোজ দিদিমণির বাড়িতে যাওয়া-আসা করেন। তার রিকশা করেই গুড়াপ স্টেশন থেকে রওনা হলেন। ইন্দ্রাণী রায়ের সিগারেট খাওয়ার সংযোগ লক্ষ করে তিনি যে আধুনিক মানসিকতার সেটা মৃত্যুঞ্জয়বাবু বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ডাক্তারি শপথকে এতটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে এর আগে তিনি কাউকে দেখেননি। তবে ইন্দ্রাণী রায় মৃত্যুঞ্জয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসতে রাজি হয়েছেন। এটাই মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে অনেক বড় পাওনা। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে ডাক্তার দিদিমণির পূর্ব ইতিহাস প্রকাশ হয় রিকশাওয়ালার মাধ্যমে। রিকশাওয়ালাও গাছ-পালার ওষুধ দিতে জানে বলে দিদিমণি তাকে স্নেহ করেন। দুঃস্থদের পাশে এই দুই চিকিৎসক বিনে পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করে বলে দু'জনের মধ্যে সম্মানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দিদিমণির পারিবারিক কাহিনিও রিকশাওয়ালাটি জানে। তার কাছ থেকে মৃত্যুঞ্জয়বাবু জানতে পারেন ইন্দ্রাণী রায়ের বাবাও একজন ডাক্তার। কিন্তু তিনি চিকিৎসার নামে মানুষ ঠকিয়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। এই বিষয়টি ইন্দ্রাণীর পছন্দ নয়। তাই ঠাকুমাকে নিয়ে চাকুরিস্থলে তিনি চলে এসেছেন। সেবাব্রতকে সঙ্গী করে তিনি পথচলা শুরু করেছেন। রিকশাওয়ালাও তার বাবার প্রদত্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি জানে। এবং বিনে পয়সায় চিকিৎসা করায় বলে উঠে এসেছে ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা—

"আমার ঠাকুরদা ছিল রোজা। রোজা মানে বোঝেন তো? ওঝা, ওঝা। জড়িবুটি দিতেন। কম বয়সে মরে যায়। বাবা বেশি বিদ্যে শিখতে পারেনি। যেটুকু শিকেছে, আমাকে দান করি গেছেন। বুঝলেন বাবু। বাপ আমাকে ওষুধের গাছ দে পয়সা নিতে বারণ করে গেছেন। কয়েছেন গাছ তো ভগবান দেছেন। ফিরি। সেই গাছ দিয়ে পয়সা লিবি কেন? খেটে খাবি।"[১০৫]

রিকশাওয়ালার নাম শিবা। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মনে হয় 'সেবা' হওয়া উচিত। নীতিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় মানুষ ভুল করে বসে। শিবাও ভুল করেছিল। এক গর্ভবতী নারীর চিকিৎসা করে পাঁচ'শ টাকার লোভ সামলাতে পারেনি। শিবার মনে হয়েছে তার লোভের জন্যই পরের দিন ঘাড়ে ঘা উৎপন্ন হয়েছে। এই সব চিত্র দেখে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সামনে পৃথিবীর এক সুন্দর রূপ ফুটে ওঠে। কিন্তু নিজের প্রতি জন্মায় অশ্রদ্ধা। কারণ তিনি চিকিৎসক বটে কিন্তু সেবাব্রতী নন। অর্থের প্রলোভনকে তিনি দূরে সরাতে পারেননি। তবে পৃথিবী যে ভালো কিছু এখনো ধারণ করে রয়েছে তার উদাহরণ শিবা এবং ইন্দ্রাণী রায়। আসলে জীবন যুদ্ধে আমাদের সামনে বহু ঘটনার সংস্পর্শ উপস্থিত হয়। সেই ঘটনা আমাদের আত্মিক উন্নতি ঘটায়; অবনমনও। মৃত্যুঞ্জয়বাবু পিতৃঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তার মনে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়েছিল; তিনি যে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করবেন সেখানে বসার মত ডাক্তার পাওয়া যাবে কিনা। ইন্দ্রাণী রায়ের মত ডাক্তারের সান্নিধ্য মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে সে চিন্তা থেকে মুক্ত করে। তিনি জীবন সম্পর্কে এক নতুন ভাবনা পেলেন— বর্তমান সমাজে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাব্রতী মানেই তিনি অর্থ উপার্জনের চাবি হাতে পেলেন। ডাক্তারি শপথ পালন না করার দিকেই আমাদের চিকিৎসকরা ধাবমান। কিন্তু মানবিক অবক্ষয়ের দিনে ইন্দ্রাণী রায় এবং শিবার মতো রিকশাওয়ালাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। আসলে কোনো কিছুই যে ঠেকে থাকে না, ভালো সত্ত্বার মৃত্যু ঘটে না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে তারও উদ্ভব হয় এবং আমাদের সামনে আশার আলো নিয়ে উপস্থিত হয়। জীবন জিজ্ঞাসার নিরসন এভাবেই মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সামনে উপস্থিত হয়েছে।

চতুর্থ ভাগের নাম 'ডাক্তার, বিশেষণহীন'। উপন্যাসটি 'ধর্মপিতা' নামের এক সত্তার অনুসন্ধান। পটভূমি রচিত হয়েছে গ্রামবাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। সাদিয়া আটমাসের গর্ভবতী। রোজার মাস চললেও মৌলবী সাহেবের নির্দেশে সে রোজা রাখেনি। বাড়িতে শ্বশুর, দ্বিতীয় শাশুড়ি, স্বামী এবং দেওর রয়েছে। প্রথম শাশুড়ি একবছর আগে মারা গিয়েছেন। তিনি পান-দোক্তা খেতেন। ফলে মুখে ঘা থেকে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী লতিফ সাদিয়ার থেকে সাত

বছরের বড়। দেওর শাকুর। বিয়ে হয়নি। লতিফ অটো চালায়। লতিফের পুরনো ভ্যান শাকুরকে দিলে সে ভাড়া খাটায়। এছাড়া শাকুর একটা মোবাইল রিচার্জের দোকান খুলেছে। সঙ্গে নেতার চামচাগিরিও করে। একাকী সাদিয়া সংসারের কাজ সামলে রোজার রান্না করে। কী করে ভালো রান্না করে খাওয়াবে সেই চেষ্টাই সে করে। পুকুর থেকে শাক তুলতে গিয়েই বিপত্তি উপস্থিত হয়। সাদিয়াকে সাপে কাটে। মাথা ঘুরে পড়ে যায় সাদিয়া। সাদিয়ার শাশুড়ি খলিলা ও পাড়া প্রতিবেশি উপস্থিত হয়ে সাদিয়াকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। লতিফ আর শাকুরকে খবর দেয় প্রতিবেশিরা। ইমাম সাহেব উপস্থিত হন। তিনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বিধান দেন। শাকুর হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। অটো করেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্তান এবং মায়ের মধ্যে মাকেই বাঁচাতে পারবেন বলে ডাক্তার সুবিমল আচার্য জানান। কিন্তু লতিফ আপত্তি জানায়। আসলে বিয়ের চার বছর পর সাদিয়ার গর্ভধারণ। সন্তানসুখ থেকে সে বঞ্চিত হতে চায় না। সাদিয়া এবং সন্তান দু'জনকেই লতিফ সুস্থভাবে ফিরে পেতে চায়। আসলে সুবিমল ডাক্তারের কাছে গর্ভবতী সাপে কাটা রোগী এটাই প্রথম। ফলে সন্তান প্রসব করিয়ে অ্যান্টিভেনাম দেবেন, না প্রসবের আগেই দেবেন— সেটা নিয়ে তার দ্বিধা উপস্থিত হয়। যা হোক, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি এভিএস প্রয়োগ করেন। কিন্তু একদিন কেটে গেলেও সাদিয়ার অবস্থার পরিবর্তন হয় না। বারাসাত হাসপাতাল থেকে তাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়।

মেডিকেল কলেজে বেড খালি না থাকায় মেঝেতে শুইয়েই সাদিয়ার চিকিৎসা শুরু করেন মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারবাবু অংশুমান তালুকদার। আসলে সাপে কাটা রোগীদের নিয়ে বিশেষ কোনো সিলেবাস তৈরি হয়নি আমাদের দেশে। তবে অংশুমানবাবুর বাঁকুড়া পোস্টিংয়ের পর বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়। ডাক্তারি পড়ার সিলেবাস নিয়ে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য আমাদের দেশের অবস্থাকেই চিহ্নিত করে—

> *"আসলে ভারতে ডাক্তারি সিলেবাসটা বানিয়েছিল ইংরেজরা। ওদের দেশের রীতি এবং অসুখ-বিসুখগুলো সামনে রেখেই তো সিলেবাস বানানো হয়েছিল। স্বাধীনতার বহু বছর পরেও জ্বর হলে বার্লি পথ্য দেওয়া হত। কারণ ওদের দেশে চাল হয় না, বার্লি হয়। আজকাল ডাক্তারবাবুরা বলেন পাতলা করে খিচুড়ি খেতে পারেন। ইউরোপের ঠাণ্ডা দেশগুলোতে সাপের উপদ্রব নেই। সিলেবাসে সাপে কাটার চিকিৎসাও ছিল না। অনেক পরে কিছুটা ঢোকানো*

হয়েছে। আসলে সাহেবরা গুরুত্ব দেয়নি বলে পরবর্তীকালেও গুরুত্ব পায়নি।'[১০৬]

উপন্যাসের চতুর্থভাগে অংশুমান তালুকদারের চিকিৎসক হিসেবে পরিচয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। রোগীর বাড়ির লোকেরা ক্ষিপ্ততার পরিচয় দেয় বলে অংশুমানবাবু তাদের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে নিজের সেবাব্রত পালন করতে শুরু করেন। সাদিয়ার জ্ঞান ফিরলে ডাক্তারবাবু তাকে আশ্বস্ত করেন এবং সাহস দেন। সাদিয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে উদ্বেগ পোষণ করলে অংশুমানবাবু স্টেথোস্কোপের সাহায্যে তার হৃদস্পন্দন শুনিয়ে দেন। ডাক্তার অংশুমান তালুকদার সাদিয়ার অবস্থা শোচনীয় অনুমান করে তার দ্রুত ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করেন। সঙ্গে ব্ল্যাডব্যাঙ্কে রক্তের যোগানের জন্যও যোগাযোগ করেন। সাদিয়ার পরিবারকে রক্তদান করার জন্য উৎসাহও যোগান। শুধু এখানেই থেমে না থেকে তিনি সাদিয়ার বাচ্চা প্রসব করান দায়িত্ব নিয়ে। পুত্রসন্তানের পিতা হয় লতিফ। কিন্তু বিপদ উপস্থিত হয় পরে। সাদিয়ার জন্য কুড়ি জনকে রক্ত দান করতে হবে। কিন্তু সেটা জোগাড় করা একদিনে সম্ভব নয়। অংশুমান তালুকদারের হিপোক্রিটিসের শপথের কথা মনে পড়ে যায়। মানুষকে মারা নয়, বাঁচানোই ধর্ম। প্রফেসর অংশুমান তালুকদার ক্লাসে ছাত্রদের সাহায্য চাইলেন। তিনি তাদের ডাক্তার হওয়ার প্রথম শপথটার শুরু ক্লাস করাতে করাতেই শিখিয়ে দিলেন। প্রত্যেকেই রাজি হলেন রক্তদান করে প্লাজমার দ্বারা 'স্নেক বাইট'-এর পেশেন্টকে বাঁচানোর ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষি হয়ে থাকতে। আসলে অভিজ্ঞ ডাক্তার অংশুমানবাবু জানতেন, ভালো কিছু করার শুরুটা করা প্রয়োজন। ডাক্তারদের ওপর প্রায়ই বিশ্বাসহীনতার উদাহরণ উঠে আসে আমাদের সামনে। অংশুমান তালুকদারের নেওয়া পদক্ষেপ সেই বিশ্বাসহীনতার পরিমণ্ডলে আশার আলো। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধর্মপিতার স্থান যেন অংশুমান তালুকদারের প্রাপ্য।

উপন্যাসের পরিমণ্ডল এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে। সাদিয়া নিজের সন্তানের নাম অংশুমান রাখতে চায়। কিন্তু মুসলমান ঘরের সন্তানের নাম হিন্দুর সন্তানের মত হয় কী করে? লতিফ তো চেয়েছিল ছেলের নাম রাখবে আয়মন অর্থাৎ পুণ্যবান। লতিফের বাবা কাদের মিঞা অংশুমান নামে আপত্তি করলেন। তিনি চাইলেন অংশুমানের 'মান' আওয়াজটা দিয়ে মইন পাওয়া যায়। সেখান থেকে মইনউদ্দিন রাখা যেতে পারে। কিন্তু লতিফের সে নাম পছন্দ নয়। লতিফ জানে অংশু মানে চাঁদ। তাই চাঁদ দিয়ে নাম খুঁজে বের করতে বললে কাদের মিঞা 'বদর' এর অর্থ পূর্ণচন্দ্র উদ্ধার করেন এবং ঐ নাম রাখতে পরামর্শ দেন। বদরউদ্দিন নামটি সাদিয়ার পছন্দ

নয়। লতিফকে সে জানিয়ে দেয়। তারা যে নামেই ডাকুক না কেন সাদিয়া অংশু বলেই ডাকবে। লতিফের কাছে ঈশ্বরের মহিমা স্পষ্ট হয়। স্পষ্ট হয় জাতিভেদ প্রথার ভিতরের প্রকৃত সত্য। সে বুঝেছে মানুষের পরিচয়ই আসল সত্য। রক্ত কখনো আলাদা হয় না। রক্তের গ্রুপই আসল কথা বলে। প্রাণের প্রয়োজন সমস্ত জাতিভেদকে নস্যাৎ করে। সাদিয়ার রক্তের গ্রুপ 'ও' লতিফ জেনেছে। তার জন্য 'বামুন', বাগদি, মুচি,মুসলমান মানুষের রক্ত সাদিয়ার শরীরে বইছে। এমনকি ডাক্তারবাবুদের রক্তও। আসলে মানুষ সব কিছুর উর্ধ্বে। ডাক্তারবাবুরা হলেন ঈশ্বরের পাঠানো দূত। তাদের চেষ্টায় সাদিয়াকে ফিরে পেয়েছে লতিফ। এই সত্যটাই সে তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। লতিফের বাবা ভাবতে থাকে পৃথিবীতে সুদিন ফিরে এসেছে। কিন্তু সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটে না সহজে। একদিকে সম্প্রীতির চিত্র বুকে নিয়ে ঘরে ফিরছে লতিফ, কাদের, সাদিয়ারা। অন্যদিকে খবরের কাগজে উঠে এসেছে ধর্মস্থানে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চিত্র। উচ্চবর্ণের পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল বলে নিম্নবর্ণের মানুষের বস্তিতে গুলি বর্ষণ। রক্তাক্ত মৃতদেহের চিত্র খবরের কাগজের পাতা জুড়ে। মানুষের ভেদাভেদ নিরন্তর চলতেই থাকবে। এরই মধ্য থেকে উঠে আসবে সম্প্রীতির বার্তাবাহক মানুষেরা।

উপন্যাসটির চারটি পটভূমি আসলে মিলিত হয় একটি আখ্যানে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার ওপরই রচিত হয়েছে 'চার ডাক্তার' উপন্যাসটি। হাতুড়ে, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথ শেষ পর্যন্ত বিশেষণহীন ডাক্তারের মুখাপেক্ষি হয়ে থেকেছে। হাতুড়ে ডাক্তার নিজের চিকিৎসার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আয়ুর্বেদকে। হোমিওপ্যাথের ডাক্তার খোঁজার চেষ্টা করেছেন অ্যালোপ্যাথের মত প্রমাণ। আর প্রয়োজনে নির্ভরশীল হয়েছেন অ্যালোপ্যাথের কাছে। অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকের হাতে যখন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তখন সেখানে দেখা দিয়েছে অবক্ষয়ের চিত্র। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেও আশার আলো দেখা যায়। ডাক্তার দিদিমণির চিত্র সেই আশার আলো। আর যখন ঝাড়-ফুক, তাবিজ-মাদুলি, ওঝা-কবিরাজের হাত থেকে মুক্তির পথ খোঁজে মানুষ তখন ডাক্তাররা হয়ে ওঠেন বিশেষণহীন। সমস্ত ডাক্তারের প্রধান ধর্ম মানুষের প্রাণ বাঁচানো। মানবধর্মই বড় ধর্ম। অংশুমান তালুকদার সে জাতীয় ডাক্তার যেখান থেকে মানুষের বাঁচার আশা জন্মায়। ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থায় ডাক্তারদের সংকট, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংকটের চিত্র উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রবল ইচ্ছে ভজন ডাক্তার, কমল ডাক্তার, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রত্যেকের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তারা কেউই পথ খুঁজে পাননি। ইন্দ্রাণী রায় এবং অংশুমান তালুকদার সে পথের প্রদর্শক। আসলে জীবন যে কত বিচিত্র তা প্রতিটি ভাগের মধ্যে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময়

চক্রবর্তী নির্মাণ করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে জীবন আমাদের সামনে নতুন প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়। বা পুরনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত করে তোলে। এক ভাবনা থেকে জীবন শুরু হয়েও অনেক সময়ই ভিন্ন ভাবনা আমাদের চালিত করে। ভজন ডাক্তার আর কমল ডাক্তার এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছেন তাদের যাপন-চিত্রে। ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু অবক্ষয়ের মধ্যে বাঁচার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। আর সমস্ত ডাক্তারেরা অংশুমান তালুকদারের পথে হাঁটতে শুরু করলে আমাদের চিকিৎসা জগতের সমূহ উন্নতি সাধন হবে। আসলে মানবধর্মই যে বড় ধর্ম সেই পাঠই উপন্যাসটির শেষতম উপজীব্য। ঔপন্যাসিক সে বিষয়টিকেই বিভিন্নভাবে তুলে ধরে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরও একটি দিককে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী পরবর্তী উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আমরা পরবর্তী উপন্যাসের দিকে এবার যাত্রা করব।

১১

‘কিছু একটা হয়ে যাবে’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে। উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে ‘এইডস’ রোগকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাসের চিত্র। উপন্যাসটির কাহিনি শুরু হয়েছে সনাতন ঋষি নামের এক মুচির ছেলের মেধাবী ছাত্র হওয়াকে কেন্দ্র করে। সনাতন ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় ভালো। বাবা কপিল ঋষি কল বসানোর কাজ করে সংসার চালান। ভালো কাজের সন্ধানে এক সময় তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে যান। সেখানে তিন বছর থেকে কিছু টাকা উপার্জন করার পর বাড়ি আসেন। কিন্তু সঙ্গে বহন করে নিয়ে আসেন ‘এইডস’ নামক মারণ রোগ। সনাতন স্কলারশিপ পেয়ে শহর কলকাতার কলেজে পড়াশুনো করে কিছুটা নজর কাড়লেও মুচির সন্তান হওয়ার মাশুল তাকে প্রতিনিয়ত দিতেই হয়। শহরের দেবকিঙ্কর ডাক্তার সনাতনকে পড়াশুনোর জন্য কিছু কিছু সাহায্য করতেন। সনাতনের বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে তিনি চিকিৎসা করতে চান। কপিলকে দেখার পর তাঁর সন্দেহ হয় এবং কলকাতায় কিছু পরীক্ষা করাতে পাঠিয়ে দেন। কপিলের স্ত্রী অর্থাৎ সনাতনের মায়ের রিপোর্টও পজিটিভ আসে, তবে বিপদজনক নয়। কিন্তু কপিলের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে এগোয়। ধীরে ধীরে পাড়া প্রতিবেশীর ভুল ধারণায় কপিলের পরিবার ‘এক ঘরে’ হয়ে যায়। অচ্ছুত পাড়ায় আরো একটি ঘর অচ্ছুত হয়ে পড়ে। সনাতনের বোনেদের ওপর এর প্রভাব পড়ে। তারা অপমান সহ্যকরতে না পেরে আত্ম্যহতা করে। সনাতনের মাকে কপিলের মৃত্যুর পর সেখানে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। দেবকিঙ্কর বাবু দয়ালু এবং দেবতা বলে পরিচিত ছিলেন তাদের এলাকায়। দেবকিঙ্করবাবু সনাতনের মা ভাগ্যলক্ষ্মীকে নিজের বাড়িতে

আশ্রয় দেন। দেবকিঙ্করবাবুর বাড়িতে শুরু হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় প্লট। সেখানে এইডস আক্রান্ত ভাগ্যলক্ষ্মীকে দেবকিঙ্করবাবুর অসুস্থ স্ত্রী চিন্ময়ী আশ্রয় দিতে রাজি না হলেও স্বামীর উপর তিনি কর্তৃত্ব ফলাতে পারেননি। দেবকিঙ্করবাবুর ছেলে জীবক রাজস্থানের বেসরকারি কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে কলকাতায় এক নার্সিংহোমে প্র্যাকটিস করে। সেখানে নানা ধরনের কাজ সে শিখে ফেলে। একবার তার গাফিলতিতে রাজনৈতিক নেতা খুন হয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে কৃষ্ণনগরে বাড়ির কাছেই নির্মিত নার্সিংহোমে কাজ শুরু করে। দেবকিঙ্কর বাবুর নামের পাশে জীবকের নাম ম্লান হয়ে পড়লেও সে আপ্রাণ চেষ্টা করে নতুন টেকনলজির সমস্ত কাজ শিখে নিতে। মা চিন্ময়ী দেবীর শারীরিক অসুস্থতায় জীবক মাকে নার্সিংহোমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিডনি ফেল হলে চিন্ময়ীদেবীর রক্তের সঙ্গে কোনো রক্ত মিল না হওয়ায় অবশেষে হঠাৎ বুদ্ধি খেলে যায় জীবকের। বাড়িতে সনাতনের মায়ের রক্তপরীক্ষার পর জানা যায় চিন্ময়ীদেবীর সঙ্গে সনাতনের মায়ের রক্তের মিল রয়েছে। তাই এইডস আক্রান্ত হলেও তার কিডনি দিয়ে মাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে ফেলে জীবক। শুধু মাকে আর বাবাকে রাজি করানোর পালা। মাকে জীবক জানালেও বাবাকে রাজি করানো দুষ্কর। কারণ এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান করা আইনত অপরাধ। আর সনাতনের মায়ের কিডনিটি নেওয়ার বিষয়ে তাদের অনুমতি নেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেনি জীবক। তাই দেবকিঙ্কর ছেলের কাজকে মেনে নিতে পারেন না। বাবা ও ছেলের কথা শুনে চিন্ময়ী দেবীর মানসিক যন্ত্রণা হয় এবং একের পর এক ওষুধ খেয়ে চিন্ময়ীদেবী সুইসাইড করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং কিছু অন্ধবিশ্বাস উপন্যাসের কাহিনির চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

উপন্যাসে সমান্তরাল কাহিনি পর পর সজ্জিত হয়েছে। তবে প্রথম প্লটে সনাতন ঋষি ও তার পরিবারের সংকটকে দেখানো হয়েছে। পরের প্লটে ডা. দেবকিঙ্কর সেন ও তার সন্তান জীবককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটির মূল আশ্রয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাস। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক সনাতনের জীবন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। ড.বি.আর. আম্বেদকর অনেক লড়াই করেছিলেন সে ইতিহাস সকলেরই জানা। কিন্তু স্বাধীনতার প্রৌঢ়ত্ব অবস্থায় আজও ভারতবর্ষীয় সমাজের তিমির দশা অপসারিত করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় একটু ঊর্ধ্বমুখী ফলে সনাতনের মতো মুচি ঘরের সন্তানদের এখনো বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। মেধার বলে পাওয়া স্কলারশিপ নিয়েও এম এসসি পড়তে গিয়েও কটুকথা শুনতে হয় অহরহ। কৃষ্ণনগরের

ডুগডুগি গ্রামে সনাতনের বাড়ি। মুচিরাই সে পাড়ার অধিবাসী। মুচি-সন্তান হওয়ার দরুণ অর্থকষ্ট তো ছিলই সঙ্গে সামাজিক বাধা সনাতনের মনে বহুভাবে প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। সনাতনের বাবা কপিল 'টিউকল', 'পাম্প' বসানোর কাজ জানত। তার হাতে বসানো কল থেকে সে কোনোদিন জল খেতে পায়নি— এ সত্য সনাতন জানে। স্যারেরা ক্লাসে একরকম মানে বোঝাতেন কিন্তু বাস্তবে ঘটত অন্য বিষয়। দেউলিয়া মোড়ে পারুলের চায়ের দোকান। পারুল জীবিত না থাকলেও তার নাম রয়ে গেছে। চায়ের দোকান বর্তমানে তার ছেলেরা চালায়। সে দোকানে দেউলিয়া, চণ্ডীতলার মানুষেরা আসে, নানা বিষয়ে চর্চা চলে। সনাতন চা খেতে গিয়েই অস্পৃশ্যতা বিষয়ে বয়স্কদের আলোচনা শুনতে পায়। যেখানে একজন ভদ্রলোক মুচি-মেথর জাতির উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। উপন্যাসের প্রাথমিক ধারায় হরিজন সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে যার প্রতিনিধি সনাতন। সনাতনের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন এক কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। সনাতনের বাবা কপিল অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করতে গিয়ে এইডস নামক মারণরোগ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এইডস নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান নানা ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে যুক্ত হলেও তার সর্বব্যাপী সুফল এখনও অধরা। এইডস-এর মতো রোগ নিয়ে মানুষের কিছু অন্ধবিশ্বাস রয়েছে। সেই অন্ধবিশ্বাসের বলি হতে দেখা যায় সনাতনের পরিবারকে। দেবকিঙ্কর ডাক্তারের সঙ্গে সনাতনের পূর্ব পরিচিতি থাকায় কপিলের রোগ নির্ণয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে চাইলেও তা সবার কাছে জানাজানি হয়ে যায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ট্রাপিক্যাল বিভাগ থেকে সনাতনের রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা দেবকিঙ্করবাবুই করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে সনাতনের গ্রামের একজন গ্রুপ ডি কর্মী থাকায় তার মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে যায়। কপিলের মত মানুষেরা ভিন দেশে অর্থ উপার্জনের তাগিদে যায়। নিজেদের শরীর এবং মনকে ধরে রাখতে না পেরে তাদের পদস্খলন ঘটে। অজান্তেই বহন করে নিয়ে আসে পরিবারের বিপর্যয়। সনাতন এম.এসসি পর্যন্ত একটা লড়াই চালিয়ে নিজেকে জীবনযুদ্ধে মানিয়ে নিতে চাইছিল। পরিবারকে একটা সম্মান দেওয়ার পথে সে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছিল মেধার জোরে। কিন্তু চোরাগলিতে কখন কোন বিপর্যয় মানুষের জীবনের জিজ্ঞাসা ভিন্ন পথে চালিত করে তা মানুষ জানতে পারে না। কপিলের মতো মানুষেরা অজান্তে এইডসের সম্মুখীন হয়। আবার সে বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করে—

> *"এইডস রোগের কথা শুনেছি। আমার মেয়ে দুটোরও এ রোগ হবে। আমার বাতাস যার গায়ে লাগবে, তারই এরোগ হবে।"*[১০৭]

কপিলের মতো ধারণা আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই বহন করে। শিক্ষার প্রসার সে পথে

সামান্য সহযোগিতা করেছে বটে। দেবকিঙ্কর ডাক্তারের ভূমিকা সনাতনের পরিবারের ক্ষেত্রে অনেকটাই। তিনি জানতেন এই রোগকে কেন্দ্র করে সনাতনের পরিবারের ওপর অন্ধকার নেমে আসতে পারে। তিনি কপিলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন রক্তের সংযোগ এবং যৌন সম্পর্ক ছাড়া এ রোগ ছড়ায় না। সাধারণ ছোঁয়াচে রোগের পর্যায়ে এ রোগের মিল নেই। সনাতনকেও দেবকিঙ্করবাবু বোঝানোর চেষ্টা করেন এইচআইভি এবং এইডস এর গঠন এবং মানব শরীরে তার কার্যক্ষমতা কী ধরনের হয়। কপিলের শরীরের প্রাথমিক স্তরে ছিল টিবি রোগ। যার দরুণ তার শরীরের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে এগোয়। সে তুলনায় কপিলের স্ত্রী ভাগ্যলক্ষ্মীর অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু প্রতিবেশীদের ভ্রান্ত ধারণা সনাতনদের পরিবারের ওপর এসে পড়ে।

যুগ এগিয়েছে। যুগের বৈশিষ্ট্য মানুষ বহন করেছে। কিন্তু গোঁড়ামির ক্ষেত্রে তিমিরেই নিমজ্জিত। শিক্ষা এগিয়েছে কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রসার ঘটেনি। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বা বস্তি এলাকায় মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা আশা করাই বৃথা। সনাতনদের মুচিপাড়ার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সবুজ কুমার ঋষি জনপ্রতিনিধি হওয়ায় সে ততটা অচ্ছুত নয়। তার উদ্যোগে সনাতনদের বাড়ির সামনে সাবধান বার্তা লেখা হয়। শহর থেকে বাড়ি ফিরে এসে এধরনের বার্তা সনাতনকে অবাক করে—

> *"একটি আমগাছের গায়ে টিনের পাতে আলকাতরা দিয়ে লেখা: সাবধান। সামনে এইডস রোগীর ঘর। একটা কঙ্কালের খুলির মতো আঁকা আছে।"*[১০৮]

আসলে অচ্ছুত পাড়ার মধ্যে আরো একটি অচ্ছুত ঘর সনাতনের জীবনবোধকে পাল্টে দেয়। সে ভাবে অচ্ছুতের ধরণও নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়। অসুখের সঙ্গে লড়াই অসমাপ্ত রেখে সনাতনের বাবা মারা যায়। মা এবং দু'বোনের ওপর থেকে অভিশাপের ছায়া দূর হয় না। সনাতনের দুই জমজ বোন চম্পা ও চামেলি নানা ভাবে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। খুব কম পরিসরে চম্পা-চামেলির কথা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। তারা ক্লাস এইটের ছাত্রী। দাদার পড়াশুনাকে কেন্দ্র করে তাদের কল্পনার জগৎ রয়েছে। দাদা পাশ করে চাকরি পেলে দাদার সঙ্গে তারাও কলকাতার জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখে—

> *"ওরা দু-বোন ওদিকের কলেজে পড়বে। স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে ভরতি হয়ে যাবে। ফরর ফরর ইংলিশ বলবে, জিনস পরবে, টপ পরবে, হিলতোলা জুতো পরবে ...। বেশ করবে, পরবেই তো।"*[১০৯]

একটা স্বপ্ন তাদের জীবনবোধকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তারা বাবার অসুখ সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল। তারা জানে বাবার কুকর্মের ফল আজ তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু দাদার চাকরি সমাজের সব অবহেলার উপরে জবাব হবে বলেই তাদের আশা। তাদের বিয়ের সম্বন্ধ এলেও বিয়ে করতে তারা নারাজ। কন্যাশ্রীর সাইকেল তাদের হাতে। ফলে পড়াশুনো করে দিদিমণি হওয়া তাদের লক্ষ্য। পাড়ার ছেলেদের 'টোন' কাটাকে তারা পাত্তা না দেওয়া সত্ত্বেও তাদের পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়। সনাতন বোনেদের ওপর হাত তোলে শুধু রেজাল্ট খারাপের জন্য নয়, তাদের ঘরে ফর্সা হওয়ার ক্রিম দেখে। একটা অভিমান তৈরি হয় দু'বোনের মধ্যেই। তারা আত্মহত্যার কথা ভাবে। কিন্তু জীবনের প্রতি মোহ এবং দাদার চাকরির পর স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার জন্য তারা সে পথে পা বাড়ায় না। কিন্তু মৃত্যু যেন তাদের শিয়রে ওৎপেতে বসে রয়েছে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিপত্তির শিকার হয় তারা। এর অভ্যন্তরীণ কারণ সনাতনের বাবা-মায়ের এইডস আক্রান্ত হওয়া। কারণ এইডস আক্রান্ত পরিবারের মেয়েদের সংস্পর্শে এলে কোনো সংক্রমণ ছড়ায় না যদি সুরক্ষাকবচ ব্যবহার করা যায়। চম্পা-চামেলি শ্লীলতাহানির সম্মুখীন হয়। কোনোক্রমে তারা মুক্তি পেলেও নিজেদের ওপর ঘৃণা থেকে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আমাদের সভ্য সমাজ কতরকমভাবে নিজের দেহকে কলুষিত করে। দেবকিঙ্কর ডাক্তার সনাতনকে এক চরম সত্যের সম্মুখীন করান, ঠিক এই ভাবে—

> *"আর একটা কারণ বলব সনাতন, অপ্রেস্‌ড দলিত ক্লাস থেকে তোমার এই এমএসসি পড়াটা সহজে মানতে পারে কেউ? তোমাদের গাঁয়ের উচ্চবর্ণরা তোমাদের তুই-তোকারি করছে। তোমার বাবা আর চামড়ার কাজ করে না, টেকনিক্যাল কাজ করে। কেউ আপনি করে বলে এখানে? কিন্তু তোমাকে নিয়েই ওদের ধর্মসংকট সনাতন, তুমি প্রফেসর হবে, কিংবা বড়ো চাকরি করবে। তখন তোমাকে মুচি ঘরের ছেলে হিসেবে তুই-তোকারি করতে পারবে?"*[১১০]

সনাতনের বাবার মৃত্যু, দু-বোনের মৃত্যু সনাতনকে জীবন সম্পর্কে দোটানায় ফেলে দেয়। মাকে নিয়ে সে সমস্যায় পড়ে। দেবকিঙ্করবাবু সে সমস্যার সমাধান করেন নিজের বাড়িতে সনাতনের মাকে আশ্রয় দিয়ে। ডা. দেবকিঙ্কর সেন সনাতনের মাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিলেন স্ত্রী কিন্ময়ীদেবীর কোনোরকম মতামতের প্রয়োজন উপেক্ষা করে। স্বামীর কথাকে উদার মনে মেনে নেওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন তিনি। ছেলে জীবক এবং মেয়ে লীলা কাছে থাকে না বলে নিঃসঙ্গ জীবনে স্বামীর কাছে নিজের সংকোচ বোধকে তিনি সেভাবে বড় করে দেখাতে পারেননি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ধারায় দেবকিঙ্করবাবুর নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সন্তান জীবকের বর্তমান মানসিকতার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। আসলে এই উপন্যাসে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন ঔপন্যাসিক। একটি বৃহৎ ক্যানভাসের চিত্র জীবকের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। দেবকিঙ্কর সেন কৃষ্ণনগরের মানুষের কাছে দেবতা। তিনি শুধু কম ভিজিট নেন তাই নয়, মানুষকে বুঝে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তোলেন। কথায় কথায় টেস্ট করানোর পরামর্শও দেন না। ফলে ডাক্তারি শপথকে তিনি যথাযথভাবেই মেনে চলেন। ছেলে জীবক সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সুযোগ না পাওয়ায় পাঞ্জাবের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করেছে। দেবকিঙ্করবাবুর বাবা নামকরা কবিরাজ ছিলেন। ফলে বংশ পরম্পরায় ডাক্তারি করার নেশা জীবকের ছিল। তবে দেবকিঙ্করবাবু কিন্তু ডাক্তারি পড়ানোর জন্য কোনো জোর করেননি। তিনি বিশ্বাস করেন— মন দিয়ে ভালো করে পড়াটাই প্রধান। কিন্তু জীবকের ইচ্ছে ডাক্তারি পড়বার। ফলে বেশি টাকা দিয়েই তাকে ডক্তারি পড়াতে হয়। জীবক ডাক্তারি পাশ করে কিছুদিন দিল্লিতে প্র্যাকটিস করে। পরে কলকাতায় ডিলাইট নার্সিংহোমে প্র্যাকটিস শুরু করে। ডিলাইট নার্সিংহোমে বিভিন্ন ধরনের কাজে হাতে খড়ি হয় জীবকের। দেবকিঙ্করবাবু এই বিষয়টি ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি মনে করেন সবার একটা পরিসীমা থাকা দরকার। মেডিক্যালের ডিগ্রীকে ব্যবহার করে ডাক্তারেরা নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। জীবকও সেই পথ অবলম্বন করে। সে বুঝে গিয়েছে নিজেকে ভালো রাখতে গেলে অন্যকে ভয় দেখিয়ে চলতে হয়। যেমন আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দিনেও জ্যোতিষীরা ভয় দেখিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে নিয়েছে। ফলে রোগীদের ভয় দেখিয়ে ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে পাঠাতে জীবকের দ্বিধা হয় না। নতুন প্রজন্মের ডাক্তারদের বৈশিষ্ট্য বহন করে জীবক। যার কাছে অর্থ আর যৌনবাসনা তৃপ্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই নার্সিংহোমের ডিউটির মধ্যেই কাউন্সিলিংয়ের ডাক্তার অন্তরা ঘোষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে তাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঘটে বিপত্তি। কাউন্সিলার ভর্তি ছিলেন জীবকের নার্সিংহোমেই। এক গুণ্ডা নার্সিংহোমে ঢুকে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। জীবক চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। খবরের কাগজে বহু লেখালেখি হয়। কলকাতা ছেড়ে কৃষ্ণনগরে পাড়ি দেয় জীবক। সেখানেও কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর এক নার্সিংহোমে ব্যবস্থা হয়। আসলে দেবকিঙ্করবাবুর প্রতিপত্তির পাশে জীবকের মাথা তুলে দাঁড়ানোর পন্থা ম্লান হয়ে যায়। অবশেষে মাইলস্টোন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে ফ্লোর সুপারভাইজারের পদে একটি চাকরি জুটে যায় তার। কিন্তু কোন পথে পা বাড়াবে জীবক? এক গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় সে। কারণ বাবার নাম-ডাকে দয়ালু শব্দ যুক্ত রয়েছে। জীবক সে শব্দ

সাদরে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ কোনটা করবে জানে না। তবে অর্থ উপার্জনের নেশা তার রয়েছে। তাই সে ভাবে—

"ভালো লোক বাবার স্ট্যাম্প পড়ে যাওয়াটা ভালো হয় না সব সময়। আবার মন কী বিচিত্র। নিজের গায়েও ভালোলোকের স্ট্যাম্প লাগাতে ইচ্ছা হয়।"[১১১]

উপন্যাসের সম্পূর্ণ আলোকপাত জীবকের জীবন-দর্শনের ওপর এসে পড়ে। চিন্ময়ীদেবীর শারীরিক অসুস্থতা কিডনির সমস্যায় গিয়ে উপস্থিত হয়। জীবকের নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসা চলতে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থা থেকেই ডায়ালিসিসের প্রয়োজন দেখা দেয়। জীবকের নার্সিংহোমেই ডায়ালিসিসের মেশিন বসানো হয়; টেকনিশিয়ান আসে। চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন দেবকিঙ্করবাবুকে অবাক করে দেয়। তিনি ভাবেন কলকাতার মতো ব্যবস্থা মফঃস্বল শহরগুলিতে কীভাবে ব্যবসা করছে? টাকার অভাব, চাকরির অভাব থাকা সত্ত্বেও নার্সিংহোমগুলিতে বেড ফাঁকা নেই। অর্থাৎ এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে দেবকিঙ্করবাবুর সামনেই। জীবকের মত টাকা দিয়ে যারা ডাক্তারি পাশ করে তাদের অগ্রগতিও দেবকিঙ্করবাবুকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ খবরের কাগজের নিত্যদিনের কিছু নেতিবাচক খবর তিনি পড়েছেন। যেখান থেকে তাঁর ভাবনা জন্মেছে কীভাবে একটা চক্রান্ত কাজ করে চিকিৎসা পদ্ধতিকে নিয়ে। কিডনি পাচার নিয়েও তিনি সচেতন। আসলে কিডনি পাচার নিয়ে একটা দালাল-চক্র কাজ করে যারা কিডনি বিদেশেও পাচার করে। তারা বেছে বেছে দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের নিশানায় রাখে। অন্যদিকে চিন্ময়ীর ডায়ালিসিসে বেশিদিন কাজ চলবে না। তার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন করাতে হবে। জীবকই মায়ের সমস্ত বিষয়গুলো দেখাশুনো করে। বর্তমানে ডাক্তারি পেশার সঙ্গে রাজনীতি ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় নানা ধরনের চোরাই পথ তৈরি হয়েছে। জীবক সে পথেই পা বাড়ায়। অন্তরাকে বিয়ে করার কথা ভাবে। কারণ, ডাক্তারির সঙ্গে কাউন্সেলিং বিষয়টি বর্তমানে বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছে। ফলে উপার্জনের দু'টি পথ উন্মুক্ত হবে। জীবক দেবকিঙ্করবাবুর উদাসীনভাবকে ভালোভাবে মেনে নেয় না। মায়ের ব্যাপারে সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিডনি জোগাড় করতে ব্যস্ত। আসলে চিন্ময়ীদেবীর রক্তের গ্রুপ AB। ফলে AB গ্রুপের কিডনিই প্রয়োজন। জীবক বা দেবকিঙ্করবাবু কারুর সঙ্গেই চিন্ময়ীদেবীর রক্তের গ্রুপ মেলে না। ফলে অন্য কারুর কিডনি বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জীবকের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি তার চরিত্রকে খানিকটা অন্যমাত্রা এনে দেয়। কিন্তু আসল বিষয়টি হল, সে নিজেকে বাবার থেকে দায়িত্ববান প্রমাণ করতে চায়। নীতিজ্ঞান বর্জন তো সে আগেই করেছিল। ফলে কিডনি জোগাড় করতে গিয়ে সে যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে রাজি হয়ে

কাজে নেমে পড়ে। টার্নিংপয়েন্ট উপস্থিত হয় সনাতনের মায়ের রক্তের গ্রুপ চিন্ময়ীদেবীর সঙ্গে মিলে যাওয়ায়। বাকি সমস্ত পরীক্ষাও সফল হয়। ফলে সে সম্পূর্ণ দাবী নিয়েই সনাতনের মায়ের কিডনি চিন্ময়ীদেবীর শরীরে ট্রান্সপ্লান্ট করতে মনস্থ করেন। এতে দেবকিঙ্করবাবু বা চিন্ময়ীর মতামত নেওয়া সে প্রয়োজন মনে করে না। আর সনাতন বা সনাতনের মায়ের মতামতের তো প্রশ্নই নেই। কারণ তারা দেবকিঙ্করের আশ্রিত। ফলে একজন এইচআইভি পজিটিভের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আইনের চোখে অপরাধ হলেও জীবক তা এড়িয়ে যায়। জীবক সনাতন বা সনাতনের মায়ের সম্মতি থাকবে এটা ধরেই নেয়। কিন্তু পিতা দেবকিঙ্করের নীতিবোধ নিয়েই জীবকের চিন্তা। সে জানে তার মায়ের কিডনির ব্যবস্থা না হলে আর মাত্র ছ'মাসের অতিথি। ফলে উপায় হাতে পেয়ে সে চায় মাকে বাঁচিয়ে রাখতে। কারণ এইচআইভি পজিটিভ রোগীর কিডনি থেকে যদি সংক্রমণ ছড়ায় সেটার আলাদা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু কিডনি না থাকলে মাকে বাঁচানো যাবে না। তাই সে বাবার নিষেধকে উপেক্ষা করে বলেছে—

> *"কার নিষেধ বাবা? তোমার বিবেকের নাকি আইনের? তোমার অন্তর থেকে ইচ্ছে করে না মায়ের জীবনটা বাঁচাতে? তুমি তো জানো কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট না করালে মা ছ-মাসের বেশি আমাদের সঙ্গে থাকবে না এবং এটাও জানো মায়ের কিডনিটা রেয়ার গ্রুপের। তুমি ভগবান মানো না, আমি একটু হলেও মানি, আমি ভাবছি সনাতনের মাকে ভগবানই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা হয়তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল ..."*[১১২]

আসলে জীবক চাইছে তার শিক্ষাকে ব্যবহার করতে। বাবার খ্যাতির ওপরে সে নিজের আধুনিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছে। সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেবকিঙ্করের সম্মতি। চিন্ময়ীদেবী পিতা-পুত্রের কথাবার্তা শুনে ফেলেন। দেবকিঙ্করবাবু একটা সময় জীবকের মতকে মেনে নেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। চিন্ময়ীদেবী পিতা-পুত্রকে দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই দিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আসলে তিনি কারুর দয়ায় বেঁচে থাকতে চাননি। আর সেটা যখন সনাতনের মায়ের কিডনির বিনিময়ে। আসলে নীতিবোধের দোলাচলতা একুশ শতকের সূচনা থেকেই প্রতিটি মানুষের মূল জিজ্ঞাসা। আসলে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ফলে জীবক শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। আগ্রাসী নীতি আসলে জীবনকে একটা জায়গায় থামিয়ে দেয়। জীবকের জীবন সে চিত্রই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে আমাদের মতো ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারী

দেশের পরিণতি কী হতে পারে তার উদাহরণ একদিকে সনাতনের পরিবার অন্যদিকে দেবকিঙ্করবাবুর পরিবার। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে এক বিরাট জালিয়াতির পরিসর শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী। যাকে 'মেডিক্যাল টেররিজম' বলা যেতে পারে। সেই টেররিজম চিকিৎসকদের ডাক্তারি শপথকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে হাত বাড়িয়ে বসে রয়েছে। ফলে জীবকের মত মানুষেরা তার হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে নীতিবোধকে জলাঞ্জলি দেয়। জীবনস্রোতের অন্যধারার পরিচায়ক সনাতন। সে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজি। যার কাছে মনুষ্যবিবেক এখনও বর্তমান। দেবকিঙ্করবাবু যিনি চান মানুষের প্রকৃত সেবা করতে। নীতিজ্ঞানকে তিনি আঁকড়ে বাঁচতে চান। ফলে স্ত্রীর প্রাণ বাঁচাতে নীতিবোধই তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে জীবক যে নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেই যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে রাজি। ফলে ভালোমানুষীর লোভকে সামলে নিয়ে অর্থ সঞ্চয়ের দিকেই সে দৃষ্টি দিয়েছে। সামাজিক মর্যাদা অর্থের সঙ্গে ওঠে নামে। ফলে সে পথকেই বেছে নেয় জীবক। তিনজনের জীবন জিজ্ঞাসা আসলে মিলিত হয় এক জায়গায়। সম্মানের সঠিক পথ কোনটি— এই প্রশ্ন সবার মধ্যেই জাগরিত হয়। প্রত্যেকে তাই নিজের মতো পথ খুঁজতে শুরু করে এবং সে পথে তারা ধাবিত হয়। এভাবেই ভাবীকাল মানুষকে তার পথ চিনিয়ে দেয়। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেয়। নিরন্তর লেগে থাকার পথেই চালিত করে অন্য জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের জীবন্ত সত্য এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটি গুরুতর বিষয়কে কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে মনুষ্য চরিত্র লড়াই করে চলে। তারই একটি রূপ 'কিছু একটা হয়ে যাবে' উপন্যাসে উঠে এসেছে। আসলে আমরা কিছু একটা হয়ে যাবে বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাই। গভীরভাবে ভাবতে চাই না। সেই ভাবনারই প্রতিফলন দেখা যায় জীবকের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে দেবকিঙ্কর বাবুর ভাবনায়। বা চিন্ময়ীদেবীর কিডনির সমস্যায়ও এই প্রশ্নই উঠে এসেছে। এই 'কিছু একটা হয়ে যাবে'র ভাবনা মানুষকে সমূহ বিপদের সম্মুখীন করায়। জীবন সম্পর্কে দায়িত্বহীন করে তোলে, যার প্রমাণ জীবকের মধ্যেই পেয়ে যাই। ফলে বর্তমান সময়ের মানসিকতা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উঠে এসেছে জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার ভিন্ন পর্যায়। জীবন জিজ্ঞাসার পাঠ নিতে গিয়ে সময়ে পরিবর্তিত রূপকে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন প্রতিটি উপন্যাসে। বর্তমান সময়ের যুগমানসিকতার চিত্রটি আঁকতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ফলে প্রতিটি দিকের অভিযোজন চরিত্রের মধ্যে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সে

চিত্রই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসগুলিতে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘নাটাদা’, আরও পাঁচটি উপন্যাস, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি, ২০১০, দ্বিতীয় দে’জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৩৩।

২. তদেব, পৃ. ১৩৮।

৩. তদেব, পৃ. ১৫৪।

৪. তদেব, পৃ. ১৫৫।

৫. তদেব, পৃ. ১৪৯।

৬. তদেব, পৃ. ১৪৯।

৭. তদেব, পৃ. ১৫৬।

৮. তদেব, পৃ. ১৬৬।

৯. তদেব, পৃ. ১৬৮।

১০. তদেব, পৃ. ১৬৯।

১১. তদেব, পৃ. ১৭০।

১২. তদেব, পৃ. ১৮১।

১৩. তদেব, পৃ. ১৮২।

১৪. ‘পরবাসী’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১৬।

১৫. তদেব, পৃ. ১৭।

১৬. তদেব, পৃ. ২৫-২৬।

১৭. তদেব, পৃ. ২৬।

১৮. তদেব, পৃ. ৪৪।

১৯. তদেব, পৃ. ৮২-৮৩।

২০. তদেব, পৃ. ৮৩।

২১. তদেব, পৃ. ৮৫।

২২. তদেব, পৃ. ৮০।

২৩. তদেব, পৃ. ১২৪।

২৪. তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬।

২৫. তদেব, পৃ. ১৬২।

২৬. ‘কান্তকবি’, আরও পাঁচটি উপন্যাস, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১, প্রথম দে’জ সংস্করণ ২০১৭, পৃ. ৮৯।

২৭. তদেব, পৃ. ১০০।

২৮. তদেব, পৃ. ১০১।

২৯. তদেব, পৃ. ১১৮।

৩০. তদেব, পৃ. ১১৯।

৩১. তদেব, পৃ. ১২০।

৩২. তদেব, পৃ. ১২৫।

৩৩. তদেব, পৃ. ১৩০।

৩৪. ‘হলদে গোলাপ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৯-১০০।

৩৫. ‘পুরুষ যখন যৌনকর্মী’, অজয় মজুমদার, নিলয় বসু, দীপপ্রকাশন, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ১৯৯৯, নতুন সংস্করণ, জুন ২০২১, পৃ. ৫২।

৩৬. তদেব, পৃ. ৯।

৩৭. তদেব, পৃ. ১৮।

৩৮. তদেব, পৃ. ৭৩।

৩৯. তদেব, পৃ. ৯৬।

৪০. তদেব, পৃ. ৯২-১০০।

৪১. তদেব, পৃ. ৫৭৭।

৪২. ভেজা বারুদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পত্রভারতী প্রকাশনি, ৩/১ কলেজ রো, কল-০৯, পৃ. ৭০।

৪৩. তদেব, পৃ. ৭১।

৪৪. তদেব, পৃ. ৩৫।

৪৫. তদেব, পৃ. ভূমিকা।

৪৬. তদেব, পৃ. ৪২।

৪৭. তদেব, পৃ. ৫১।

৪৮. তদেব, পৃ. ৫১।

৪৯. তদেব, পৃ. ৫৯।

৫০. তদেব, পৃ. ৮০।

৫১. তদেব, পৃ. ৮৬।

৫২. তদেব, পৃ. ১০০।

৫৩. তদেব, পৃ. ১১৪।

৫৪. তদেব, পৃ. ১১৯।

৫৫. তদেব, পৃ. ১২৩।

৫৬. তদেব, পৃ. ১২৭।

৫৭. তদেব, পৃ. ১৩১।

৫৮. তদেব, পৃ. ১৩৭।

৫৯. তদেব, পৃ. ১৫১।

৬০. তদেব, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

৬১. তদেব, পৃ. ১৬০।

৬২. 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৪২।

৬৩. তদেব, পৃ. ১২।

৬৪. তদেব, পৃ. ১৭-১৮।

৬৫. তদেব, পৃ. ৪২।

৬৬. তদেব, পৃ. ৫৪।

৬৭. তদেব, পৃ. ৫৯।

৬৮. তদেব, পৃ. ১১৪।

৬৯. তদেব, পৃ. ১১৬।

৭০. তদেব, পৃ. ৮৫।

৭১. তদেব, পৃ. ৯১।

৭২. তদেব, পৃ. ১১৯।

৭৩. তদেব, পৃ. ১৩০।

৭৪. তদেব, পৃ. ১৪১।

৭৫. তদেব, পৃ. ১৪১।

৭৬. 'দুনিয়াদারি', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৬।

৭৭. তদেব, পৃ. ৪৪।

৭৮. তদেব, পৃ. ৬০।

৭৯. তদেব, পৃ. ৭৫।

৮০. তদেব, পৃ. ৮৫।

৮১. তদেব, পৃ. ৯৯।

৮২. তদেব, পৃ. ১০৩।

৮৩. 'নারী ও অর্থনীতি', স্মিতা মজুমদার, 'প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা', সম্পাদনা রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী, মোহতা পাবলিশার্স হাউস, ২৮/৫ বানভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ২০১১, পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩৮।

৮৪. 'কথাবলা পুতুল', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯।

৮৫. তদেব, পৃ. ৫৮।

৮৬. তদেব, পৃ. ১৩৮।

৮৭. তদেব, পৃ. ১৪০।

৮৮. তদেব, পৃ. ১৪৩।

৮৯. তদেব, পৃ. ১৪১।

৯০. 'পারিবারিক নারী সমস্যা', শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প প্রকাশন, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, ২য় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০১, পৃ. ২০৯।

৯১. 'শেকড় ছেঁড়া', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, স্বস্তিক প্রকাশন, ১ এ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টম্বর ২০১৭, পৃ. ৩১।

৯২. তদেব, পৃ. ৩২।

৯৩. তদেব, পৃ. ৭১।

৯৪. তদেব, পৃ. ৮৪।

৯৫. তদেব, পৃ. ৭৩।

৯৬. তদেব, পৃ. ১১১-১১২।

৯৭. তদেব, পৃ. ১২০।

৯৮. তদেব, পৃ. ৩৯।

৯৯. 'চার ডাক্তার', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পত্রভারতী প্রকাশন, ৩/১, কলেজ রো, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি , ২০১৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৬।

১০০. তদেব, পৃ. ২৮।

১০১. তদেব, পৃ. ৫১।

১০২. তদেব, পৃ. ৬২।

১০৩. তদেব, পৃ. ৭৩।

১০৪. তদেব, পৃ. ৭৫।

১০৫. তদেব, পৃ. ১২৯।

১০৬. তদেব, পৃ. ১৪২-১৪৩।

১০৭. 'কিছু একটা হয়ে যাবে', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২৮।

১০৮. তদেব, পৃ. ৩৪।

১০৯. তদেব, পৃ. ৩৯।

১১০. তদেব, পৃ. ৩৩।

১১১. তদেব, পৃ. ৬৪।

১১২. তদেব, পৃ. ৮৮।